কৌশিক মজুমদার
নোলা
খাবারের সরস গপ্পো

খাবারের সরস গপ্পো

কৌশিক মজুমদার

Nola

by

Kaushik Majumdar

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২০

প্রচ্ছদ : কামিল দাস

প্রচ্ছদ সহায়তা : কৌশিক মজুমদার

পেজ লে-আউট : প্রদীপ গরাই

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক

৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত

চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০

মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯
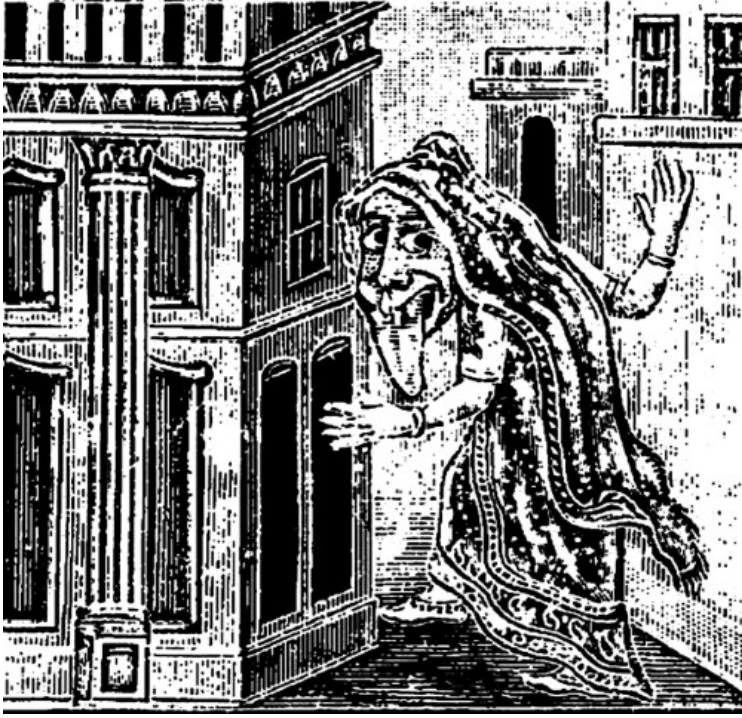
'নোলা' শুনলেই যার শকশক মনে পড়ে,

সেই রাক্ষুসি রানিকে

কৃতজ্ঞতা

অরুন্ধতী মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী, তন্নিষ্ঠা মজুমদার, পুণ্যব্রত পত্রী,
প্রদীপ গরাই, বিল্টু দে, মুহিত হাসান, রনিতা চট্টোপাধ্যায় ও শান্তনু চৌধুরী

সূচিপত্র
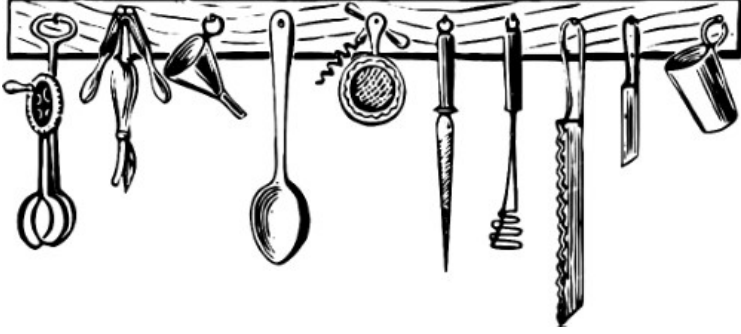
কার্টুন : বিল্টু দে

কথামুখ বা মুখের কথা

আমার ভীষণভাবে মনে হয়, খাবার সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় নিয়ে আসে। মানে, খাবারের মতো লেভেলার বোধহয় পৃথিবীতে খুব কম আছে। প্রত্যেকটা মানুষ, সে ধনী হোক, দরিদ্র হোক, মাঝামাঝি হোক আমাদের মতো, নির্বিশেষে কিন্তু ভালো খাবার খেতে ভালোবাসে। আর ভালো খাবারই বা কেন বলব, খিদে পেলে ভালো খাবার, খারাপ খাবার, অ্যাভারেজ খাবার বা মোটামুটি খাবার, তাতে কী-ই বা এসে যায়! খাবারের গন্ধে নোলা লকলক করে না, এমন কিন্তু আমার এই মাঝবয়সি জীবনে আমি খুব একটা দেখিনি।

যাঁরা জানেন না, আমি একটা ফুডব্লগ-এ অল্পস্বল্প লেখালেখি করি। ওই সামান্য... গল্পের ছলে যেটুকু যা বলা যায়; এবং সমস্যাটা হচ্ছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে গিয়েই আমাকে আটকে যেতে হয় কিছু ডেটার জন্যে। ডেটা মানে কী?– খাবারের বিভিন্ন গল্প, খাবার সম্পর্কিত পড়াশোনা। এটা কীভাবে এল, ওটা কীভাবে এল, সেটা কীভাবে এল। এবার যখনই আমি আটকে যাই, তখনই কৌশিক হচ্ছে সেই মানুষগুলোর মধ্যে একজন, যার কাছে আমি একদম নির্দ্বিধায় ফোন করি। “কৌশিক, এটা কী হল?” “কৌশিক, ওটা কী হল?” আর হাসিমুখে মোটামুটি ভদ্রলোক সবকিছুর উত্তর দিয়েও দেন। কী করে এত সময় বের করেন তাঁর এই সাকসেসফুল গবেষণার মাঝামাঝি, আমি জানি না, কিন্তু সময়টা তিনি ঠিক বের করেন। হয় তিনি নিজে জানেন, নয় তিনি পড়াশোনা করে কোথাও থেকে একটা খবরটা খুঁজে বের করে আমাকে জানাবেন। এবার অনেকদিন ধরেই কথা হচ্ছিল যে খাবারের গল্প বা আমার ‘ফুডকাহিনি’-র পাশাপাশি এইরকম একটু পড়াশোনা নিয়ে নানা মজার গল্পের কোনও বই করা যায় কি না, যেখানে খাবার সম্পর্কিত পড়াশোনাগুলোকে সহজভাবে বলা হবে। আর তখনই কৌশিক হঠাৎ একদিন বলে বসল, “ইন্দ্রজিৎদা, আমি কিন্তু একটা বই লিখছি।“ খুব ভালো কথা! এইবার কৌশিক ছাড়ল দ্বিতীয় বোমাটি। “ইন্দ্রজিৎদা, সেই বইয়ের ভূমিকা কিন্তু তোমায় লিখতে হবে।“ মানে, খানিকক্ষণের জন্যে আমি বুঝতে পারিনি যে কৌশিকের মাথাটা কি শোকে-তাপে একদমই গেছে, নাকি আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছে, সত্যিই বুঝতে পারিনি, বিশ্বাস করুন! এইবার হল মজাটা। কদিন পরে বুঝলাম, কৌশিক ব্যাপারটা ঠাট্টার ছলে নয়, সিরিয়াসলি বলেছে। আরে আমি যাঁর লেখা পড়ে নিজের লেখা লিখছি, আমি লিখব তাঁর বইয়ের ভূমিকা! এ পাগল না মাথা খারাপ? কিন্তু অবস্থা দেখুন। আমাকেই তো লিখতে

হচ্ছে।

ধরুন আপনাদের যদি একটা সোজা প্রশ্ন করি যে, ব্রেকফাস্ট কাকে বলে? আপনারা জানেন, সকালবেলা খায়, ফাস্টকে ব্রেক করে, উপোস ভাঙে। আর ডিনার কখন খায়? সেটাও জানেন, যেটা রাত্তিরে খায়। কিন্তু যদি বলি, ডিনার কি সকালে খায়? ব্রেকফাস্টকে কি ডিনার বলা যায়? বা ডিনারকে কি ব্রেকফাস্ট বলা যায়? পাগল ভাবতেও পারেন, তেড়ে মারতে আসতেও পারেন। কিন্তু এই গল্পটায় তেড়ে মারতে আসাটা বোধহয় খুব একটা দোষের কিছু নয়। আর কৌশিকের এই সমগ্রটি, এই বইটা ঠিক সেই কাজটাই করবে। আমাদের মতো বহু লোককে, যারা খাবার নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, সহজ ছলে লেখালেখি করে, কোথায় খাব সেটা বলে, এই বইটা কিন্তু আমাদের সেই গল্পগুলোই বলে কৌশিকের নিজস্ব অননুকরণীয় এক সহজ সরল স্টাইলে। ওর লেখার ভাষা নিয়ে বেশি কিছু বলারই নেই। এতগুলো বই বেস্টসেলার, ঝরঝরে ভাষা, সহজ কথাবার্তা, কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ। পড়ে দেখুন। ভূমিকা পড়ার পিছনে বেশি সময় নষ্ট করার থেকে আমার সবসময়েই মনে হয়, যে-কোনো ভালো খাবার নিয়ে লেখা পড়াটা অনেক বেশি দরকারি, অনেক পছন্দের বিষয় লোকের কাছে। বইটা পড়ুন আর পড়ে জানান যে আপনাদের এই 'নোলা' বইটা কেমন লাগল। কৌশিককে অশেষ শুভেচ্ছা জানাই ওর এই লেখার জন্যে, ওর বই বছর বছর বিভিন্ন সংস্করণে বের করুক। আমাদের আর-একটু সুবিধা হয়। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি কম করতে হয়।

আর হ্যাঁ, আপনারা জানান পড়ে কেমন লাগল।

কলম ইতি।

ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী

ব্রেকফাস্ট
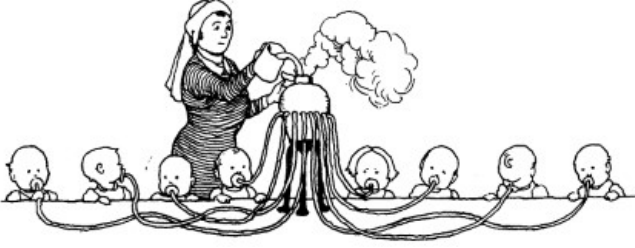
ব্রেকফাস্টকে কি ডিনার বলা যায়?

শুনতে অবাক লাগলেও অবশ্যই যায়। শুধু যায় না, বলা উচিত। খাবারদাবারের ইতিহাস খেয়াল করলে দেখা যাবে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের খাবারের সময় বদলেছে। এই তো শ-দেড়েক বছর আগেও মানুষ দিনের সেরা খাবারটা আলো থাকতে থাকতে খেয়ে নিত। রাতের বেলা আলো ছিল মহার্ঘ। আর অন্ধকারে ভালো ভালো খাবার খেতে কে চায়? যা খাচ্ছি তা যদি ঠিকঠাক চেখে দেখার সঙ্গে চোখেও না দেখতে পারি, তবে মন ভরে না।

ষোড়শ শতকে ইউরোপে দিনের সেরা খাওয়াটা খাওয়া হত বেলা ১১টা নাগাদ। ঘুম থেকে উঠেই মানুষ খাই খাই করত কি না জানা নেই, তবে করলেও টুকটাক যা খেত, তাকে বলা হত স্ন্যাপ বা স্ন্যাক। শব্দটা ডাচ শব্দ Snacken থেকে এসেছে, অর্থ চিবানো। এই ১১টার সময় বড়োলোক, গরিব নির্বিশেষে যে খাওয়াটা খেত তার নাম ছিল 'ডিনার।' মজার ব্যাপার এই ডিনার শব্দের মূলে রয়েছে ফরাসি শব্দ disner বা desjeuner, যার মানে উপবাস ভঙ্গ করা বা ব্রেকফাস্ট। বুঝুন কী গেরো। বড়োলোকদের ক্ষেত্রে এই ডিনার চলত প্রায় ঘণ্টা দুই তিন ধরে। খাওয়ার সঙ্গে আলাপ, আড্ডা, ব্যবসার কথা, সব হত এই ডিনারেই। এই প্রসঙ্গে বলি, ডিনার সেরেই লন্ডনের অভিজাতরা ছুটতেন গ্লোব থিয়েটারে, নাটক দেখতে। কিন্তু নাটক শুরু হত দুপুরের পর পরই। যাতে জায়গা মিস না হয়ে যায়, তাই তাঁরা তাঁদের চাকরদের আগে পাঠিয়ে দিতেন চেয়ার ধরতে। নিজেরা ডিনার সেরে ধীরেসুস্থে আসতেন। নাটকের মাঝে দেখতে বসলে অনেকসময় নাটকের মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতেন না, আর রেগে গিয়ে বেজায় হট্টগোল বাধিয়ে দিতেন। (ডিনারে সদ্য পান করে আসা পানীয়ও এই কাজে

প্রভৃত সাহায্য করত)। নাটকের কলাকুশলীরা তো লবেজান। এসব দেখে শেক্সপিয়র নামের এক ছোকরা ভালো বুদ্ধি ঠাউরালেন। খেয়াল করে দেখলেন, ডিনার সেরে অভিজাতদের আসতে আসতে প্রায় তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়ে যায়। তাই তিনি নিজের নাটকগুলো এমনভাবেই লিখলেন, যাতে তৃতীয় অঙ্কের পরই নাটকের আসল ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রথম দুই অঙ্ক না দেখলেও চলে। ভেবে দেখুন, শুধু ডিনারের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে শেক্সপিয়রকে নাটকের ধরন পালটাতে হয়েছিল।

যা বলছিলাম, ধীরে ধীরে ডিনার পিছাতে থাকল। আর সে জায়গায় এল নতুন শব্দ 'লাঞ্চ', যাকে অভিজাতরা বলতেন 'লাঞ্চেওন।' মুশকিল হল এই লাঞ্চেওন যে অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ nuncheon থেকে এসেছে, তার মানে দুপুরের পানীয় (খাবার নয়)। সোজা কথা ডিনারের আগে হালকা কিছু খাবার আর পানীয় খাওয়ার নামই ছিল লাঞ্চ।

দিনের আলো থাকতে থাকতে ডিনার সেরে নিতেন সবাই। রাতে শোবার আগে হালকা স্ন্যাক্স আর চা। এই ভোজনের নাম সাপার। যা সরাসরি ফরাসি Supper থেকেই ইংরেজিতে এসেছে। মানে সন্ধ্যার খাওয়া। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ডিনারের পর মানুষজন নড়তেচড়তে পারতেন না। বিশ্রাম নিতেন, নাটক দেখতেন। রাতের হালকা খাওয়া খেয়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বের হতেন। আর তা থেকেই ইংরেজিতে প্রবাদ এসেছে, 'After dinner rest a while, after supper walk a mile'.

কফির বিশ্বজয়

সে অনেক কাল আগের কথা। প্রায় বারোশো বছর হবে। ইথিওপিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাফা প্রদেশের এক মেষপালক পাহাড়ে তাঁর ভেড়াদের ছেড়ে দিয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। ভেড়ারাও ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাস চিবাচ্ছে। হঠাৎ তিনি দেখলেন চার-পাঁচটা ভেড়া যেন ভেড়ার পালের মধ্যে থেকেও অন্যরকম আচরণ করছে। বেশ চনমনে উত্তেজিত ভাব। ব্যাপার কী? দেখতে গিয়ে দেখলেন, সেগুলো ঘাস না খেয়ে পাশের এক ঝোপ থেকে মাটিতে খসে পড়া লাল লাল ফল খাচ্ছে। আর খেয়েই লাফালাফি শুরু করেছে। একটু ভয়ে ভয়ে তিনিও দু-তিনটে ফল খেলেন। ঘুম উড়ে গেল নিমেষে। বাঃ রে বলে তিনি সেই ফল বেঁধে নিয়ে এলেন গাঁয়ে। খবর ছড়িয়ে পড়ল। কাছেই ছিল খ্রিস্টানদের এক মঠ। সেখানের সন্ন্যাসীরা সেই ফল নিয়ে এলেন। মঠে গাছ লাগালেন। আর বহু চেষ্টার পরে কাদাটে খয়েরি একটা তরল বানালেন, যা পান করলে রাতে প্রার্থনার সময় তাঁদের ঘুম পেত না। কাফা থেকেই এই গাছের নাম হল কফি।

১৮৯৫ সালে কলকাতার স্টেটসম্যানে প্রকাশিত মোকা কফির বিজ্ঞাপন

এই গল্প আপনি আরবে বলতে যান। মারধর খেতে পারেন। তাদের বিশ্বাস তারাই কফি আবিষ্কার করেছে। তবে এখন আমরা যে কফি খাই, তার রোস্টিং, গ্রাইন্ডিং, এমনকি ফিল্টারের পদ্ধতিও আরবদের আবিষ্কার, এটা ঐতিহাসিক সত্য। আরবরা বলে কফি শব্দটাও এসেছে আরবি 'কাওয়া' থেকে, যার মানে 'খিদে না পাওয়া।' এ কথা মর্মে মর্মে সত্যি। হোস্টেল থাকাকালীন যেদিন যেদিন দেরিতে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম খাওয়া শেষ, কতবার এককাপ কফি দুপুর অবধি আমার খিদে মিটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বহুদিন অবধি আরবরা কফির মৌরসি পাট্টা নিজেদের হাতছাড়া করেনি। কফিবীজকে জলে ফুটিয়ে অন্য দেশে রপ্তানি করত, যাতে তা থেকে গাছ না গজায়। অটোমানরা আরব আক্রমণ করে দেশে ফেরার সময় বেশ কিছু কফিবীজ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। অল্প সময়ে তা তুরস্কে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৫৫৪ সালে ইস্তানবুলে রীতিমতো কফি হাউসও ছিল। ভাবুন কাণ্ড।

তুরস্কের থেকে ইউরোপের নানা দেশে কফি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তবে এই বিধর্মী

খাওয়ায় পোপের অনুমোদন ছিল না। তাই খ্রিস্টানরা লুকিয়ে লুকিয়ে কফি পান করতেন। শেষে স্বয়ং পোপ অষ্টম ক্লেমেন্টও একদিন বাধ্য হয়ে কফির কাপে চুমুক দিলেন আর দিয়েই তাঁর মেজাজ এত ফুরফুরে হয়ে গেল, যে তিনি ঘোষণা করলেন, 'এত ভালো পানীয়কে শয়তানের পানীয় বলাই যায় না। বরং এঁকে ব্যাপটাইজ করে খ্রেস্টান বানিয়ে দেই।' যেই ভাবা সেই কাজ। গোটা ইউরোপ জুড়ে এবার ব্যাঙের ছাতার মতো কফি হাউস গজাতে লাগল। কিন্তু ঝামেলা একটাই। দাম বড্ড বেশি। সব কফি আসত মূলত আরবদের থেকে। তারাও মওকা বুঝে প্রচুর দাম হাঁকত। তাদের বাজার খারাপ করল ওলন্দাজরা আর গাব্রিয়াল মাতো দ্য ক্লু নামে এক চোর।

ওলন্দাজরা মোকা বন্দরে (এই নামে একটা কফিও আছে) কিছু আরব ব্যবসায়ীকে ঘুষ দিয়ে কয়েকটা কফির চারা জোগাড় করে। তবে ক্লু-এর অভিযানের কাছে সেসব নস্যি। ক্লু ফরাসি রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের কাছে একটা কফিচারার জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল ক্যারিবিয়ানে এই গাছের চাষ করলে আরবদের দাপট কমানো যাবে। রাজা লুই বললেন, 'পাগল নাকি? এত দামি গাছ দেওয়া যাবে না। ভাগ হিঁয়াসে।' ক্লু দেখলেন আঙুল সোজা করে যখন হচ্ছে না, তখন বাঁকানো যাক। রাতের অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে ঢুকে গাছ চুরি করে জাহাজে চেপে সোজা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মার্তিনিক দ্বীপে। পথে সেই জাহাজে নাকি জলদস্যুও আক্রমণ করেছিল। ক্লু কোনও ক্লু রেখে যাননি, ফলে সম্রাট টেরও পেলেন না। এদিকে মার্তিনিক দ্বীপে চাষ-আবাদ করে লালে লাল হলেন ক্লু। পঞ্চাশ বছরে মার্তিনিকেই এক কোটি আশি লাখ চারা হল। সেখান থেকে ছড়িয়ে গেল গোটা আমেরিকায়।

এদানি সিসিডি, স্টারবাকস আর বারিস্তার সৌজন্যে কফি বেশ ডেলিকেসির জায়গায় চলে গেছে। নানারকম কফি আমাদের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে অহরহ। এদের মধ্যেই সবচেয়ে বিখ্যাত দুখানার গল্প বলি বরং।

এসপ্রেসো— জানি না কেন অনেকে এঁকে এক্সপ্রেসো বলেন। তবে এই কফির শুরুই হয়েছিল কিন্তু দ্রুত কফি বানানোর চেষ্টা থেকে। উনিশ শতকে সারা ইংল্যান্ড জুড়ে যখন শিল্পবিপ্লবের হাওয়া, তখন কফিও গরম জলের বদলে সরাসরি গরম বাষ্পে ভাঁপালে তাড়াতাড়ি হয় কি না তা দেখতে মেশিন বানানো হল। ১৮৯৬ সালের বিশ্বমেলায় প্রদর্শিত হল পৃথিবীর প্রথম এসপ্রেসো কফির এক গাবদা মেশিন। তাতে ঘণ্টায় ৩০০০ কাপ কফি বানানো যেত। এই অবধি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু সে কফি মুখে তুলেই সবাই 'ওয়াক থুঃ' বলে ফেলে দিলেন, এতটাই বদখত খেতে। মুশকিল হল কফিবিনকে জাঁক দিতে গেলে যে জল লাগে

তার তাপমাত্রা ফুটন্ত জলের চেয়ে একটু কম হলে সবচেয়ে ভালো হয়। বাষ্পে সে সুযোগ নেই। তারপর চেষ্টা হল কফিবিনকে একেবারে পাউডারের মতো গুঁড়িয়ে মেশিনের বাষ্পে জাঁক দেওয়ার। ইতালিয়ানরা মেতে উঠলেন এই মেশিন বানাতে। মেশিন তো হল, কিন্তু তাতে সময় লাগত সাধারণ কফি বানানোর চেয়ে অনেক বেশি। এসপ্রেসো মানে দ্রুত আর সেই মেশিনে কফি চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হত কতক্ষণে কফি তৈরি হবে। শেষে ১৯০১ সালে মিলানের বিজ্ঞানী লুইজি বেজেরা আধুনিক এসপ্রেসো মেশিন আবিষ্কার করেন। ১৯০৬-এর মিলান বিশ্বমেলায় এই কফি খাবার জন্য লাইন পড়ে গেছিল আর এক কাপ কফি বানাতে সময় লাগছিল ৪০ সেকেন্ড মতো।

ক্যাপুচিনো— ১৫২০ সাল নাগাদ ফ্রান্সিসক্যান সন্ন্যাসীদের একটি দলের সঙ্গে মঠের ঝামেলা বাধে। তাঁরা ঠিক করেন মঠ থেকে বেরিয়ে নিজেদের সম্প্রদায় খুলবেন। চার্চ এই ঘটনাকে মোটেই ভালোভাবে দেখল না। সন্ন্যাসীরা বিধর্মী ঘোষিত হলেন আর বাধ্য হলেন গা ঢাকা দিতে। পরে কালাডলিস সম্প্রদায়ের সাধুরা তাঁদের আশ্রয় দেন। এই সাধুরা তাঁদের মতোই মাথায় হুড দেওয়া লম্বা আলখাল্লা পরা শুরু করলেন। তাঁদের ভাষায় এই আলখাল্লাকে বলত ক্যাপুচিন। ক্যাপুচিন তাঁদের আত্মরক্ষাতেও সাহায্য করত। তাঁদের আর কালাডলিসদের থেকে আলাদা করা যেত না। ধীরে ধীরে চার্চের রোষ কমল। এঁরা আলাদা সম্প্রদায়ের মর্যাদা পেলেন আর ১৫৩৮-এ নাপেলস-এ এসে নতুন মঠ বানালেন। এঁদের নাম হল ক্যাপুচিন সন্নাসী।

ক্যাপুচিনরা নিজেদের সকালের প্রথম কফিতে গরম গরম ফেনা তোলা ছাগলের দুধ দিয়ে খেতেন। তাঁরা খেয়াল করেছিলেন, এই ফেনা তাপের কুপরিবাহী। ফলে চরম ঠান্ডায় এই ফেনা ওঠা কফি গরম থাকে অনেক বেশি সময় ধরে। তবে এই কফির নাম কেন ক্যাপুচিনো হল, তা নিয়ে দুটো মত আছে। ক্যাপুচিনো মানে ছোট্ট ক্যাপুচিন। কেউ বলেন সন্ন্যাসীদের আলখাল্লা ছিল কফি রঙের, আবার কেউ কেউ আরও এক কাঠি সরেস। তাঁরা বলেন চারিদিকে সাদা ফেনা, মাঝে গোল খয়েরি কফি; উপর থেকে দেখলে চারদিকে সাদা চুল, মাঝে টাকওয়ালা ক্যাপুচিন সন্ন্যাসীর মতো লাগে। তা থেকেই এই নাম। তবে ব্রেকফাস্টে ক্যাপুচিনো কফির শুরু করেন কে? কাগজপত্র ঘেঁটে একটা নাম পাওয়া গেল। মার্কো ডি অ্যাভিয়ানো। এক ক্যাপুচিন সন্ন্যাসী। ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার যুদ্ধের সময় ইনি নাকি টানা হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করে গেছিলেন। সেসময় যাতে তাঁর ঘুমে চোখ ঢুলে প্রার্থনায় বাধা না পড়ে, তাই মাঝে মাঝেই ক্যাপুচিনোতে চুমুক দিচ্ছিলেন তিনি। সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে ১৯৮৩-তে

ক্যাপুচিনোর ৩০০ বছর পালন হয়েছিল ইতালি জুড়ে। যতদিন গেছে ক্যাপুচিনদের সংখ্যা কমেছে। এখন সারা বিশ্বে হাজার জন ক্যাপুচিন আছেন কি না সন্দেহ। বেচারারা মন দিয়ে কফিটাই বানাতে পারতেন। মাঝখান থেকে ফায়দা লুটছে অন্যরা। একটা সমীক্ষায় দেখলাম স্টারবাকসের ২৫০০০ আউটলেট থেকে প্রতিদিন নাকি ৭৫০ লক্ষ ক্যাপুচিনো বিক্রি হয়।

টোস্ট কখন আর কেন করবেন?

মিশরীয়রা যে কটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁদের একটা যদি প্যাপিরাস পাতায় লেখালেখি হয়, অন্যটা অবশ্যই পাউরুটি। কীভাবে তাঁরা বুঝলেন ময়দার একটা মণ্ডকে ইস্টের গুঁড়ো মিশিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় রোদে রেখে দিলে, সে মণ্ড আপনাআপনি ফুলেফেঁপে যাবে, আর সেই ফোলা ময়দাকে আগুনে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে বেক করলে পাউরুটি তৈরি হবে, সে এখনও অজানা। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছিল অন্য জায়গায়। রুটি তো হল। কিন্তু সে রুটি বেশিদিন ফেলে রাখলে তা ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। ছয় হাজার বছর আগে মিশরীয় শেফরা চিন্তায় পড়লেন। রুটির আয়ু বাড়াতে হবে। আর তা করতে গিয়েই দেখলেন রুটিকে গরম আঁচে সেঁকে নিলে অনেকদিন অবধি খাওয়া যায়। তৈরি হল টোস্ট। শব্দটা অবশ্য ল্যাটিন টোস্টাস থেকে এসেছে। মানে জ্বলে যাওয়া রুটি। মিশরীয়রা আবিষ্কার করলেও রোমানরা মিশর দখলের সময় এই টোস্টের উপর তাদের নজর পড়ে। তাদের হাত ধরেই গোটা ইউরোপ আর ইংল্যান্ডে টোস্ট ছড়িয়ে পড়ে। তখন মদে রুটি চুবিয়ে তাকে চড়া আঁচে টোস্টানো হত। তাতে নাকি স্বাদ খুলত আরও বেশি।

ভারতে অবশ্য পাউরুটির এন্ট্রি পেতে বেশ বেগ পেয়েছে। এদেশে এই রুটি প্রথম আনেন পর্তুগিজরা। ভারতের পশ্চিমে সিকিভাগকে বলে পাও। একটা গোটা লোফের সিকিভাগ তাই পাও নামেই বিখ্যাত হয়ে গেল। হিঁদুরা ময়দা খায় না। ফলে পাউরুটি মূলত খেতেন খ্রিস্টান আর মুসলমানরা। ১৮৫০ নাগাদ যখন বম্বেতে একের পর এক সুতোর মিল গড়ে উঠছে, খাবার সময় কম, তখন শ্রমিকদের কথা ভেবে কিছু দোকানদার পাও আর কিছু ভাজাভুজি মিশিয়ে সস্তায় পেটভরা খাবার বানালেন, যা খেতেও কম সময় লাগত। অন্যদের দেখাদেখি হিন্দুরাও এই পাওভাজির প্রেমে পড়ে গেলেন। এরপর হেঁশেলে ঢুকতে আর কতক্ষণ!

এবার আসি অন্য একটা প্রসঙ্গে। বাংলায় যাকে বলে স্বাস্থ্যপান, তার ইংরাজিও টোস্ট করা। একে অপরের দিকে মদের গেলাস তুলে 'চিয়ার্স' করার আগে সাহেবরা বলেন, Let's make a toast। পোড়া রুটির সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? আবার চলে যাই রোমান আমলে। রোমানরা

মদের গেলাসের তলায় একেবারে পোড়া জ্বলে যাওয়া একটা রুটির টুকরো ফেলে দিতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল এতে নাকি মদের স্বাদ বাড়ে। অনেকের মতে তা না। আসলে মদের সঙ্গে মিশে থাকা অপদ্রব্যদের শুষে নিত সেই জ্বলে যাওয়া পাউরুটি, নীলকণ্ঠ শিবের মতো। মদের স্বাদ বাড়ত সে কারণেই। আজকাল ওয়াটার পিউরিফায়ারে অ্যাক্টিভেটেড চারকোলের যা কাজ, এর কাজ ঠিক তাই ছিল। ষোড়শ শতক অবধি মদের গেলাসে এই টোস্ট ফেলে পান করার রীতি চালু ছিল। ধীরে ধীরে টোস্ট গেলাস থেকে বিদায় নিল। শব্দটা রয়ে গেল।

১৮৫১ সালের কাঠখোদাই চিত্র

মধ্যযুগে ইংল্যান্ডে রাজারা এই টোস্টকে আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন। টোস্ট করার সময় তাঁরা গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি লাগাতেন। এতে নাকি পারস্পরিক ‘ভাইচারা’ বাড়ে। এসব কিস্যু না। রাজারা বেজায় ভয়ে থাকতেন, পাছে তাঁদের মদে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলা হয়। সেই ভয়ে গেলাস ঠোকার নামে নিজের গেলাসের মদ কিছুটা অন্য রাজার

গেলাসে চলকে দিতেন। 'মরলে আমি একা মরব কেন, তুইও মর।' পরের বার গেলাস ঠেকিয়ে চিয়ার্স বলার আগে একবার ভেবে দেখবেন।

ফ্রেঞ্চ টোস্ট-এর আজব আখ্যান

ডিম-পাউরুটি নামে ছোটো থেকে যাকে চিনি, সে যে আসলে ফ্রেঞ্চ টোস্ট তা জানতে বহুদিন সময় লেগেছিল। দিল্লিতে পড়তে গিয়ে এক ক্যান্টিনে খেতে গিয়ে 'ফরেন টোস্ট' নামে একটি খাবারের নাম শুনে অর্ডার দিয়েছিলাম। নিতান্ত দিশি এই ডিমে চুবানো রুটি ভাজা দেখে বেজায় রেগে গেছিলাম বলাই বাহুল্য। যাক গে যাক। ফরাসিরা কিন্তু এই খাবারকে ফ্রেঞ্চ টোস্ট বলে না। বলে pain perdu বা নষ্ট রুটি। যে রুটি টোস্ট করা হয়নি, ফলে নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে না ফেলে দিয়ে খাওয়ার উপায় ছিল ডিম, দুধ আর অল্প চিনির গোলায় চুবিয়ে মাখন দিয়ে ভেজে ফেলা।

তাহলে ফ্রেঞ্চ টোস্ট নাম এল কোথা থেকে? ব্রিটেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অবধি এঁকে ডাকা হত জার্মান টোস্ট নামে। যেই না যুদ্ধ বাধল, দেশপ্রেমী ইংরেজরা জার্মান নামের সব কিছুকে নতুন করে নাম দিলেন। ব্রিটিশ রাজপরিবার নিজেদের জার্মান পদবি স্যাক্সে-কোবার্গ-গোথা বদলে করলেন উইন্ডসর, জার্মান শেফার্ডের নাম রাখা হল অ্যালসেশিয়ান, আর জার্মান টোস্ট হয়ে গেল মিত্র দেশ ফরাসিদের নামে ফ্রেঞ্চ টোস্ট। ফ্রেঞ্চ টোস্টের নামবদল এই শেষ না। ২০০৩ সালে আমেরিকার ইরাক অভিযানের তীব্র নিন্দা করে ফরাসি সরকার। রাতারাতি মার্কিনরা ফ্রেঞ্চ টোস্টকে ফ্রিডম টোস্ট নামে ডাকতে শুরু করলেন।

কিন্তু যে দেশ থেকে ফ্রেঞ্চ টোস্ট ইংল্যান্ডে আসে, সেই জার্মানরা এঁকে কী বলেন? সেখানে এর নাম Arme Ritter বা গরিব নাইট। এই নামটা থেকে কিন্তু খাবারটার ইতিহাস নিয়ে বেশ অনেকটা জানা যায়। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত একশো বছরের যুদ্ধের (১৩৩৭-১৪৫৩) মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৩৪৬-এর সারসির যুদ্ধ। ইংল্যান্ড তাতে নতুন আবিষ্কৃত লম্বা ধনুক ব্যবহার করে জিতলেও বেশ কিছু নাইট ফরাসিদের হাতে ধরা পড়েন। ফরাসিরা তাঁদের প্রাণে না মারলেও ছাব্বিশজন ধনী নাইটের জমি, টাকা সব কেড়ে তাঁদের কপর্দকশূন্য করে ছেড়ে দেয়। বেচারারা ফিরে এলে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড তাঁদের ও তাঁদের পরিবারদের উইন্ডসর ক্যাসেলের একদিকে থাকার অনুমতি দেন। সামান্য পেনশনও তাঁরা পেতেন প্রতি মাসে। এই নাইটদের ডাকা হত উইন্ডসরের গরিব নাইট নামে। তাঁরা তখন ডিম-পাউরুটি খেয়ে জীবনধারণ করতেন কি না জানা নেই, তবে কিছু তো একটা হয়েছিল, নইলে এই

খাবারের নামের সঙ্গে তাঁদের নাম জুড়ল কেমন করে?

১৮৩০ নাগাদ এই নাইটদের পরিবার রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের কাছে দরবার করে। ততদিনে তাঁরা বেশ বড়োলোক। রাজা তাঁদের নাম বদলে উইন্ডসরের সামরিক নাইট করে দেন। তবে অনেকে বলেন জার্মান টোস্টের নাম ফ্রেঞ্চ টোস্ট করার পিছনে এই নাইটদের প্রতি নাকি সামান্য খোঁচাও ছিল, যাতে তাঁরা তাঁদের অতীত না ভুলতে পারেন। কার মনে কী আছে কে জানে?

মার্মালেড আর এক অসুস্থ রানি

মেরি, কুইন অফ স্কট (১৫৪২-৮৭) চলেছেন ফ্রান্স থেকে স্কটল্যান্ডের উদ্দেশে। মাঝরাস্তায় উঠল প্রবল ঝড়। জাহাজ টলমল। রানি বলে কি তাঁর শরীর থাকতে নেই! সি-সিকনেসে কাবু হলেন রানি। কিচ্ছুটি দাঁতে কাটতে পারছেন না। যা খাচ্ছেন বমি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রাণ বাঁচাতে দেবদূতের মতো হাজির হলেন তাঁর ফরাসি শেফ। অদ্ভুত এক খাবার বানিয়ে রানিকে খাওয়ালেন তিনি। রানি সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। অসুস্থ রানি মেরির নামে খাবারের নাম হল Marie malade আর সেই থেকে মার্মালেড। খুঁজে দেখলে এই গল্পটা অনেক বইতেই পাবেন। শুনতে ভারী ভালো, যদি না জানা যায় অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির মতে প্রথমবার ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটার প্রয়োগ দেখা যায় ১৪৮০ সালে, মেরির বাবার জন্মেরও আগে। আসলে শব্দটির ব্যুৎপত্তি Marie থেকে নয়, পর্তুগিজ শব্দ marmelada থেকে, যার অর্থ কুঁচফলের চাটনি (কুঁচফলকে ওঁরা marmelo বলে থাকেন)। ১৪০০ সাল নাগাদেই ফল প্রচুর দামে ব্রিটেনে আনা হত। একমাত্র অভিজাতরাই এই চাটনি চেখে দেখতে পারতেন। ফলে যাঁদের এই ফল কেনার সামর্থ্য ছিল না, তাঁরা কমলালেবু বা অন্য লেবু দিয়ে একইরকম ভাবে থকথকে চাটনি বানিয়ে খেতেন আর ভাবতেন মার্মালেড খাচ্ছি। জেনে রাখা ভালো, মার্মালেড কিন্তু খাওয়া হত খাবার পরে মিষ্টি বা চাটনির মতো। সকালে রুটির সঙ্গে জ্যামের মতো না।

রুটিতে মার্মালেড মাখিয়ে খাওয়া ঠিক কবে চালু হল বলা মুশকিল। তবে বেশির ভাগেরই মত, ১৭৯০ সালে মিসেস জ্যানেট কিলার এই রীতি চালু করেন। স্কটিশরা এমনিতেই কিপটে বলে বিখ্যাত। মিসেস কিলার যখন মার্মালেড বানালেন, তাতে এত বেশি জল দিলেন যে তা জেলির চেহারা নিল। তবে মিসেস কিলারকে ধন্যবাদ। তিনিই প্রথম অভিজাতদের হাত থেকে মার্মালেডকে নিয়ে জনগণের উপযোগী করে দিলেন। ভোরবেলায় ব্রেকফাস্টে ইংরেজ মধ্যবিত্তরাও রোমান টোস্টের সঙ্গে পর্তুগিজ মার্মালেডের স্কটিশ সংস্করণ মাখিয়ে তারিয়ে

তারিয়ে খেতে লাগলেন।

এগস বেনেডিক্ট— 'আসলে' কার আবিষ্কার?

১৯৪২ সালে নিউ ইয়র্কার পত্রিকায় জনৈক রিটায়ার্ড স্টকব্রোকার লেমুয়েল বেনেডিক্টের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। তাতে তিনি জানান, ১৮৯৪ সালের এক সকালে ওয়ালডর্ফ হোটেলে ব্রেকফাস্টে বসে তাঁর কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না। শেষে বিরক্ত হয়ে তিনি শেফ অস্কার চিরকিকে বললেন একটা প্লেটে করে বাটার টোস্ট, ডিমের পোচ, মুচমুচে বেকন আর হল্যান্ডেইস সস নিয়ে আসতে। শেফের এই কম্বো এত ভালো লাগল যে পরের দিন থেকেই তিনি হোটেল মেনুতে এই খাবার ব্রেকফাস্ট হিসেবে রাখলেন। শুধু টোস্টের জায়গায় মাফিন আর বেকনের জায়গায় হ্যাম।

এগস বেনেডিক্ট

বেকন নিয়ে দু-চার কথা বলে রাখি এই ফাঁকে। নুন দিয়ে জারিত শূকরের মাংস বেকন নামে পরিচিত। পেট বা পায়ের পিছনের দিক থেকে সরু সরু টুকরোতে বেকন কাটা হয়। ইংল্যান্ডে এককালে গরিবদের একমাত্র মাংসের উৎস ছিল এই বেকন। তাই 'bringing home the bacon' মানে আজও বাড়িতে বড়োসড়ো আয়কেই বোঝায়। এর পিছনেও একটা গল্প আছে। বলেই ফেলি। ১১০৪ সালে ইয়ুগা নামে এক মহিলা এসেক্সে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করেন। টানা এক বছর একদিন যেসব দম্পতি একেবারে একবারও ঝগড়া না করে থাকতে পারবেন, তাঁদের একটা মোটাসোটা শূকরের একপাশ উপহার দেওয়া হবে। প্রথম পাঁচশো বছরে নাকি মাত্র আটজন দম্পতি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঠিকই আছে। অবাক

হবার কিছু নেই।

ফিরে আসি এগস বেনেডিক্টে। নিউ ইয়র্কারে খবর বেরোনো মাত্র চিঠির বন্যা শুরু হল। এডওয়ার্ড মন্টগোমারি নামে এক ভদ্রলোক লিখলেন, তাঁর কাকার বন্ধু ই সি বেনেডিক্ট নাকি এই রেসিপির আসল স্রষ্টা। সেই ধাক্কা যেতে না যেতেই ম্যাসাচুসেটস থেকে ম্যাবেল বাটলার নামে এক মহিলা লিখলেন, 'আসল ঘটনা' হল তাঁদের প্রতিবেশী বেনেডিক্টরা প্রায়ই ডেলমোনিকোর রেস্টুরেন্টে ব্রেকফাস্ট খেতে যেতেন। একদিন রোজকারের খাওয়ায় বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের ইচ্ছেমতো মেনুর অর্ডার দেন। সেটাই নাকি এগস বেনেডিক্ট। প্রত্যেকেই দাবি করেছেন তাঁর ঘটনাটাই নাকি আসল ঘটনা।

EVERY BODY'S

TOAST BOOK,

AND

CONVIVIAL COMPANION;

CONTAINING

THE CHOICEST COLLECTION EVER ISSUED,

AND

BRIMMING OVER

WITH TOASTS AND SENTIMENTS FOR ALL CLASSES
AND ALL OCCASIONS.

BY AN ADEPT.

"COME, LET THE TOAST PASS!"

PUBLISHED BY
FISHER & BROTHER,
No. 15 NORTH SIXTH STREET, PHILADELPHIA
74 CHATHAM STREET, NEW YORK.
71 COURT STREET, BOSTON;
62 BALTIMORE STREET, BALTIMORE.

Every body's toast বইয়ের টাইটেল পেজ

এদিকে বইপত্র ঘেঁটে যা পেলাম, তাতে আরও ঘেঁটে গেলাম। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত 'Eggs, and How to Use Them' বইতে পাঁচ হাজার রকম ভাবে ডিম রান্নার পদ্ধতি আছে।

খুঁজে দেখলে দেখা যাবে বেনামে সেখানেও এগ বেনেডিক্টের রেসিপি আছে। ১৯০০ সালে Cunnecticut Magazine-এ আবার বেনামে এই রেসিপি ছাপা হয়। অবশেষে আজকাল খাদ্য বিশারদরা মেনে নিয়েছেন এই আদ্যন্ত আমেরিকান খানাটিও আদতে ফরাসিদের থেকে এসেছে। পাঁচশো বছরেরও আগে থেকে ফ্রান্সে 'Oeufs a la Benedictine' নামে ঠিক এই খাওয়াটাই প্রচলিত ছিল। বেনেডিক্টাইন সাধুদের মাংস খাওয়ায় বাধা থাকায় তাঁরা মাছ বা অন্য সিফুড দিয়ে ডিমের এই প্রিপারেশানটা খেতেন।

একটা কথা বলেই শেষ করি। আমেরিকায় এগ বেনেডিক্ট আর্নল্ড নামে এক ব্রেকফাস্টে মাফিনের বদলে বিস্কুট দেওয়া হয়। এই আর্নল্ড ছিল কুখ্যাত ব্যাক্তি বেনেডিক্ট আর্নল্ড। সে ব্যাটা আমেরিকার যুদ্ধের মাঝামাঝি নাকি দলবদল করে ব্রিটিশদের হয়ে লড়েছিল। এমন লোককে আমেরিকার এক খাবার কীভাবে বিখ্যাত করে দিল, তা ভাববার বিষয়।

পরিজ এল কোথা থেকে?

তপন রায়চৌধুরী তাঁর 'বাঙালনামা'য় পরিজের বিস্তর নিন্দামন্দ করেছেন। ইংরেজদের নাকি স্বাদ বলে কিছু নেই, আর তাই পরিজের মতো কুখাদ্য খেয়ে সুখ্যাত করেন। আসল গল্পটা কিন্তু অন্যরকম। আলোকপ্রাপ্ত হবার জন্য কোন এক সুদূর অতীতে গৌতম এক বৃক্ষের তলায় বসে তপস্যা করছেন। তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলেছেন। একদিন তীব্র ক্ষুধার দহনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন গৌতম। সুজাতা নামে এক কৃষককন্যা তাঁর মুখের সামনে ধরল অল্প দুধ দেওয়া চালের পরিজ। আরে হ্যাঁ। আমরা যতই পায়েস বলি না কেন, সাহেবরা মাথা নেড়ে নেড়ে বলেন, না না ওটাই প্রথম পরিজ। এই পরিজ খেয়েছিলেন বলেই গৌতম নাকি বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। মজা হল বুদ্ধ এই পরিজের (নাকি পায়েসের?) পাঁচটি গুণও বলে গেছেন। এ জিনিস খেলে নাকি হজমশক্তি বাড়ে, তৃষ্ণা নিবারণ হয়, ক্ষুধানিবৃত্তি ঘটে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমে আর বায়ু নির্গমন একেবারে কমে যায়। তাই অমৃতের পর্যায়ে এই খাদ্যকে রেখেছিলেন তিনি।

নেপোয় মারে অমলেট

অমলেট শব্দটা আমি অনেক লেটে শুনেছি। ছোটোবেলায় মামলেট বলেই এঁকে চিনতাম। কাঁচা সরষের তেলে আধভাজা মামলেট, ভিতরে পেঁয়াজ আর লংকার কুচি, ভাবলে এখনও জিভে জল আসে। অমলেট আসলে পার্সি খাদ্য হলেও নামটা খাঁটি ফরাসি। ফরাসি শব্দ alumelle মানে ছুরির ফলা। পাতলা ছুরির ফলার মতো পাতলা এই খাদ্য তাই অমলেট নামে

খ্যাত হয়। অনেকে আবার বলেন ল্যাটিন শব্দ ল্যামেলা নামে পাতলা চাটু। সেখান থেকেই নাকি অমলেট এসেছে। ইংরাজিতে প্রথমবার ১৬১১ সালে প্রকাশিত র‍্যান্ডাল কটগ্রেভের লেখা 'Dictionary of the French and English Tongues' বইতে 'Homelette... an Omelet' শব্দটা পাওয়া যায়। ১৬৫৩ সালে বিখ্যাত ফরাসি শেফ ফ্রাঁসোয়া পিয়ের ভার্নে তাঁর মিথ হয়ে যাওয়া খাওয়ার বই 'Le Pattissier francois'-এ অমলেট বানানোর শ-খানেক রেসিপি দিয়ে দেন। ১৬৬০ সালে বইটার ইংরেজি অনুবাদ হবার পর ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরেও ফরাসি অমলেট জায়গা করে নিল।

ফরাসি অমলেটের সঙ্গে সঙ্গে যে অমলেট মুখে মুখে জায়গা করে নিয়েছে (আক্ষরিক অর্থেই), তার নাম স্প্যানিশ অমলেট। কথিত আছে এই অমলেট এক জেনারেলের আবিষ্কার। তাঁর নাম টমাস দি সুমালাকারাগুই ওয়াই ডি ইমাজ (ভদ্রলোককে আমরা ইমাজ বলেই ডাকব)। ১৮৩৩ সালে স্পেনে রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দের মৃত্যু হলে তাঁর নাবালিকা কন্যা ইসাবেলা সিংহাসনের দাবিদার হন। কিন্তু অমাত্যরা কেউ তাঁকে রানি মানতে রাজি ছিলেন না। জেনারেল ইমাজ নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইসাবেলার পক্ষে যুদ্ধে নামেন। স্পেনের সেই গৃহযুদ্ধে ১৮৩৫ সালে বিরোধীরা বিবলাও শহর দখল করে নেয়। প্রাণের ভয়ে ইমাজ পালিয়ে অনেক দূর গাঁয়ের এক চাষির বাড়ি আত্মরক্ষা করেন। চাষিবউ তাঁকে চিনতে পারেন। কিন্তু ঘরে খাবারদাবার বাড়ন্ত। এদিকে জেনারেলের পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। খানিক বাদে বাদেই বলছেন 'খাবার লে আও।' চাষিবউ হাতের সামনে যা পেলেন, আলু, পেঁয়াজ আর কিছু ডিম, মিলিয়ে মিশিয়ে ভেজে এক জব্বর অমলেট বানিয়ে আনলেন। খিদের মুখে সেই অমলেট খেয়ে ইমাজ একেবারে তর হয়ে গেলেন। পরে যুদ্ধ জিতে নিজের শেফকে দিয়ে নিয়মিত ওই অমলেট বানাতেন শুধু না, গোটা সৈন্যবাহিনীকে খাওয়াতেন।

সৈন্যদের সঙ্গে অমলেটের সম্পর্ক এখানেই শেষ নয়। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান একবার সব সৈন্যদের নিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের বেসিয়ায় উপস্থিত হলেন। সারা দিনমান ঘোড়ায় চড়ে ক্লান্ত নেপোলিয়ান এক স্থানীয় সরাইখানায় নেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খাবার আছে হে?' সে অনেক ভেবে পুরু একখানা অমলেট বানিয়ে দিল। নেপোলিয়ান খুশ। পরের দিন আদেশ দিলেন সেই গ্রামের যত লোকের বাড়ি যত ডিম আছে সব একত্র করে বিশাল একটা অমলেট বানাতে হবে। তাঁর সেনারা সেটাই কেটে কেটে খাবে। ব্যস! সেদিন গাঁয়ের লোকেদের আর ডিম খাওয়া হল না। বিশাল কার্পেটের সাইজের একখানা অমলেট বানানো হল গোটা সেনাবাহিনীর জন্য। এখনও তেমন অমলেট বানানো হয়, যার নাম ইস্টার অমলেট। গাঁয়ের

লোকের আত্মত্যাগের প্রতীক ছিল সেই অমলেটখানা। দুষ্টু ইংরেজরা এই নিয়ে প্রবাদ বানাল, "You can't make an omelette without breaking eggs"— গোদা বাংলায়, 'ত্যাগ না করলে কিছু পাওয়া যায় না।' সাধে বলছিলাম, নেপোয় শুধু দই মারে না, অমলেটও মারে।

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি

প্রথমেই গোদা তথ্যগুলো বলে রাখি। গল্প পরে হবে। ১৮৩০ সালে প্যারিসের ৯২, রু দ্য রিশেলু-তে অগাস্ট জ্যাং নামের এক অবসরপ্রাপ্ত অস্ট্রিয়ান অফিসার বেকারি খুলে বসেন। সেখানে নানা খাদ্যের সঙ্গে অস্ট্রিয়ায় ত্রয়োদশ শতক থেকে প্রচলিত রুটি কিপফ্রেল-ও ছিল। নতুন চাঁদের বাঁকা ফালির মতো দেখতে এই রুটি ফরাসিদের দারুণ পছন্দ হল। তাঁরা নিজেদের বেকারিতে এই রুটি বানাতে শুরু করলেন, শুধু জার্মান খটমটে কিপফ্রেল নামটা বদলে ফরাসি সুমিষ্ট ক্রোসোঁ (যা আসলে ইংরাজি crescent বা চাঁদের ফালির নামান্তর) বানিয়ে দিলেন। নামে কি যায় আসে?

এখানে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। একটু খোলসা করেই বলি। কলকাতার যদুবাবুর বাজারে এক বাঙাল বেগুন বিক্রি করছে। বেশ জোরে জোরে বলছে, "বাইগন ন্যান বাইগন। এক কিলো আট আনা। " ভবানীপুরিয়া এক পাঁড় ঘটি ভাবল একে নিয়ে একটু রগড় করা যাক। এসে বলল, "তুমি কী বলছ গো! বাইগন বাইগন? শুনতে কী জঘন্য..."

বাঙালের মাথা গরম হতে শুরু করছে। সে বলল, "ক্যান? আফনে এরে কী বইল্যা ডাকেন?"

"বেগুন। দ্যাখো কী মিষ্টি নাম?" এবার ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়াল। বাঙালদের হাজির জবাবে হারানো মুশকিল। একটু হেসে সে বলল, "মিষ্ট নামই যদি চান, তবে প্রাণনাথ কইরা ডাকেন... হেডা তো আরও মিষ্ট! ন্যান এক কিলো প্রাণনাথ আট আট আনায় লইয়্যা যান..."

ক্রোসোঁর গল্প অবশ্য এখানেই শেষ নয়। কিপফ্রেলের বাঁকা চাঁদের মতো চেহারা হল কীভাবে, তা নিয়ে লম্বা ইতিহাস আছে। অনেকে বলেন এই বাঁকা চাঁদ আসলে মুসলমানদের বাঁকা চাঁদের প্রতীক। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি আর তুর্কির মধ্যে যে বিখ্যাত তুরের যুদ্ধ হয়, তাতে জার্মান খ্রিস্টানরা জয়লাভ করেন। সেই যুদ্ধ জেতার উৎসবে নাকি প্রথম এই রুটি তৈরি হয়েছিল। অবশ্য বেশির ভাগ ঐতিহাসিক অন্য একটা থিয়োরি মানেন। তাঁদের মতে কিপফ্রেল এতটাও পুরোনো না। ১৬৮৩ সালে তুর্কিরা ভিয়েনার চারদিক ঘিরে ফ্যালে। এক রাতে ভিয়েনার রুটি-বানিয়েরা আচমকা শুনতে পান শহরের প্রাচীরের গায়ে কীসের যেন

শব্দ! তাঁরা কান পেতে বুঝতে পারেন তুর্কি সেনারা সুড়ঙ্গ কেটে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সেনাবাহিনীকে জানান। তুর্কি সৈন্যরা শহরে ঢোকামাত্র তাদের জবাই করা হয়। তাই যতবার ভিয়েনার মানুষরা নরম গরম কিপফ্রেল চায়ে ডুবিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খান, ততবার তুর্কিদের মুন্ডু চিবানোর বিমলানন্দ উপভোগ করেন। মুশকিল একটাই। বেশির ভাগ অস্ট্রিয়ান এখন ভুলে গেছেন যে, রুটিটা তাঁদের। ফরাসিদের না।

খাঁটি ইংরেজ প্রাতরাশ

একেবারে প্রথম লেখাটার কথা আবার তুলে আনি। সপ্তদশ শতাব্দী অবধি গোটা ইউরোপ জুড়েই মাত্র দুই ধরনের খাওয়া ছিল। দুপুরের খাওয়া বা লাঞ্চ, যাকে ডিনার হিসেবে বেলা এগারোটার একটু আগে খাওয়া হত। আর সন্ধ্যার খাওয়া বা সাপার। যা খাওয়া হত দিনের আলো নেভার আগেই। ঘুম থেকে উঠেই খাই খাই করার বাতিক ছিল না । অফিস কাছারির ঝামেলা ছিল না। একমাত্র বৃদ্ধ আর শিশু ছাড়া ঘুম থেকে উঠেই খাওয়ার চল ছিল না কারও মধ্যে। যেই না লাঞ্চের সময় পিছিয়ে বারোটার ওদিকে গেল, অমনি সকালে সবার খিদে পেতে শুরু করল।

বিশেষ করে আগেই বলেছি, রাতের খাওয়া খুবই সামান্য ছিল। অতক্ষণ খালি পেটে থাকা। সকালে খিদে তো পাবেই। ফলে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে সকাল সকাল উঠেই পেট ঠেসে খাবার একটা প্রবণতা জন্ম নিল। ১৭০০ সালের শেষদিকে ব্রিটেনের ব্রেকফাস্ট হত সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে, আর তাতে মদ, রুটি, মাংস তিনটেই থাকত। কিছুদিন বাদে তাঁরা

ভাবলেন, শুধু এই তিনটে কেন? বাকিরা কী দোষ করল? এদিকে এই সময় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের হাওয়া লেগেছে। মানুষের হাতে টাকাকড়ি এসেছে। ফলে মধ্যবিত্তরাও চাইল বড়োলোকি চাল দেখাতে। আর তা থেকেই এল বুফে ব্রেকফাস্ট। ফল, সবজি, পানীয়, মাংস, রুটি, সব নিয়ে যা-তা ব্যাপার। এর ঠিক পরপরই ইংরেজরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেইসঙ্গে ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোতে ইংরেজি কেতা ঢুকে গেল অচিরেই। অন্যদের থেকে ইংরেজদের তফাত এখানেই। অন্যরা যে দেশে গেছে সে দেশের আদবকায়দা রপ্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। ইংরেজরা উলটো। নিজেরা বদলায়নি একটুকুও, বরং যে দেশে ঘাঁটি গেড়েছে, সেই দেশকে ইংল্যান্ড বানিয়ে দিয়েছে। ফলে ভারতের গরমে ঘামতে ঘামতে কোট পরে ফুল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট খাবার কথা লিখেছেন ফ্যানি পার্কস সহ অনেকেই। তাঁর লেখায় ইংরেজদের ব্রেকফাস্টের মেনু নিয়ে যা জানা যায় তা এইরকম, 'সিদ্ধ মাছ, মাংসের চপ, মাংসের স্টেক, ভেড়ার মাংস ভাজা, ভেড়ার মেটের তরকারি, মরশুমি ফল, সসেজ, বেকন, ডিমের পোচ, অমলেট, সিদ্ধ ডিম, টোস্ট, পাউরুটি, মার্মালেড, মাখন, মদ....' আর সকাল সকাল এই খেয়েই আমাশা আর পেটের গন্ডগোলে ইংরেজ রাইটারেরদের লবেজান। ঠিক এই সময় এক মার্কিন পাদবী ব্রেকফাস্টে বৃহত্তম বিপ্লবটা আনলেন।

ব্যাটল ক্রিকে সিরিয়াল যুদ্ধ

ডায়েটিং ব্যাপারটা কিন্তু আদতে আমেরিকার দান। মার্কিন দ্রুতগতির জীবনে শরীর সুস্থ রাখাটা একটা বড়ো দায়। ঊনবিংশ শতকের শুরু অবধি আমেরিকানরা ব্রিটিশদের মতো ভরপেট ব্রেকফাস্ট করত। মুশকিল হল, এই খাবারে আর যাই থাক ফাইবারের পরিমাণ কম। তাই দিনের পর দিন খেলে পেট ছাড়তে বাধ্য। যথারীতি আমেরিকানরা গণহারে পেটের সমস্যায় ভুগতে লাগল। কাজে মন বসত না। দিনরাত পেটের চিন্তা। প্রথম যে ভদ্রলোক এর জন্য ফুল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট-কে দায়ী করেন, তাঁর নাম রেভারেন্ড সিলভেস্টার গ্রাহাম। চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠটাও তাঁর ছিল না, তবু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ময়দা নয়, আটার রুটি খেলেই এ সমস্যা কমতে পারে। শুধু মুখেই বলা না, কিছুদিনের মধ্যেই গ্রাহাম ব্রেড আর গ্রাহাম ক্র্যাকার নামে তিনি আটার রুটি আর বিস্কুট বানিয়ে বিক্রি শুরু করেন। নিজে নিরামিষাশী এই ভদ্রলোক নিরামিষ খাবার উপকারিতা নিয়েও জ্ঞান দিতেন। ধীরে ধীরে তাঁর সমর্থক বাড়তে থাকে আর ব্রেকফাস্টে সিরিয়াল বা শস্যজাতীয় কোনও সুখাদ্যের সন্ধান

শুরু হয়।

১৮৫৮ সালে ডাক্তার জেমস ক্যালেব জ্যাকসন নিউ ইয়র্কে পেটের রোগীদের জন্য এক স্যানাটোরিয়াম খোলেন। এতে রোগীদের স্নান করতে দেওয়া হত না (মা গো!), আর গোরু ছাগলের মতো নানা শস্য কাঁচা খেতে দেওয়া হত (ঘাস বাদে)। খুব স্বাভাবিক যে কিছুদিনের মধ্যেই এই স্যানাটোরিয়াম লালবাতি জ্বালে। কিন্তু এই জ্ঞানকে সঙ্গী করে ১৮৬৩ সালে জ্যাকসন গ্রানুলা নামে একটি ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল বানান, যা পৃথিবীর প্রথম বাজারজাত ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল। সারারাত একে দুধে ভিজিয়ে রাখতে হত। তারপরেও সকালে চিবিয়ে খেতে গেলে রীতিমতো দাঁতের জোর লাগত। তবু শরীর বড়ো বালাই। গ্রানুলা আমেরিকায় এত বিখ্যাত হয়ে যায়, যাতে ডাক্তার জ্যাকসন স্যানাটোরিয়ামের ক্ষতি পুষিয়ে প্রায় দশ গুণ লাভ করেন। গ্রানুলা হয়তো আরও বাজার কাঁপাত, যদি না মিশিগানের ব্যাটেল ক্রিকের স্যানাটোরিয়ামে তরুণ এক ডাক্তার দায়িত্ব নিতেন।

ডাক্তারের নাম জন হার্ভে কেলগ। ব্যাটেল ক্রিকের স্যানাটোরিয়ামটা চালাতেন মঠের সাধুরা। সেখানে নিজের মতো রেঁধে খাওয়া অসম্ভব। এদিকে সকাল হলেই ভদ্রলোকের খুব খিদে পেত। কী করা যায়? ভাবতে গিয়ে তিনি বুঝলেন এমন কিছু একটা রেডিমেড খাবার বানাতে হবে, যা তৈরি করতে আগুনের দরকার নেই, নিরামিষ আর খিদেও মেটাবে। সমস্ত ভেবে-টেবে ১৮৮০ নাগাদ গমের, ওট, ভুট্টার গুঁড়ো মিশিয়ে ছোটো ছোটো বিস্কুটের মতো এক ধরনের খাবার বানালেন তিনি, যা এমনিও খাওয়া যাবে, আর দুধে ভিজিয়েও। নাম দিলেন গ্রানোলা। গ্রানুলার খ্যাতি ততদিনে প্রায় অস্তমিত। এই নতুন গ্রানোলা সেই জায়গা নিয়ে নিল রাতারাতি। কেলগ দেখতে দেখতে বড়োলোক হয়ে গেলেন।

কিন্তু বাকিরাও বসে ছিল না। ১৮৯৩ সালে হেনরি পার্কি নামে ডেনভারের এক উকিল গমকে ফুটিয়ে, নরম করে, রোলারে চ্যাপটা বানিয়ে বিস্কুটের মতো শ্রেডেড হুইট বাজারে আনলেন। এটার মুশকিল একটাই। শুকিয়ে গেলেই এর দানাগুলো ভেঙে ভেঙে পাউডারের মতো গুঁড়ো হয়ে যেত। কেলগ ঠিক করলেন নিজের কারখানায় এই শ্রেডেড হুইট বানাবেন। পার্কির কাছে তিনি গেলেন এর পেটেন্ট কিনতে। তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকা অবধি অফার করেছিলেন কেলগ। পার্কি উকিল মানুষ। কেলগকে ল্যাজে খেলাচ্ছিলেন, যদি আরও বেশি দাম ওঠে। শেষে বিরক্ত হুয়ে কেলগ অফার ফিরিয়ে নিলেন। গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না কেলগের এক বোকামিতে। কথাচ্ছলে তিনি পার্কিকে বলেছিলেন, রোলারে চ্যাপটা বানানোর পরে সরাসরি না শুকিয়ে ঢিমে আঁচে শুকোলে গুঁড়ো হবার চান্স

কম। পার্কি সেটা মাথায় রেখে দিয়েছিলেন। কিছুদিন বাদেই দেখা গেল পার্কির শ্রেডেড হুইট আর গুঁড়ো হচ্ছে না। কেলগের মনোপলিতে ভাগ বসিয়ে পার্কি ডলার গুনতে লাগলেন।

স্বাভাবিকভাবেই কেলগ চটে গেলেন। বেশ কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন শস্যের দানা মিশিয়ে গ্রানোজ ফ্লেক্স নামে একধরনের খাবার বানালেন। তবে ততদিনে কেলগ স্যানাটোরিয়ামের উঁচু পদে আসীন হয়েছেন। নতুন এই ফ্লেক্সের মার্কেটিং-এ একেবারেই সময় দিতে পারছিলেন না। তাঁর সিরিয়াল মূলত রোগীদের খাদ্য হিসেবেই ব্যবহার হত। সাধারণ মানুষ খুব একটা খেতেন না। দায়িত্ব নিলেন কেলগেরই এক রোগী, তাঁর নাম চার্লস উইলিয়াম পোস্ট। ১৮৯১ সালে তিনি কেলগের স্যানাটোরিয়ামে ভরতি হন। এক বছর বাদে যখন বেরিয়ে আসেন, তখন এটা বোঝেন, পাড়ায় পাড়ায় মুদির দোকানে যদি এই সিরিয়ালকে ব্রেকফাস্ট হিসেবে তুলে ধরা যায়, তবে তার চাহিদা হবে প্রচুর। চার বছর ধরে নানা গবেষণা করে চা কফির বদলে গম আর যবের গুঁড়ো দিয়ে এক হেলথ ড্রিংক বানান পোস্ট। নাম দিলেন পোস্টাম। ব্যবসাটা ভালোই জানতেন। প্রচার শুরু করলেন। বললেন, চা আর কফিতে যা ক্ষতি, তেমনটি আর কিছুতে হয় না (ক্ষতির লিস্টে ডিভোর্স, শিশুদের অপরাধপ্রবণতাও ছিল)। একমাত্র উপায় এই পোস্টাম, যত পুষ্টি এতেই লুকানো। খেলেই রক্ত শুদ্ধ হয়ে টকটকে লাল হবে। আমেরিকানরা হুজুগে জাতি। ফলে ১৯০২ সালে পোস্ট এই ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল বেচেই বছরে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার কামাতেন।

কেলগ কর্ণফ্লেক্সের শুরুর দিকের বিজ্ঞাপন

জন হার্ভে কেলগের এক ভাই ছিলেন। নাম উইলিয়াম কিথ কেলগ। তিনি ওই স্যানাটোরিয়ামেই অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতেন। পোস্টকে দেখে তিনিও সিরিয়াসলি ব্যবসা করার কথা ভাবেন। গ্রানোজ ফ্লেক্সে নানারকম শস্য ব্যবহার করা হত। উইলিয়াম শুধু ভুট্টার দানা দিয়ে ফ্লেক্স বানাতে চাইলেন। এই নিয়ে ঝামেলা লাগল দুই ভাইতে। দাদা গ্রানোজ নামটা ব্যবহার করতে দিলেন না। ছোটোভাই আলাদা হয়ে ব্যাটেল ক্রিক টোস্টেড

কর্নফ্লেক্স কোম্পানি নামে কর্ন ফ্লেক্স বানাতে শুরু করেন। ১৯২২ সালে এর নাম বদলে কেলগ'স কর্নফ্লেক্স রাখা হয়। বাকিটা সবার জানা। শুরু থেকে আজ অবধি এই ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালের নানা গুণকীর্তন করা হয়। নানা রোগের ওষুধ থেকে শুরু করে সুষম আহার, বিজ্ঞাপনে কী না লেখা থাকে। মজার ব্যাপার, অন্য দশটা শস্য থেকে ব্রেকফাস্ট সিরিয়ালে খুব বেশি আলাদা কিছু থাকে না। সুষম আহার বরং ওই দুধটা, যাতে আপনি আপনার দামি সিরিয়ালটা ডুবিয়ে খান।

রুটির কথা

রুটি মূলত দুই রকম। আটা বা ময়দা গেঁজিয়ে রুটি আর হাতে গড়া নরম গরম ফুলকো রুটি, যাকে হিন্দিতে চাপাটি বলে। কিন্তু রুটি আবিষ্কারের কথা একটু ভেবে দেখুন, অবাক না হয়ে পারবেন না। গম পেকে গেলে তাকে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় শুকোতে হবে, গুঁড়ো করতে হবে, নির্দিষ্ট পরিমাণ জল দিয়ে মেখে নির্দিষ্ট সময় রেখে দিতে হবে। তারপর হয় ইস্ট দিয়ে বা বেলে গরম করতে হবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়। একটু এদিক ওদিক হল, তো রুটির সাড়ে সর্বনাশ। কিন্তু কথা হল, একেবারে প্রথমে এই জটিল পদ্ধতি মানুষ জানল কেমন করে? এ তো আর ট্রায়াল অ্যান্ড এরর না, যে, বাই চান্স হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এখনও এই প্রশ্নের উত্তর পাননি।

একটু ইতিহাসের গল্প বলি। গম বা গম জাতীয় খাবারের প্রচলন হয় সম্ভবত আজকে থেকে প্রায় ২০ হাজার বছর আগে। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছোটো ছোটো বুনো গম ভেঙে আনতেন। সেখান থেকেই গ্রুয়েল বা গমের জাউ খাবার সূচনা। নব্যপ্রস্তর যুগ থেকেই রুটি তৈরির চল শুরু হয়। প্রথমদিকে মোটা দানার শস্য জলের সঙ্গে মিশিয়ে, ঠেস দিয়ে সেই শস্যের ভিজে তাল তৈরি হয়েছিল। তারপর গরম পাথরের ওপর সেই তাল রেখে, উত্তপ্ত ছাই দিয়ে তা সেঁকা হত। ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরে রুটি তৈরির প্রচলন শুরু হয়। এই মিশরেই শস্য ভাঙা এবং পেষণের জন্য প্রথম পাথরে তৈরি এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, যাকে বলা হত কোরেন। তবে ৫০০০ থেকে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয় সভ্যতার মানুষেরা রুটি তৈরিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। তারা দেখেছিল, 'ইস্ট' দিলে রুটিটা বেশ ফুলেফেঁপে ওঠে। মিশরীয়রাই প্রথম খেয়াল করেছিল, রুটি তৈরির শ্রেষ্ঠ এক উপাদান হলে গম। যদিও জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা এসব শস্য দিয়েও রুটি তৈরি করা যায়। রুটিকে মিশরীয়রা এত ভালোবাসত যে রুটির জন্য হায়ারোগ্লিফিকসে আলাদা চিহ্ন ছিল।
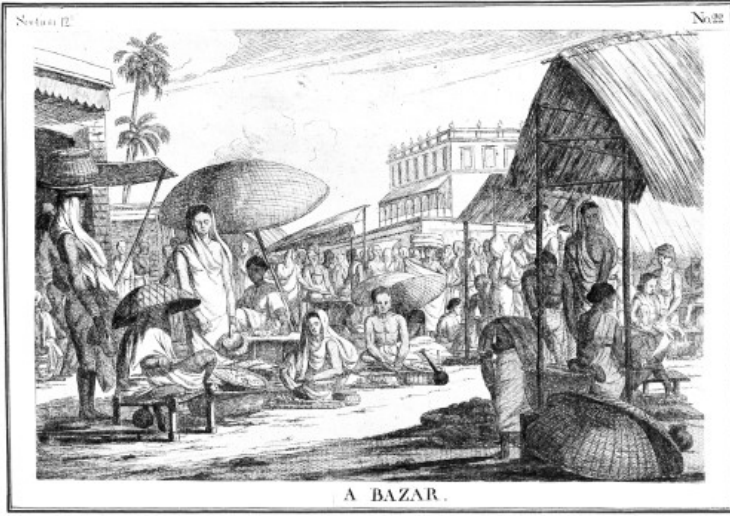
উনিশ শতকে কলকাতার বাজার। বালথ্যাজার সলভিন্সের আঁকায়

প্রাচীন রোমে সর্বপ্রথম রুটি কারিগরদের সংঘ (Bakers Guild)-এর সূচনা হয় ১৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তাঁরা Collegium Pistorum নামে এক কলেজে রীতিমতো রুটি তৈরির শিক্ষা দিতেন, যাতে অভিজাত ঘরের ছেলেরা এসে রুটি বানানো শিখত। সেই সময়ে রুটির কারিগরদের আলাদা মর্যাদা ছিল। তাঁরাই ছিলেন সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে একমাত্র স্বাধীন কারিগর। বাকি সমস্ত কাজ আর ছোটো পেশা দাসদের মাধ্যমে চালানো হত। এই সংঘের সদস্যরা নিজেদের পবিত্রতা বজায় রাখতে দারুণ তৎপর ছিলেন। তাঁরা গ্ল্যাডিয়েটরদের খেলাধুলা, নাটকের ভাঁড়, অভিনেতা বা গণিকা কারও সঙ্গেই মিশতে পারতেন না। এতে নাকি তাঁদের অপবিত্র হবার আশঙ্কা ছিল । আশ্চর্যের কথা, তাঁদের সেই সংঘ আজও বিদ্যমান। যদিও ওসব নিয়ম আজকাল আর চলে না।

২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুকুশ উপত্যকায় নানা শস্যের চাষ-আবাদ শুরু হয়। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মানুষ ঘোড়ার সাহায্যে চাষ-আবাদের কাজ করত। সেসময়ে এই অঞ্চলে রুটি তৈরির প্রচলন শুরু হয়। শুধু তাই নয়, সিন্ধু সভ্যতার আমলেও রুটি ছিল। বিভিন্ন মুদ্রা ও সিলে তার ছবি আছে। তবে হাতে গড়া যে গোল রুটির দোকান আজকাল পাড়ার মোড়ে মোড়ে দেখি, সেই রুটি খুব সম্ভব আফ্রিকা থেকেই এসেছে। সোয়াহিলি উপজাতিদের মধ্যে বহুযুগ ধরে আটার লেচি বেলে গোল করে সেঁকে ফুলকো রুটির প্রচলন ছিল। সেই সময় বাগদাদ বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যিক

সম্পর্ক ছিল। আবার এশিয়া থেকে আফ্রিকার বন্দর ছুঁয়ে ইউরোপে যেত বাণিজ্যতরী। আর এভাবেই পারস্য সহ গোটা এশিয়ায় হাতে গড়া রুটি ছড়িয়ে পড়ে। ফারসি 'চাপাট' মানে থাপ্পড় আর তা থেকেই চাপাটি তার নাম পেয়েছে। তালুতে চাপড় মেরে মেরে তৈরি এই রুটি পর্যটক আর বণিকদের ভারী প্রিয় ছিল, কারণ পথ চলতে চলতে রুটির মধ্যে তরকারি নিয়ে রোল পাকিয়ে খেয়ে নেওয়া যেত। অন্য খাবারে যেমন আয়োজনের ব্যাপার আছে, এই হাতরুটিতে তা একেবারেই নেই। রুটিই এক অর্থে থালাবাটির কাজ করত। সাধারণ মানুষের খাবার হলেও রাজাগজাদের প্লেটে জায়গা পেতে রুটির বেশি সময় লাগেনি। আকবর পাতলা রুটি ঘিয়ে ভিজিয়ে চিনি দিয়ে খেতেন। তাঁর নাতি ঔরঙ্গজেব সবচেয়ে মিতাহারী মুঘল সম্রাট ছিলেন। ফলে তিনি যে হাতে গড়া রুটি পছন্দ করবেন, তাতে আশ্চর্যের কী আছে। মজা হল তুলসীদাস যখন 'রামচরিতমানস' লিখতে বসলেন তখন তিনি প্রাণে ধরে নিজের প্রিয় খাবারকে ত্যাগ করতে পারলেন না। ফলে সেখানে বনবাসী রাম 'রোটিকা' খাচ্ছেন এমন দৃশ্যও দেখতে পাই।

খোদ কলকাতার রাস্তায় পাউরুটি বিক্রি শুরু উনিশ শতক থেকে। রসরাজ অমৃতলালের লেখায় পাই বাদুরবাগানের 'চাই পা-ও-ও-রুটি বিস্কুট, ঝা-য়া-ল বিস্কুট' আসত সকালের দিকে। তাঁর গলায় ঝুলত পইতের গোছা। বাড়িতে চায়ের চল ছিল না। রোগীকে এই পাউরুটি দেওয়া হত। রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত বই বাঙালিয়ানাতে আরও কিছু ফেরিওয়ালার কথা বলেছেন, যারা 'চাই মুংগ কি ডাল', 'হাঁসের ডিম চাই গো'-র সঙ্গে 'বিস্কুট, নানখাট্টাই, গোলাপি রেউড়ি চাই' বলেও বিক্রি করত। তবে বাঙালির ব্রেকফাস্টের সেরা খাবার কী, তা নিশ্চয়ই জানেন। সে কী, জানেন না? 'পাউরুটি আর ঝোলাগুড়'!

লুচি, কচুরি, পরোটা

শুকনো রুটি চিবুতে আর কত ভালো লাগে? রবিবারের সকালে অল্প কালোজিরে, শুকনো লংকা দেওয়া সাদা আলুর তরকারি আর গরম ফুলকো শষ্কুলী... আহা! শেষে একটু ধাক্কা খেলেন? কী আর করা যাবে? ওই নামেই লুচির প্রথম পরিচয়। সুশ্রুতের ভেষজ শাস্ত্রের উপর প্রথম ভাষ্য লেখেন এক বাঙালি, নাম চক্রপাণিদত্ত। তিনি 'দ্রব্যগুণ' বইতে লিখেছেন, 'গোধূম (গম) চূর্ণকে ঘি দিয়ে মেখে, বেলে, গরম ঘি-তে ভাজলে খাজার মতো গুণযুক্ত শষ্কুলী তৈরি করা যাবে।' সেই প্রথম কেউ লুচির উল্লেখ করল। লুচি প্রধানত তিন প্রকার— খাস্তা ('ময়ান দিয়ে ঠেসে, ঘি দিয়ে ভেজে'), সাপ্তা (ময়ান ছাড়া ঘিয়ে ভাজা) আর পুরি (আটার লুচি)।

১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ গ্রন্থে লুচিকে উত্তম ফলারের সর্বপ্রথম উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ধীরেন বলের আঁকায় লুচি

শংকর তাঁর ‘রসবতী’ বইতে বলেছেন, কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলোয় লুচির আকৃতি বড়ো, এবং সেই আকৃতি কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেই ক্রমশ কমতে থাকে। গ্রামবাংলায় প্রচলিত লুচির ব্যাস ছয় থেকে আট ইঞ্চি। কলকাতায় প্রচলিত লুচির ব্যাস তিন থেকে চার ইঞ্চি। মালদা জেলায় লুচির আকৃতি প্লেটের মতো। ব্যাস বারো ইঞ্চির বেশি। ইংরাজবাজারের নিকটবর্তী সাদুল্লাপুর শ্মশান অঞ্চলে হাতিপায়া লুচি বলে একপ্রকার লুচি পাওয়া যায়, যা আকৃতিতে প্রকৃতই হাতির পায়ের মতো। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা ভাগীরথী নদীতে স্নান করার পর হাতিপায়া লুচি খেয়ে থাকেন। হাতিপায়া লুচি ওজন দরে বিক্রয় হয়। মেদিনীপুর জেলার রাধামোহনপুর স্টেশনের কাছে পলাশী গ্রামে নন্দী পরিবারের

ঠাকুরবাড়ির ভোগে নিবেদিত লুচির ব্যাস এক থেকে দেড় ইঞ্চি। গবেষক প্রণব রায়ের মতে এটি সম্ভবত ভারতের ক্ষুদ্রতম লুচি। পূর্ববঙ্গীয় ব্রজে আদর করে লুচিকে বলা হয় ল্যাসাই। দিনাজপুরের রাজবাড়িতে কান্তজির ভোগ হিসেবে প্রতিদিন 'বগি' থালার মতো বড়ো লুচি তৈরি হত। সেই লুচির বিশেষত্ব ছিল, লুচি না ভাঙলে ফোলা অবস্থায় থেকে যেত। মাটির সরা বা পাতলা বাঁশের পাতার খাঁচায় করে ওই লুচি এপার বাংলাতেও এসেছে।

ঊনবিংশ শতকে বিয়েবাড়িতে লুচির প্রবেশ ঘটে। কলাপাতায় বড়ো বড়ো লুচির সঙ্গে দেওয়া হত আলুনি কুমড়োর ছক্কা। কলাপাতার এক কোণে থাকত সামান্য নুন। কলকাতার বাবুরা লুচির পাতলা দিকটা খেতেন, বাকিটা খেত তাঁর চাকরবাকররা। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই, কেশবেন্দ্র দেবের বিয়ের এই মেনুকার্ডে ৩৬ রকম খাবারের মধ্যে পদ্মলুচিও ছিল। এই লুচিতে একাধিক পদ্মের মতো খাঁজকাটা লুচি পরতে পরতে রাখা থাকে। মাঝে থাকে মাংসের কিমা বা ছানার পুর। যজ্ঞিবাড়িতে জাত যাবার ভয়ে লুচিও আলুনি রাখা হত। লুচির ব্যাস ছিল তিন ইঞ্চি, কেবল ঠাকুরবাড়িতে ডবল পয়সার আকৃতির ছোটো ছোটো লুচি হত। তার থেকেও ছোটো, মানে এক বা দেড় ইঞ্চি ব্যাসের ফুলকো লুচির নাম ছিল 'পুচ্ছকা'— যা এখন 'ফুচকা' নামে বিশেষত মহিলাদের মনোরঞ্জন করে চলেছে।

বিভূতিভূষণের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর চালের বাতায় লুচি ভাজার খুন্তি গুঁজে রাখতেন হাজারি ঠাকুর। না জানি তাঁর হাতযশে সেই লুচির কী অসাধারণ স্বাদ খুলত! এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের একাধিক নায়িকা লুচি ভাজায় দস্তুরমতো এক্সপার্ট ছিলেন বলে মনে হয়। পাঠকমাত্রেই মনে রেখেছেন, 'চরিত্রহীন'-এ গভীর রাতে উপেন্দ্রনাথকে বলা কিরণময়ীর সংলাপ, 'আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসো, দুখানা লুচি ভেজে দিতে আমার দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।' জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে নাকি কথায় কথায় লুচির ছররা ছুটত, অবন ঠাকুরের লেখায় তেমনই হদিশ মেলে। 'পথের পাঁচালী'-র অপুও বাবার সঙ্গে যজমানবাড়ি গিয়ে লুচি মোহনভোগ খায়। দোলের দিন গাঙ্গুলী বাড়ি লুচি খেতে গিয়ে তার মনে পড়ে, 'এমন লুচি তার দিদি কখনো পায় নাই।' সুকুমার রায়ও পালোয়ান কবিতায় লিখেছেন,

বিকালবেলা খায় না কিছু গণ্ডা দশেক মণ্ডা ছাড়া,
সন্ধ্যা হলে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া।

লুচি চিরকালই বাঙালির এক অন্যতম ডেলিকেসি। যদিও 'দ্রব্যগুণ'-এ কচুরি আর ডালপুরির কথাও বলা হয়েছে। কচুরির সংস্কৃত নাম 'পূরিকা।' এটি বানাতে গেলে মাষকলাই

বেটে, নুন, আটা, হিং মিশিয়ে পুর তৈরি করে লেচিতে গুঁজে, বেলে তেলে ভাজতে হয়। এটি 'মুখরোচক, মধুর রস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তদূষক, পাকে উষ্ণ বায়ুনাশক আর তেজোহারক।' তেলের বদলে ঘিয়ে ভাজলে এই পূরিকাই রক্তপিত্তনাশক হিসেবেও কাজ করে। পুরোনো কলকাতায় কড়াই ডালের পুরে আদা মৌরি দিয়ে কচুরি রান্না হত। এইখানে কচুরি নিয়ে একখানা পুরোনো ছড়া না বললেই নয়,

'তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খায়
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে মুখ চুলকায়
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে বৃহৎ জন্তু হয়
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে জেলখানায় যায়।'

কচুরির প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে, প্রথম কলকাতায় যখন শিঙাড়া আসে তার নাম দেওয়া হয় তেকোনা কচুরি। অনেকে অবশ্য কচুরিকে রাধাবল্লভির চেয়ে অর্বাচীন মনে করেন। খড়দার শ্যামসুন্দরকে আপ্যায়ন করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব নাকি সেই খাবার উদ্ভাবন করে রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নামে উৎসর্গ করেন। রাধাবল্লভিতে ফোলার ঝামেলা নেই। মাছপ্রিয় বাঙালি অবশ্য মাছের কচুরি বানিয়ে একেবারে ভেজ খাওয়াকে ননভেজ করতেও ছাড়েনি। ডালপুরি আবার বাংলায় যত না, উত্তর ভারতে বেশি বিখ্যাত। এরও একখানা গালভরা সংস্কৃত নাম আছে, বেষ্টনীকা।

অঞ্চলভেদে পরোটার বিভিন্ন উচ্চারণ এবং নাম প্রচলিত আছে। যেমন, পারান্থা, পারাউন্থা, প্রন্থা, পারোন্তে (পাঞ্জাবি), পরোটা (বাংলায়), পালাতা (বার্মায়), পরোঠা (অসমিয়ায়), ফরোটা (সিলেটি ভাষায়) এবং ফারাটা (মরিশাস, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ)। বৈদিক হোম-যজ্ঞে অবশ্য ডাল বা সবজির পুর দেওয়া পুরোডাশ রান্না করা হত। কেউ কেউ বলেন ইনিই পরোটার পূর্বপুরুষ। তবে এখন যাকে পরোটা বলি, তা যতদূর মনে হয় মুঘলদের সঙ্গে আমাদের পাতে এসেছে। আবদুল হালিম শরর তাঁর 'গুজিশতা লখনউ' বইয়ে লিখেছেন, মুঘলরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন চাপাটি আর তন্দুর। সেই চাপাটিতে ঘি থাকত না। এদেশে এসে স্থানীয় মানুষদের ঘিয়ে ভাজা লুচি আর কচুরি খেতে দেখে আটার লেচি বেলার সময় পরতে পরতে ঘি লাগিয়ে বানালেন পরোটা। মানে এখন যাকে লাচ্ছা পরোটা বলি আর কি! ১৬ শতকের মাঝামাঝি সময়ের প্রভাবে পুরোনো দিল্লির চাঁদনি চক এলাকায় একটা সরু গলির নামই হয়েছে 'পরাঠেওয়ালে গলি।'

ঘি-এর বদলে দুধে আটা মেখে বানানো হল বাখরখানি। বাকরখানি রুটির নামের পেছনে আছে এক করুণ ইতিহাস। জনশ্রুতি অনুসারে, জমিদার আগা বাকের তথা আগা বাকির খাঁর নামানুসারে এই রুটির নামকরণ করা হয়েছে। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর দত্তক ছেলে ছিলেন আগা বাকের। প্রখর মেধার অধিকারী আগা বাকের যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদের নর্তকী খনি বেগম এবং আগা বাকের পরস্পরের প্রেমে পড়েন। কিন্ত উজিরপুত্র নগর কোতোয়াল জয়নাল খান ছিল পথের কাঁটা, সে খনি বেগমকে প্রেম নিবেদন করলে তিনি জয়নাল খানকে প্রত্যাখান করেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে জয়নাল খনি বেগমের ক্ষতির চেষ্টা করে এবং খবর পেয়ে বাকের সেখানে যান ও তলোয়ারবাজিতে জয়নালকে হারিয়ে দেন। অন্যদিকে জয়নালের দুই বন্ধু উজিরকে মিথ্যা খবর দেয় যে, বাকের জয়নালকে হত্যা করে লাশ গুম করেছে। উজির ছেলের হত্যার বিচার চায়। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ পুত্র বাকেরকে বাঘের খাঁচায় নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। অবশেষে বাকেরের হাতে মারা যায় বাঘ। ইতিমধ্যে জয়নালের মৃত্যুর মিথ্যা খবর ফাঁস হয়ে গেছে ও সে জোর করে খনি বেগমকে ধরে নিয়ে গেছে দক্ষিণ বঙ্গে। উদ্ধার করতে যান বাকের খনি বেগমকে। পিছু নেন উজির জাহান্দার খান। ছেলে জয়নাল খান বাকেরকে হত্যার চেস্টা করলে উজির নিজের ছেলেকে হত্যা করেন তলোয়ারের আঘাতে। এই অবস্থাতে জয়নাল খনি বেগমকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে। বাকেরগঞ্জে সমাধিস্থ করা হয় খনি বেগমকে। আর বাকের সবকিছু ত্যাগ করে রয়ে গেলেন প্রিয়তমার সমাধির কাছে – দক্ষিণ বঙ্গে। বাকের খাঁর নামানুসারেই বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ (পটুয়াখালি-বরিশাল) অঞ্চলের নাম হয় বাকেরগঞ্জ। ঐতিহ্যবাহী বাকরখানি রুটির নামের পেছনেও রয়েছে এই বাকের-খনির প্রেমের ইতিহাস।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর ‘Dhaka Pachash Barash Pahley’ গ্রন্থে হাকিম হাবিবুর রহমান ঢাকার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের রন্ধনপ্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি প্রধানত গও জোবান, শুকি এবং নিমশুকি তিন ধরনের বাখরখানির কথা বলেন। চিনশুখা রুটিও একপ্রকার বাখরখানি, যা বিশেষত চিনি দ্বারা তৈরি করা হয়। নিমশুখা রুটি ভাজা বাখরখানি। কাইচারুটি এবং মুলামও বাখরখানির অন্য প্রকারভেদ। পনির বাখরখানির প্রতিটি ভাঁজে ঘি ও গম বা সুজির পরিবর্তে হালুয়া ব্যবহৃত হয়। বিবাহ সংক্রান্ত উৎসবে প্রথার অংশ হিসেবে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়ি কিসমিস, কাঠবাদামের সঙ্গে ক্রিম দুধ দিয়ে ডালায় করে পাঠানো হয়, যা ভিগারুটি নামেও পরিচিতি। এটি পুরোনো ঢাকার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রাচীন খাদ্য। লখনউতে মাহমুদ নামের এক পাচক বাখরখানি-কে

আরও অদলবদল করে বানালেন ‘শীরমল’। অচিরেই তা পরোটাকুলের শিরোমণি হয়ে উঠল। সেকালে শাহি উৎসবে আর পরবের দিনে এক লাখ শীরমল বানানোর দাওয়াতও পেয়েছেন মাহমুদ। মুঘল শাসকরা পরোটার সঙ্গে মাংসের বিভিন্ন পদ খেতেন। তবে ধীরে ধীরে নিরামিষাশীরাও নিজেদের মতো আলু, মেথি, ফুলকপি, পনিরের পুর দিয়ে পরোটা বানানো শুরু করলেন।

সবশেষে মোগলাই পরোটার নাম না বললে পাঠক আমায় মাফ করবেন না। মজার ব্যাপার, মোগলাই রান্নার অথেন্টিক কুকবুকগুলিতে কোনও দিনই মোগলাই পরোটার উল্লেখ নেই। আমরা যে ধরনের মোগলাই পরোটা খাই, সেগুলোর নাম মোগলাই পরোটা হলেও এগুলোকে পুরোপুরি মোগলাই খাবার বলা যায় না। মুঘল আমলে যে পুর দেওয়া পরোটা বানানো হত তাতে খাসির মাংসের কিমা দেওয়া হত পুর হিসাবে, ডিম নয়। প্রচুর মশলা দিয়ে খাসির কিমা রান্না করে সেটা পরোটার ভেতরে ভাঁজে ভাঁজে ভরে ঘিয়ে ভাজা হত। আর ভাজার জন্যও ছিল বিশাল আকৃতির তাওয়া। পরবর্তীতে ওই কিমা দেওয়া মোগলাই পরোটা তৈরির পদ্ধতিটাই কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ডিম দিয়ে বানানোর প্রচলন শুরু হয়। আর ঘিয়ে ভাজার বদলে ভাজা হয়ে থাকে তেল দিয়ে। যতদূর জানা যায়, কলকাতার রেস্তোরাঁগুলিতে মোগলাই পরোটার আবির্ভাব দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে। এর স্বর্ণযুগ ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশক। এর পরের থেকে এখন অবধি মোগলাইকে অন্তত দশ গোলে হারিয়ে দিয়েছে এগ রোল, কাঠি রোল। কেন? কারণ সেই একটাই। ব্যস্ততা বাড়ছে। রোল চলতে চলতে খাওয়া যায়, হাত এঁটো হয় না। আর রাজকীয় মোগলাই খেতে গেলে রীতিমতো টেবিল চেয়ারে বসে, সঙ্গে আলুর তরকারি বা কিমার ঝোল নিয়ে বসতে হবে। মানুষের সে সময় কোথায়?

বাঙালির ফলার

বাংলার অতি প্রাচীন একটি জলখাবার ছিল ফলার। ফলার শব্দের পুরো কথাটি হল ‘ফলাহার’, অর্থাৎ, ফলমিশ্রিত আহার। মিহি এবং সরু চিঁড়ে, মুড়কি, শুখা দই, চিনি, মন্ডা, ক্ষীর, পাকা আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয় ফলার। চিঁড়েকে জলে ভিজিয়ে তার সঙ্গে দই ও অন্যান্য ফল মেশাতে হয়। কোথাও কোথাও আবার দুধও মেশানো হয় তার সঙ্গে। মধ্যযুগে বৈষ্ণবদের মধ্যে যে-কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে চিঁড়ে-দই খাওয়া এবং খাওয়ানোর রীতি ছিল। ‘চিঁড়ামহোৎসব’ নামে একটি বড়ো বৈষ্ণব উৎসবে এখনও চিঁড়ে-দই

দিয়ে আপ্যায়িত করা হয় আগত বৈষ্ণব মহাজনদের। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’-তে ওই উৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। পানিহাটিতে নিত্যানন্দের আগমন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মহোৎসব সেই সময় থেকে ‘চিঁড়ামহোৎসব’ নামেও পরিচিত।

চিঁড়ে-দই যে শুধু বৈষ্ণবদের প্রিয় খাবার তা নয়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ‘স্নান করি দুর্বলা/ খায় দধি খণ্ড কলা/ চিঁড়া দই দেয় ভারি জনে।’ অর্থাৎ, মহিলাদের স্নানের পর মধ্যাহ্নভোজের আগে চিঁড়ে-দই-কলা খাওয়ার রীতি ছিল। ‘জীবনস্মৃতি’-তে রবীন্দ্রনাথ ফলারের একটি অন্যরকম বর্ণনাও দিয়েছেন। ‘আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,/ সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে-/ হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,/ পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।’ ছড়া লেখার সূচনালগ্নে বোধহয় নিজের খাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতাই এইভাবে ছড়ার ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন কবি। বস্তুত চিঁড়ে-দই বহুকাল ধরেই বাঙালির ঘরে চটজলদি খাবার বা ফাস্ট ফুড হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। গৃহস্থ ঘরে চিঁড়ে-মুড়ি সহজলভ্য। দইও সহজে পাওয়া যায় এমন জিনিস। এবার তার সঙ্গে যদি একটি কলা বা অন্য ফল মেখে নেওয়া যায় তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যে পেটভরা খাবার তৈরি করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামনারায়ণ তর্করত্নর লেখা ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে উত্তম, মধ্যম ও অধম— এই তিন রকমের ফলারের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে উত্তম ফলারে অনেক কিছু রয়েছে বলে তাকে ঠিক চটজলদি খাবারের পর্যায়ে ফেলা যাবে না, কিন্তু মধ্যম ও অধম ফলার একেবারেই চটজলদি তৈরি করা সম্ভব। মধ্যম ফলারের বর্ণনায় রামনারায়ণ বলেছেন— ‘সরু চিঁড়ে সুখো দই/ মত্তমান ফাকা খই/ খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।/ মধ্যম ফলার তবে/ বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে/ দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়।।’ আর অধম ফলার তো যে-কোনো সময়েই খাওয়া যেতে পারে। ‘গুমো চিঁড়ে জলো দই/ তিত গুড় ধেনো খই/ পেট রা যদি নাহি হয়।/ রোদ্দুরেতে মাথা ফাটে/ হাত দিয়ে পাত চাটে/ অধম ফলার তাকে কয়।।’ মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে সে যুগের নানারকমের খাবারের কথা জানা যায়। সেগুলির মধ্যে তরিবত করে রান্না করা খাবারের কথা যেমন আছে, পাশাপাশি খুব দ্রুত তৈরি করা যায় বা একবার তৈরি করে রেখে অনেক দিন ধরে খাওয়া যায় তেমন চটজলদি খাবারের কথাও রয়েছে। সেগুলির মধ্যে তিলের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, চিঁড়ের নাড়ু, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা, কদমা-খাগড়াই, হাওয়াই মিঠাই, মন্ডা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের অনেক কথা জানতে পারা যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের ‘কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা’ এবং

প্রাণকৃষ্ণ দত্তের ‘কলিকাতার ইতিবৃত্ত’ থেকে। মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখাতেও ফলারের কথা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ‘পূর্বে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইলে ফলার করান হইত। ভাজা চিঁড়ে, ঘি, মোণ্ডা এবং কোন কোন স্থলে খই, দই ইত্যাদি দিয়া ফলার করান। সেটা আমাদের সময়কার বহু পূর্বের কিন্তু কথাটা তখনও ছিল।’ তাঁর নিজের সময়কালে জলখাবার হিসেবে তাঁরা খেতেন বাসি রুটি ও তরকারি। তিনি লিখেছেন, ‘সকালে আমরা বাসী রুটি ও কুমড়ার ছক্কা খাইতাম। কুমড়ার ছক্কা বাসী হইলে খাইতে বড় ভালো লাগিত।... রুটি না থাকিলে মুড়ি-মুড়কি জল খাইতাম।’ এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য সহজলভ্য চটজলদি খাবারের মধ্যে জিবে গজা, ছাতুর গুটকে গজা, কুচো গজা, চৌকো গজা, কচুরি ও জিলাপির কথা বলেছেন। প্রায় একইরকম জলখাবারের কথা বলেছেন প্রাণকৃষ্ণ দত্তও। তিনি লিখেছেন, ‘এখনকার মত শত শত মিঠাই মিষ্টান্ন তখন আবিষ্কার হয় নাই। মুড়ী, মুড়কি, চুড়া, চুড়াভাজা, চালভাজা, নানাবিধ কলাইভাজা, তেলেভাজা বেগুণী ফুলারী বড়া প্রভৃতি উপাদেয় জলযোগের খাদ্য ছিল। মুড়কির মোয়া মিঠাইয়ের কার্য করিত।’

অতীতেও ছিল আবার বর্তমানেও রয়েছে, এমন একটি চিরন্তন বাঙালি চটজলদি খাবার হল পান্তাভাত, অর্থাৎ, আগের দিনের বাসি ভাত হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখে পরের দিন সকালে খাওয়া। এটিকে বাঙালির দীর্ঘকালের রীতি বললে ভুল হয় না। গ্রামবাংলায়, চাষের মরশুমে বা অন্যান্য সময়েও ওই রীতি পালন করা হয় এখনও। গ্রীষ্মকালে দগ্ধ দিনে এক থালা পান্তা খেয়ে মাঠে লাঙল দিতে যান বাংলার চাষিরা। পান্তাভাত শীতল খাদ্য। গরমে মাঠে কাজ করার সময়ে তা শরীর ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।

লাঞ্চ

নার্গিসি কোফতা থেকে ডিমের ডেভিল

মূল ব্যাপারটা হল একটা সিদ্ধ ডিম নিয়ে তার চারদিকে মাংসের কিমার পুর, ব্রেডক্রাম্ব দিয়ে মুড়ে ছাঁকা তেলে ভাজা। মুঘল আমলে এই ভাজা ডিমকেই আবার গ্রেভিতে ছেড়ে দেওয়া হত। কেন এর এমন নাম? নার্সিসাস ফুলের নাম সবার জানা। সেই নার্সিসাস, যে দিনরাত ঝরনার জলে নিজের রূপ দেখত বলে দেবী তাকে জলের ধারে ফুটে ওঠা ফুল বানিয়ে দেন। নিজেকে ভালোবাসার আর-এক নাম হয়ে যায় নার্সিসিটি। মুঘলরা এই ফুলকে ডাকতেন নার্গিস নামে। নার্গিসের রং সাদা, ভিতরটা হলুদ। ঠিক ধরেছেন, অনেকটা সিদ্ধ ডিমের মতো। আর তা থেকেই কোফতার এই নাম। ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারতে থাকাকালীন এই খাদ্যটি খান আর রেসিপি নিয়ে যান ইংল্যান্ডে। ১৭৩৮ সালে লন্ডনের বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ফোর্টনাম অ্যান্ড ম্যাসন গ্রেভি বাদে এই খাদ্যটি বিক্রি করতে থাকে। খোদায় মালুম কেন তাঁরা এর নাম স্কচ এগ দিয়ে দেন। স্কটদের সঙ্গে তাঁদের দূরদূরান্তের কোনও সম্পর্কই নেই। ১৮০৬ সালে মিসেস মারিয়া রান্ডাল 'ডোমেস্টিক কুকারি' নামে এক বই লেখেন, যা তখনকার দিনে 'সেলিং লাইক হট কচুরিস'। সেই বইতে র‍্যান্ডাল অন্য খাবারের সঙ্গে স্কচ এগের রেসিপিও দিয়েছিলেন।

আমেরিকায় যখন এই খাবার গেল, নাম বদলে গেল আবার। তাঁরা একে বলতেন স্টাফড এগ, স্যালাড এগ (স্যালাড দিয়ে খাওয়া হত বলে), এমনকি এঞ্জেল এগ। খোদ ভারতের রাজধানী কলকাতায় নবরূপে নার্গিসি কোফতা যখন ফিরে এল, তখন এর গ্রেভি হাওয়া হয়ে গেছে। একে খাওয়া হত কাসুন্দি, সস ইত্যাদি দিয়ে। আর ডিমকে মোড়া হত গোলমরিচ, লংকার ঝাল ঝাল পুরে। এই অতিরিক্ত মশলাদার, ঝাল রান্নার একটা ইংরেজ নাম ছিল। ডাক্তার জনসনের জীবনীকার বসওয়েল সাহেব অষ্টাদশ শতকে এমন তীব্র মশলাদার খাবারকে ডেভিল নাম দিয়েছিলেন। ব্যস, খাঁটি ভারতীয় নার্গিসি কোফতা স্কটল্যান্ড ঘুরে কলকাতায় ফিরে এল ডিমের ডেভিল নাম নিয়ে।

জন মন্টেগু, আর্ল অফ স্যান্ডউইচ

শয়তানের খাদ্য

স্যান্ডউইচকে ব্রেকফাস্টে রাখাই যেত। কিন্তু রাখলাম না, কারণ প্রথমে একে খাওয়া হত লাঞ্চ হিসেবেই। ব্রিটেনের কেন্টে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠা স্যান্ডউইচ গ্রামের নামের মানে বালির

গাঁ (পুরোনো ইংরাজিতে wic মানে গ্রাম)। সমুদ্রের কাছে হওয়ায় রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁর নৌ-সেনাপতি স্যার এডওয়ার্ড মন্টেগুকে এই গ্রামের আর্ল বানিয়ে দেন। তাঁর নাতির ছেলের নাম ছিল জন মন্টেগু। এঁকে নিয়েই আমাদের গল্প। এঁর মতো অলস, অকর্মণ্য আর ঘুষখোর আর্ল আগে পরে আর কেউ ছিলেন না। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশদের নৌসেনাদের শোচনীয় পরাজয়ের কৃতিত্ব অনেকটাই এই ভদ্রলোকের। আর-একটা মহাগুণ ছিল এই আর্লের। জুয়া খেলতে দারুণ ভালোবাসতেন। গল্পটা এইরকম, ১৭৬২ সালে একদিন জন মন্টেগু তাসে একের পর এক দান জিতছিলেন। খেলার নেশা চড়ে গিয়েছিল মাথায়। এদিকে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। চাকর বারবার এসে জানাচ্ছে, 'হুজুর, গিন্নিমা কিন্তু এবার...।' বিরক্ত মন্টেগু বললেন, 'এখন খেলা ছেড়ে ওঠা যাবে না। এক কাজ করো। দুই পিস পাউরুটির মাঝে কিছু মাংস ভরে নিয়ে এসো। খাওয়া যাবে। আঙুলও এঁটো হবে না।' দেখাদেখি তাঁর বন্ধুরাও একই খাবার আনতে বললেন। খুব তাড়াতাড়ি তাসের টেবিলে এই খাবার জনপ্রিয়তা লাভ করল। ইংরেজদের জীবনযাত্রার অন্যতম অংশ হয়ে উঠল এই খাদ্য।

আর্ল অফ স্যান্ডউইচের আরও কীর্তি ছিল। তিনি নিজে শয়তানের উপাসক হেলফায়ার ক্লাবের সদস্য ছিলেন। সেখানেও তাঁর প্রভাবে স্যান্ডউইচ খাওয়া শুরু হয়। ১৭৯২ সালে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বদনাম গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে। ঐতিহাসিকরা যতই বলুন, আরও একটা কীর্তির জন্য আমরা ভদ্রলোককে মনে রাখব। ক্যাপ্টেন জেমস কুককে তিনিই পয়সাকড়ি দিয়ে সমুদ্র অভিযানে পাঠান। কুক যখন হাওয়াই দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তিনি প্রথমে এর নাম রাখেন স্যান্ডউইচ আইল্যান্ড, যদিও পরে তা বদলে দেওয়া হয়। অবশ্য এখনও সেখানে স্যান্ডউইচ স্ট্রেইট এক প্রাচীন জুয়াড়ির স্মৃতি বহন করছে। স্যান্ডউইচ পরে আরও দুই রকমে পাওয়া যেতে লাগল। এক স্লাইস পাউরুটির উপর মাংস দিয়ে ওপেন স্যান্ডউইচ আর দুই স্লাইস পাউরুটির উপরে আরও এক স্তর মাংস আর এক স্লাইস রুটি দিয়ে মার্কিন ক্লাব স্যান্ডউইচ।

পিকনিক কীভাবে এল?

তারাপদ রায়ের একটা গল্প পড়েছিলাম। চার বন্ধু মিলে পিকনিকে যাবে। ঠিক হল সবাই কিছু না কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। একজন নিয়ে এল ভাত, ডাল, তরকারি, একজন মাংস, অন্যজন মিষ্টি। শেষ বন্ধু নামকরা কিপটে। সে সঙ্গে নিয়ে এল তার ভাইকে। গল্পটা মনে পড়ার অন্য একটা কারণও আছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফরাসিরা এক নতুন ধরনের

পার্টি শুরু করেন। নাম pique-nique। পিক মানে উঠিয়ে দেওয়া আর নিক মানে যা খুশি। এতে অতিথিরা সবাই কিছু না কিছু খাবার নিয়ে আসতেন, ফলে গোটা দায়িত্ব হোস্টের উপর পড়ত না। ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে এই পার্টি ইংল্যান্ডে যখন এল, তখন মূলত বাড়ির বাইরে খোলামেলা জায়গায় সবাই মিলে লাঞ্চ করাকেই পিকনিক নাম দেওয়া হল। ১৭৯৩ সালে ফরাসি বিপ্লবের পরে প্যারিসের বড়ো বড়ো রাজকীয় উদ্যানগুলো যখন সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল, তখন ফ্রান্সে পিকনিকের জোয়ার ওঠে। লন্ডনবাসীরাও হিংসায় জ্বলে পুড়ে নিজেদের পিকনিক ক্লাব খুলে দেদার পিকনিক শুরু করলেন। গোটা ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স জুড়ে বেশ একটা পিকনিক পিকনিক কালচার আরম্ভ হয়। সেই আগুনে ঘি দিলেন চার্লস ডিকেন্স, আর্নল্ড বেনেটের মতো লেখকরা, যাঁদের লেখায় প্রায়ই দারুণ সব পিকনিকের লোভনীয় বর্ণনা থাকত।

এডওয়ার্ড মানের আঁকা পিকনিকের ছবি

১৯১০ সালে তৈরি হয় লুই ভিতো কেজ, যা গাড়ি বা মোটরসাইকেলে করে সহজে বহন করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি। এই কেজে চাপিয়ে পিকনিকের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হত অকুস্থলে। মৃতের দিন বা দিয়া দে লোস মুয়ের্তোস মেক্সিকোর অন্যতম ছুটির দিন। মৃতের পরিবার ও স্বজনরা এই দিনটি উদযাপন করেন। এই দিনে পরিবারের সদস্যরা কবরস্থানে

জড়ো হয় এবং বড়োরকমের ভোজের আয়োজন করে। সেখানে বসেই তারা খায়। এও তো একরকম পিকনিকই বটে।

মাঝে মাঝে তব দেখা 'পাই'

পাই-এর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ডন ম্যাকলিনের 'আমেরিকান পাই' শুনে আর স্ট্যাটিস্টিকস ক্লাসের পাই চার্ট দেখে। মানতে লজ্জা নাই, আজ অবধি ভালো পাই খাই নাই। এই পাই মূলত ইউরোপিয়ান খানা, যা পরে রোমানরা আমেরিকায় নিয়ে যায়। খাদ্য-ঐতিহাসিক অ্যালান ডেভিডসনের মতে, আসলে পাই হল ম্যাগপাই-এর ছোটো ফর্ম। ম্যাগপাই হল এমন পাখি, যে যা পায় কুড়িয়ে এনে নিজের বাসায় জড়ো করে। যারা টিনটিনের 'পান্না কোথায়' পড়েছেন, তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। প্রথম যুগে এই পাইতেও মাংসের টুকরো, বাসি সবজি, ফলের টুকরো, যা হাতের কাছে পাওয়া যেত মেশানো হত। ম্যাগপাইয়ের বাসার মতো। অনেক পরে একটা নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে পাই বানানো শুরু হয়, যেমন আপেল পাই, ব্লুবেরি পাই।

পাই নিয়ে একটা ছোটো গল্প বলে শেষ করব। ইংরাজিতে 'to eat humble pie' বলে একটা কথা আছে। যার মানে অপমান গিলেও ক্ষমা চাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় এ আবার কী ধরনের পাই? মধ্যযুগে জমিদাররা হরিণ শিকার করে আনলে হরিণের সেরা মাংস দিয়ে যে পাই বানানো হত, তা জমিদার আর সাঙ্গোপাঙ্গরা খেতেন। নাড়িভুঁড়ি আর ফেলে দেওয়া ছাঁট মাংস (যাকে ইংরাজিতে umble বলা হয়) দিয়ে তৈরি পাই খেতে দেওয়া হত দরিদ্র প্রজাদের। বেচারারা খিদের জ্বালায় অপমান সহ্য করেও সেই পাই খেতে বাধ্য হতেন। অতএব...

রোস্টের রূপরেখা

৭ মার্চ, ৩২১ খ্রিস্টাব্দ। সদ্য খ্রিস্টান হওয়া রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন ফরমান জারি করলেন, রবিবার সবার ছুটির দিন। ওইদিন সব অফিস কাছারি, দোকানপাট বন্ধ থাকবে। মানুষ কোনও সক্রিয় কাজ করতে পারবে না। শুধু প্রার্থনা আর খাওয়া ছাড়া। ফলে খুব শিগগির রবিবার মানেই সাধারণ মানুষের কাছে হয়ে দাঁড়াল সকালে চার্চে গিয়ে প্রভু যিশুর নামগান করা আর দুপুরে গান্ডেপিন্ডে খাওয়া। অনেক মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তদের কাছে এই দিনটাই ছিল সাপ্তাহিক মাংস খাবার একমাত্র দিন। সেইদিন ম্যানরের জমিদার বড়ো একটা ষাঁড় রোস্ট করে তার

মাংস প্রজাদের বিলোতেন। এভাবেই রবিবারের রোস্টের জন্ম। অবশ্য নিজের বাড়িতে রোস্টের সরঞ্জাম আনতে আনতে মধ্যবিত্তদের প্রায় বিশ শতক অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রবিবারের এই রোস্টের মধ্যে ষাঁড়ের মাংসের দুটো কাট বা অংশ এখনও হোটেলে হোটেলে পাওয়া যায়। একটার নাম স্যারলয়েন আর অন্যটা ব্যারন। শুনেই বেশ জমিদার জমিদার ভাব জাগে।

ষাঁড়ের রোস্টের পিছনের রান থেকে নেওয়া সবচেয়ে দামি অংশের নাম স্যারলয়েন। লয়েন কিন্তু কারও নাম না। পিছনের দাবনাকে ইংরাজিতে লয়েন বলে। রসিকরা বলেন, রাজা অষ্টম হেনরি নাকি এই মাংস খেয়ে এত খুশি হয়ে গেছিলেন যে দিলদরাজ হয়ে তিনি এঁকে নাইটহুড দিয়ে দেন। সেই থেকে এর নাম স্যারলয়েন। গল্পটা শুনতে দারুণ। কিন্তু ভুল। স্যার লয়েন শব্দ এসেছে ফরাসি শব্দ surlonge থেকে, যার মানে... খুবই সাদামাটা, ‘পিছনের রান’।

মাংসের বিভিন্ন কাট (উনবিংশ শতকের ছবি)

ব্যারনের ব্যাপারস্যাপার আর-একটু বড়ো। পিছনের দুটো স্যারলয়েন সুদ্ধু ষাঁড়ের মেরুদণ্ডকে রোস্ট করলে যা পাই, তাকেই ব্যারন বলে। এর উল্লেখও প্রথম পাই অষ্টম হেনরির আমলে। যদিও এর নামের পিছনেও আছে ফরাসিরা। ফরাসি bas-rond মানে পিছনের গোলাকার অংশ।
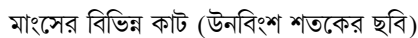
কোথাও গিয়ে যথোচিত অভ্যর্থনা না পেলে বা সবাই এড়িয়ে গেলে ইংরাজিতে তাকে বলা

হয় ‘giving the cold shoulder’। আগে কথাটা শুনে ভাবতাম কাঁধ আবার ঠান্ডা হয় কীভাবে? আর তাতে অপমান করার আছেটাই বা কী? এই বইয়ের জন্য পড়তে গিয়ে পেঙ্গুইনের ‘Companion to Food’-এ এক আশ্চর্য তথ্য পেলাম। মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের বড়ো বড়ো ভোজসভা প্রায় কয়েকদিন ধরে চলত। প্রচুর খাদ্য, পানীয়, গানবাজনা, জাদুর খেলা, এমনকি নাটকও দেখানো হত সেইসব সভায়। ভোজসভা কখন শেষ হবে তার একটা ইঙ্গিত ছিল। ষাঁড়, খাসি বা শূকরের কাঁধের অংশ থেকে ঠান্ডা মাংসের টুকরো দেওয়া হত অতিথিদের। যেমন এখনকার ভোজে ঠান্ডা দই বা আইসক্রিম দেয়। এটা পেলেই অতিথিরা বুঝতেন ভোজ শেষ, এবার বাড়ি যেতে হবে। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা অপমান করার জায়গায় চলে এল। যেসব অতিথিরা অন্যদের থেকে বেশিদিন থেকে যেতেন বা যাদের গৃহস্বামী পছন্দ করতেন না, তাঁদের খাবার শুরুতেই এই কোল্ড শোলডার দেওয়া শুরু হল। মানে একটাই। অনেক হয়েছে, এবার মানে মানে কেটে পড়ো বাপু।

পোলাও, বিরিয়ানি ইত্যাদি

ছোটোবেলায় ব্যাকরণ বইতে পড়তাম পল+অন্ন= পলান্ন। মানে পোলাও। পল মানে নাকি মাংস। অর্থাৎ পোলাও মানে মাংস-ভাত। এই জায়গাটা আমার চিরকাল গোলাত। কারণ যেখানে যেখানে পোলাও খেতাম, কোথাও মাংস পাইনি। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম, এ খাওয়া একেবারে বৈদিক খাদ্য। ব্যাকরণ বইতে আছে হাজার হোক। কিন্তু পোলাও-এর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে পুরো কনফিউজড হয়ে গেলাম। কোনও দুজন এর উৎপত্তি নিয়ে একমত হতে পারেননি। অতএব ঘেঁটে যা পেলাম, সবকটা পেশ করি। আপনাদের যেটা পছন্দ মেনে নেবেন।

প্রথম পোলাও নাকি রান্না হয়েছিল সম্রাট আলেকজান্ডারের জন্য। তিনি যখন শ্বশুরবাড়ি স্ত্রী রোক্সানার কাছে যান, তখন তাঁকে পোলাও খাইয়ে আপ্যায়ন করা হয়। তাঁর শ্বশুরবাড়ি বর্তমান ইরানে। ফলে খাদ্যটি ইরানি। অন্য গল্প বলে, সমরখন্দ জয় করলে সেখানে আলেকজান্ডার এক ভোজসভা আয়োজন করেন, যাতে স্থানীয় লোকজন তাঁকে পোলাও খাইয়ে খুশি করেছিলেন। তবে আবিষ্কার যেখানেই হোক, প্রথম পোলাও-এর রেসিপি লিপিবদ্ধ করেন আবু আলী হোসাইন ইবনে সিনা নামে এক উজবেগ (যাঁদের থেকে উজবুক কথাটা এসেছে) পণ্ডিত। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম সেরা চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক এই ভদ্রলোক এত কাজের মধ্যে রান্নার রেসিপিও লিখবার সময় পেয়েছিলেন

ভাবলে চমকে যেতে হয়।

ইন্ডিয়ান ফুড হিস্ট্রি বইটিতে কে.টি আচাইয়া দাবি করেছিলেন যে পার্সিয়ান এবং আরবরা প্রথম ‘পুলাও’ বা ‘পুলাভ’ এই শব্দটি ব্যবহার করেন, পরে সেটির ভারতীয় উৎপত্তি অনুযায়ী নাম পোলাও রাখা হয়। কিন্তু সঠিক পুলাও-এর উৎপত্তি কোথায় সেটা নিয়ে কিন্তু খাদ্যবিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানান মতভেদ আছে। অনেকের মতে এই খাবারটি নাকি আরব সভ্যতা থেকে ভারতে এসেছে। আবার অনেকে বলেন যে ভারতীয়রাই প্রথম একপ্রকার মিষ্টি ভাত তৈরি করে, সেটারই নাকি আধুনিক প্রতিফলন এই পোলাও। যদিও বা সঠিক কোনটা সেটা এখনও জানা যায়নি। পারস্যে মাংসের সুরুয়ার সঙ্গে আধসিদ্ধ ভাত মিশিয়ে ‘পোলো’ নামে যে রান্না হয়, সেটা থেকেও পোলাও আসতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

বাবরের ব্যাঙ্কোয়েট। মুঘল পেন্টিং

অবশ্য এখন যে সুস্বাদু পোলাও খাই, তার জন্য দায়ী কিন্তু সম্রাট আকবর। তিনিই প্রথম মুঘল রসুইখানায় মশলা জলে গরম করে (একেই আখনি বলে), দই দিয়ে জাঁক দেওয়া

মাংসের সঙ্গে কাশ্মীরি জাফরান মিশিয়ে পোলাও রান্না শুরু করান। আইন-ই-আকবরীতেও এই খাবারের নাম আছে। অবশ্য বেশিদিন আকবর এই পোলাও খাননি। শেষ দিকে আমিষ তাঁর বিশেষ সহ্য হত না। লখনউতে বাবুর্চিরা পোলাওকে অন্য লেভেলে নিয়ে গেছিলেন। অযোধ্যার শাসকদের বিরিয়ানি পছন্দের হলেও তাঁদের সর্বাধিক প্রিয় ছিল পোলাও। ভালো জাতের পোলাও-এর কাছে বিরিয়ানির স্বাদ নস্যাৎ হয়ে যেত। অযোধ্যার শাসকদের পোলাও প্রীতির কথা মাথায় রেখেই তাঁদের শাহি রসুইখানার বাবুর্চিরা পোলাও নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠতেন। ফলে নবাবদের মেনুতে যোগ হত পোলাও-এর সব নতুন নতুন পদ। অযোধ্যায় ঝাল ও মিষ্টি মিলিয়ে প্রায় সত্তর রকমের পোলাও প্রচলিত থাকলেও যেসব বিখ্যাত পোলাও দিয়ে শাহি দস্তরখান সাজানো হত সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মোতি পোলাও, আনারদানা পোলাও, গুলজার পোলাও, নূর পোলাও, কোকো পোলাও, চামবেলি পোলাও, নওরতন পোলাও প্রভৃতি। তবে এইসব পোলাওয়ের মধ্যে বাবুর্চিদের দুটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ছিল আনারদানা পোলাও ও নওরতন পোলাও। আনারদানা পোলাও-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি চালের অর্ধেকটা ছিল লাল, ঠিক যেন রত্ন, আর বাকি অর্ধেকটা ছিল সাদা কাচের মতো চকচকে। এই চালের পোলাও দস্তরখানের উপর সাজিয়ে রাখলে মনে হত যেন থালায় রঙিন জহরত সাজানো রয়েছে।

অন্যদিকে নওরতন পোলাও বিখ্যাত নবরত্ন পাথরের মতো নয় রংয়ের চাল মিশিয়ে তৈরি করা হত। এই পোলাওয়ে বর্ণের স্বচ্ছতা ও শোভা এক অনন্য স্বাদের জন্ম দিত। শুধু অযোধ্যার শাসকরাই নন, তাঁদের দেখাদেখি বহু আমির ওমরাহরাহরাও নতুন নতুন পদ দিয়ে দস্তরখান সাজাতে শাসকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন। অযোধ্যার শাসক গাজিউদ্দিন হায়দারের সমসাময়িক নবাব সালারজং-এর বংশের রইস নবাব হুসেন আলি খাঁ ছিলেন পোলাওয়ের অন্ধ ভক্ত। তাঁর দস্তরখানে নানান স্বাদের পোলাও সাজানো থাকত। পোলাও প্রীতির জন্য সমগ্র অযোধ্যা জুড়েই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর অত্যধিক পোলাও প্রীতির জন্য তিনি পরিচিত হয়েছিলেন চাওয়াল ওয়ালে নামে। নবাব, ধনী ও শৌখিন আমিরদের পোলাও ও বিরিয়ানি তৈরিতে যে মুরগির মাংস ব্যবহার করা হত, সেই মুরগিগুলিকে কয়েক মাস ধরে কেশর ও কস্তুরীর গুলি তৈরি করে খাওয়ানো হত, যাতে করে ওই মুরগির মাংসে এই দুই বস্তুর সুগন্ধ মিশে যায়। রান্নায় উচ্চ তালিম প্রাপ্ত কিছু বাবুর্চি পোলাও রান্না করে তা এমনভাবে পরিবেশন করতেন যে সবাইকে চমকে দিত। পোলাও-এর মাংসকে সেদ্ধ করে তা দিয়ে পাখি তৈরি করা হত। এমন কৌশলে তা রান্না হত যে রান্নার

পরও পাখির আকৃতিতে কোনও পরিবর্তন হত না। রান্নার পর পোলাও এমনভাবে থালায় পরিবেশন করা হত যে, দেখে মনে হত থালায় পাখি বসে দানা খাচ্ছে।

বিরিয়ানির প্রকৃত উৎস খাদ্য-ইতিহাসবিদেরা খুঁজে পাননি। সাফাদি সাম্রাজ্যের সময় আর্যভূমিতে 'বেরিয়ান পিলাও' নামে একধরনের বিরিয়ানি তুল্য খাবার পাওয়া যেত। ঐতিহাসিক লিজি কোলিংহামের মতে, ভারতীয় শস্যদানার খাদ্য ও আর্যভূমির 'পিলাফ' বা পোলাও, এ দুটি খাবারের ধারণা থেকে প্রস্তুত খাদ্য মুঘল দরবারে পরিবেশিত হত, যার নাম তিনি বিরিয়ানি বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে বাবরের আগমনের পূর্বে বিরিয়ানি ছিল বলে অনেকে ধারণা করেন। তবে সেই বিরিয়ানি আর মাংসের খিচুড়িতে কোনও তফাত ছিল না। আর-এক ধারণামতে, তুর্কিরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন তারা যুদ্ধের আগে দ্রুত প্রাতরাশ সেরে নেওয়ার জন্য চাল ও কাঁচা মাংস কড়াইয়ে চড়িয়ে একধরনের খাবার প্রস্তুত করত, যাকে বিরিয়ানি বলা যায়, কিন্তু সেই খাবারে তারা মশলা, এমনকি নুন পর্যন্ত ব্যবহার করত কি না তা কারও জানা নেই। 'আইন-এ-আকবরী' গ্রন্থ অনুযায়ী পোলাও আর বিরিয়ানির মাঝে কোনও তফাত ছিল না, শুধু পার্থক্য হচ্ছে বিরিয়ানি শব্দটা ভারতে বহু আগেই প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত পরিব্রাজক অলবিরুনির বর্ণনায় মুঘল ও মুঘল সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোতে বিরিয়ানির উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে একদা শাহজাহানের সুলতানা মমতাজ সেনানিবাস ভ্রমণে সৈন্যদের অবসাদগ্রস্ত দেখে বাবুর্চিকে সেনাদের ক্লান্তি দূরীকরণে বিশেষ খাবার রান্নার নির্দেশ দেন, যা পরে বিরিয়ানি নামে পরিচিত হয়। প্রতিভা করণের মতে, আরব বণিকদের হাত ধরে পোলাও দক্ষিণ ভারত তথা দ্রাবিড়াঞ্চলে এসে আঞ্চলিক রন্ধনশৈলীর স্পর্শে বিরিয়ানি হয়েছে। এ ছাড়াও তামিলনাড়ুতে ২০০ খ্রিস্টাব্দে 'উন সোরু' নামক বিরিয়ানির মতো খাবারের নাম পাওয়া যায়। সৈন্যদের জন্য তৈরি এই পদ হত চাল, ঘি, মাংস, হলুদ, ধনে, তেজপাতা আর গোলমরিচ দিয়ে। দক্ষিণী বিরিয়ানি তাই এখনও বেশ স্পাইসি। মুঘল দরবারের বিরিয়ানি কেমন ছিল সেটা এখনও গোপন রয়ে গেলেও ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ মুঘল দরবারের বিরিয়ানির কিছুটা স্বাদ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর চাকরিচ্যুত সিপাহি ও মুঘল প্রাসাদের রন্ধনশিল্পীরা সেই বিরিয়ানিকে পুরো ভারতে ছড়িয়ে দেয়, পেটের তাগিদে তারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিরিয়ানি বিক্রির দোকান খুলে বসে।

অযোধ্যার শাহি বাবুর্চিরা নানারকমের বিরিয়ানির উদ্ভব করেছিলেন। বিরিয়ানিতে পাখির মাংসের ব্যবহার শুরু করার কৃতিত্বও আওয়াধি বাবুর্চিদেরই প্রাপ্য। এ ছাড়াও তাঁদের অন্যতম

কৃতিত্ব ছিল দমপখত বিরিয়ানির উদ্ভব। চাল, মাংস ও মশলা হাঁড়ির ভেতরে দিয়ে সেই হাঁড়ি হালকা আঁচের উনুনে বসিয়ে ধীরে ধীরে তা রান্না করা হত। নবাব আসফ-উদ-দৌল্লার আমলে বড়ো ইমামবাড়া নির্মাণের সময় নির্মাণকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাঝে এই বিরিয়ানি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ইমামবাড়া তৈরির সময় নবাবি লঙ্গরখানার উনুনে অল্প আঁচে চাপানো থাকত এই দমপখত বিরিয়ানি। শ্রমিকরা তাদের কাজের ফাঁকে এসে খেয়ে যেত। পরবর্তীতে এই দমপখত বিরিয়ানি নবাব পরিবারেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

কলকাতার বিরিয়ানি উদ্ভবের আবার আলাদা ইতিহাস। ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করা হয়। তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তাঁর প্রাসাদের বাবুর্চিকেও। বাবুর্চি সেখানে বিরিয়ানি রান্না করে এবং মেটিয়াবুরুজ সহ কলকাতাবাসী সেই রান্না শিখে নেয়। কলকাতার দরিদ্র পরিবারগুলো মাংস কিনতে অসমর্থ হওয়ায় তারা মাংসের বদলে আলু ব্যবহার করতে শুরু করে। লখনউ বিরিয়ানিতে মাংসের সঙ্গে আলু যুক্ত করে নিজেদের মতো মশলা ব্যবহার করে কলকাতাবাসীরা যে বিরিয়ানির জন্ম দেয় সেই বিরিয়ানিই এখন কলকাতাইয়া বিরিয়ানি নামে শহরতলির দোকানগুলোতে বিক্রি হয়ে থাকে। মেটিয়াবুরুজে বসবাসকালেও সুলতানের দস্তরখান সাজানো থাকত নানান রকমের শাহি খাবার দিয়ে। সুলতান ওয়াজিদ আলি শাহ প্রতিটি পদের এক চামচ অথবা এক মুঠো পরিমাণ খাদ্য নিতেন। সুলতান ওয়াজিদ আলি শাহের মেটিয়াবুরুজ প্রাসাদের এক বাবুর্চি প্রতিদিন সুলতানের জন্য এক আশরফি (সোনার মোহর) সহযোগে পোলাও রান্না করতেন। নিপুণ পাচক আশরফিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন দ্রবণে পরিণত করতেন যে পোলাওয়ের মধ্যে তার চিহ্নও দেখতে পাওয়া যেত না।

কাশ্মীরে তেহারি নামে একধরনের বিরিয়ানি পাওয়া যায়। তেহারিকে বিরিয়ানির একটি বিশেষ পরিমার্জিত ধরন বলা চলে। তেহারিতে মাংসের পরিমাণ থাকে কম। আলু ও হাড় থাকে বেশি। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চড়া দামের কারণে খরচ বাঁচাতে এই বৈচিত্র্য আনা হয়েছিল। তবে প্রেক্ষাপট বদলে গেলেও এখনও আবেদন বদলে যায়নি তেহারির। কাশ্মীরে তেহারি এখনও একটি অতি জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড।

পুরোনো ঢাকায় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হল কাচ্চি বিরিয়ানি। কাচ্চি শব্দটা এসেছে উর্দু কাচ্চা শব্দটি থেকে, যার বাংলা অর্থ কাঁচা। যেহেতু সুগন্ধি চালের সাথে মাংস সরাসরি রান্না করা হয়, তাই এর নাম হয়েছে কাচ্চি। এটি হিন্দি এবং উর্দুতেও একই নামে পরিচিত। সেদ্ধ না করা খাসির গোস্ত টকদই দিয়ে মাখিয়ে তার উপর আলু আর চালের আস্তরণ দিয়ে রান্না

করা হয় কাচ্চি বিরিয়ানি। অন্যদিকে সেদ্ধ বা পাক করা মাংস চালের সাথে মিশিয়ে তৈরি করা হয় পাক্কি বিরিয়ানি।

গবেষক মুহিত হাসান তাঁর 'দিশি ও বিলাতি' গ্রন্থে লিখছেন, "মোগল আমলে নাহয় বাংলায় বিরিয়ানির প্রবেশ ঘটল, কিন্তু তখনই কি তা ঘরে ঘরে বিলাসী খাবার বা উৎসবের খাবার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল? তেমন তথ্যপ্রমাণ কিন্তু মেলে না। মধ্যযুগের একাধিক বাংলা কাব্যে বিলাসী খাদ্য হিসেবে পোলাওয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার 'চৌধুরীর পালা'য় এক জমিদার বন্ধুদের আপ্যায়নের জন্য 'পোলাউ কোরমা তৈয়ার করিল/ পাঠাখাসী বহুত মারিল' এমন সংবাদও মেলে। কিন্তু বিরিয়ানি গরহাজির। আবার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের নায়িকা ছাগমাংস ও খিচুড়ি রান্না করলেও বিরিয়ানি নৈব নৈব চ। বাংলার নবাব আলিবর্দি খানের খাদ্যতালিকায় খিচুড়ির দেখা মেলে, কিন্তু বিরিয়ানির কথা সেখানে নেই। এখনও অব্দি প্রাপ্ত বাংলা ভাষার প্রথম দুটি রান্নার বই পাকরাজেশ্বর (প্রথম প্রকাশ ১৮৩১-এ) ও ব্যঞ্জন রত্নাকর (১৮৫৮)-এ (দুটি বই-ই বর্ধমানের রাজপরিবারের উদ্যোগে প্রকাশ পেয়েছিল) বিরিয়ানির নামগন্ধ অব্দি নেই। কিন্তু বহুরকমের পোলাওয়ের পাক-প্রণালী দুটি বইতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। শেষোক্ত বইটিতে তো ষাট রকমের পোলাও-প্রকরণের উল্লেখ রয়েছে। 'আম্র পলান্ন, 'অলাবু-পলান্ন', 'শীরাজি পলান্ন' থেকে শুরু করে এমনকি 'তিন্তিড়ী পলান্ন' অর্থাৎ তেঁতুলের পোলাওয়ের কথাও বাদ যায়নি! উনিশ শতকে প্রকাশিত আরেকটি রান্নার বই শরৎচন্দ্র দাসের বিশুদ্ধ পাক-প্রণালী-তেও গোলাপ ফুলের পোলাও বা হাবশি পোলাওয়ের রেসিপি আছে, কিন্তু বিরিয়ানি যথারীতি অনুপস্থিত।"

বাঙালির ভাত-পাতে

'বাইর থিক্যা ঘরে আসি মনের হাউস লইয়া
ক্ষুধাত পামু গরম ভাত ডাইলে লেবু দিয়া।
ভাজা বড়ার মুচমুচ্যানি জিবে পানি আনে
ঝুলের থিক্যা উঁকি মাইর‍্যা মাছের মুড়া দেখে।'

কথায় বলে বাঙালি হল ভাতে আর মাছে। একেবারে শুরুর দিন থেকেই প্রচুর জলাজমি, নদী আর বৃষ্টির জন্য বঙ্গভূমি ধান চাষের জন্য একেবারে আদর্শ। অনাবৃষ্টিতে ধান নষ্ট, আবার অতিবৃষ্টিতে পোকা লেগে শস্যের ক্ষতি। বাঙালি তাই ছড়া বাঁধে 'আয় বৃষ্টি ঝেঁপে/ ধান দেব মেপে/ ধানের ভিতর পোকা/ জামাইবাবু বোকা।' বাংলাদেশে ধান হল লক্ষ্মী। কত বৈচিত্র্য

তার। শালিধান, দুধের সর, জয়া, রত্না, লক্ষ্মীবিলাস, সীতাভোগ, বালাম, বউয়ারি, এমনকি রাঁধুনিপাগল (মানে যার সুগন্ধে স্বয়ং রাঁধুনিও পাগলপারা)। বাঙালি তখন খেতেও পারত তেমনি। বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় পাই, 'তখনকার দিনে অধিকাংশ লোক ভাত খাইত। শহরে লোকেরা আড়াই পোয়া চালের ভাত, রাত্রে আধসের চাল ও তদুপযুক্ত তরকারী।' আর সে ভাত রান্নাও হত নানা বিচিত্র রকমে। হাঁড়ি ধুয়ে আধফোটা জলে চাল দিয়ে ঝরঝরে ভাত, রোগীর জন্য নরম ভাত, নামাবার আগে গন্ধরাজ লেবুপাতা দিয়ে সুগন্ধি ভাত কিংবা মাড় গালার পরেই অল্প ঘি দিয়ে ঘি-ভাত। বাসি ভাতকেও সুস্বাদু করতে তাতে জল ঢেলে কাঁচালংকা/মরিচ, পেঁয়াজ, কাসুন্দি, ভাজা আর চচ্চড়ি দিয়ে পান্তা খাওয়া হত সে কবে থেকে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবি হনুমানকেও ভাত খাইয়ে ছেড়েছেন। সীতা ব্যঞ্জন আনার আগেই নাকি হনুমানের পাতের ভাত শেষ হয়ে যাচ্ছিল। তবে সব ভাতের মধ্যে পান্তা নিয়ে বাঙালির যত নস্টালজিয়া, এমনটি বোধহয় অন্য কোথাও নেই। পান্তার মধ্যে এক অদ্ভুত সরল জীবনচর্যা, অপচয়বিরোধী মনোভাব আর জ্বালানি বাঁচানোর প্রচেষ্টা দেখা যায়। আজও ঢাকায় নববর্ষকে স্বাগত জানানো হয় পান্তা খেয়ে। বরিশাল জেলায় একে বলে 'পসুতি' ভাত, আবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পেট ঠান্ডা রাখা পান্তার নাম 'পোষ্টাই।' বাঙালি লোককথা, গানে আর ছড়াতেও পান্তার জয়জয়কার। একটি শিশু ছড়ায় আছে, 'পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে কাপড় দিয়ে গায়/ গোরু চরাতে পাঁচন হাতে রাখাল ছেলে যায়।' দুর্গাপুজোর দশমীর দিন সকালে দেবীকে পান্তা ভাত আর কচুর শাক খাইয়ে বাঙালি তাঁকে বিদায় জানায়। তিন দিন বাপের বাড়িতে নানা ব্যঞ্জন খাবার কথা স্বামীর থেকে গোপন রাখতেই নাকি শেষ দিন দেবী কচুর শাক আর পান্তা খান। স্বামী 'কী দিয়ে খেয়ে এলে?' জিজ্ঞেস করলে যেন বলতে পারেন দরিদ্র পিতা এর বেশি কিছু খাওয়াতে পারেননি।

ভাতের আলোচনায় ডালের প্রসঙ্গ আসবেই। ভাত কার্বোহাইড্রেট আর ডাল প্রোটিন— তাই ডালে ভাতে এক সুষম খাবারের দিশা দেখায়। বাংলায় ডাল খাওয়া খুব সম্ভব মধ্যযুগ থেকে শুরু। ডালের একঘেয়েমি দূর করতে ভিন্ন ভিন্ন ফোড়নের নির্দেশ দিয়েছেন বাঙালি রাঁধুনিরা। কাঁচালংকা, পাঁচফোড়ন, জিরে, কালোজিরে, মেথি, শুকনো লংকা, রাঁধুনি, পেঁয়াজ, রসুন— এক-এক ডালে এক-এক ফোড়ন। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল, শিম দিয়ে মুসুর ডাল, লাউ আর করলা দিয়ে তেতোর ডাল, গরমের দিনে আম আর চালতার টকডাল, আদা বাটা দিয়ে অড়হর ডাল, গরম মশলা-ঘি-তেজপাতা-নারকেল দিয়ে ছোলার ডালের কী অপূর্ব স্বাদ, তা বাঙালি মাত্রেই জানেন।

ডাল-ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন সবজি খাবার প্রচলন অনেক আগের। তবে পর্তুগিজরা আসার আগে বাঙালি আলুর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। মধ্যযুগের নানা লেখা থেকে বোঝা যায়, তরকারি হিসেবে প্রধান ছিল কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, থোড়, মোচা, কাঁচকলা, পটল, লাউ, ওল, কচু, মুলো, শিম আর নিমপাতা। বাংলা প্রবাদে আছে, 'আগে তিতা পাছে মিঠা'— আগে তেতো খেয়ে পরে মিষ্টি খেতে হয়। তিক্তরস স্বাদগ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি করে, শরীরের দোষ নাশ করে। মনসামঙ্গলেও চাঁদের পত্নী সনকা পাটাতে পলতা পাতা ছেঁচে ধনিয়া, বেগুন দিয়ে 'জ্বর পিত্ত আদি নাশ করার কারণ/ কাঁচকলা দিয়া রান্ধে সুগন্ধ পাঁচন।' তেতো খাবারের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বোধ করি শুক্তো। শুক্তো কী কী দিয়ে রান্না করা যায়, তার তালিকা বিশাল— পেঁপে, কাঁচকলা, থানকুনি পাতা, শিম, বেগুন, উচ্ছে, মুলো, কুমড়ো, রাঙা আলু, শাপলা, ধুঁধুল (ইত্যাদি)। চণ্ডীমঙ্গলে পাই— 'সিম, নিম, বেগুনের তিতা, কুমড়া, বেগুনের সুকতা।'

শুক্তোর পরেই আসে শাকের কথা। শাক খাবারে স্বাদ বাড়ায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে, রক্তাল্পতা দূর করে। গ্রীষ্মে নটে, জলসাচি, বর্ষায় কলমি, পুঁইডাঁটা, চালকুমড়ো, শীতে মুলো, পালং, সর্ষে শাক, লাউ শাক, নলতে শাক খাওয়া হত। কালীপুজোর আগের দিন চতুর্দশীতে এখনও চৌদ্দ শাক খাওয়া হয়। শাকের মহিমা আছে মহাভারতেও। ধর্মরাজের 'সুখী কে?' প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন, '... অপ্রবাসে যেইজন রয়/ যদ্যপি মধ্যাহ্ন কালে শাক-অন্ন খায়।' চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার গর্ভের সপ্তম মাসে সাধ দেওয়ার জন্য পালং, গিমা, হেলেঞ্চা, কলম্বু শাক, তির পোর লার শাক, পুঁই শাক ও গান্ধারি খুরিয়ার শাকের উল্লেখ পাই। চণ্ডীর কাছে মহাদেব আমড়া দিয়ে পালং শাক রান্নার প্রস্তাব দিয়েছেন। শচী দেবী শ্রীচৈতন্যকে রান্না করে খাইয়েছেন কুড়ি রকম শাক। চৈতন্যর দীক্ষাগুরু কেশব ভারতীর বাস ছিল কাটোয়ায়। কাটোয়া আবার শাক ও ডাঁটার জন্য বিখ্যাত। ডাঁটার মধ্যে লাউ, কুমড়ো, পুঁইডাঁটা, সজনে ডাঁটা বাঙালির রসনাকে এখনও তৃপ্ত করছে সমানভাবে। তবে মূলত পূর্ববঙ্গে তরকারি হিসেবে আরও একটি দ্রব্য বিখ্যাত। তা হল কচু। কচুর মূল, ডাঁটা, পাতা, ফুল— কিছুই ফেলনা নয়। কচু ভাতে, নারকেল দিয়ে কচু বাটা, আলু কুমড়োর সাথে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু রান্নায় অপূর্ব স্বাদ আনে।

জলের দেশ বাংলা। আর তাই মাছের প্রাচুর্য এখানে চিরকাল। মধ্যযুগের রান্নার বর্ণনায় জিরে লবঙ্গ দিয়ে কই, মরিচ দিয়ে চিতল মাছ, মাগুর মাছের ঝোল, মানকচু দিয়ে শোল মাছ, সবজি দিয়ে রুই মাছের কথা পাই। সতীশ চন্দ্র মিত্র যশোর-খুলনার ইতিহাস বইতে যশোর

জেলার যেসব মাছের বর্ণনা দিয়েছেন তার তালিকা চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো— চিতল, ফলি, ফ্যাসা, চাপিলা, কাচকি, কুকর জিব, কুমিরের খিল, পোটক, কাকিলা, ইটাখোটা, শোল, গজাল, ল্যাটা, চ্যাং, মোলা, ঘনিয়া, রানি মাছ, গুটুম, কানি পাবদা, মধু পাবদা, চাকা, ঘাউরা, রিটা, আগরে ইত্যাদি মোট পঞ্চাশ রকম। খুলনা জেলার গলদা, চাকা, বাগদা, চাষনে ও হরিণা চিংড়ি ছিল বিখ্যাত। শাস্ত্রে অবশ্য মাছের রাজা ইলিশ দুর্গাপুজোর পর থেকে সরস্বতী পুজো অবধি না খেতে বলেও এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে— ‘সর্বৈষামেব মৎস্যানাং ইল্লিশঃ শ্রেষ্ঠ উচ্চ্যতে।’ বাংলাদেশে একে বলে— ‘জামাই ভুলাইনা মাছ/ ছাওয়াল কাদাইনা মাছ।’ ইলিশের আঁশ ঘরে পোঁতা থাকলে নাকি গৃহস্থের মঙ্গল হয়। সরস্বতী পুজোতে জোড়া ইলিশ ঘরে তোলার নিয়ম আছে।

কালীঘাট পট। বিড়াল তপস্বী

মাছ রান্নায় বাঙালি যত পটু, মাংস রান্নায় ততটা দড় নয়। মুজতবা আলী বলেছেন, বাঙালি পঁয়ষট্টি রকম মাছ রাঁধতে পারে, কিন্তু মাংস রাঁধতে একেবারেই ব্যর্থ। মঙ্গলকাব্যে কিন্তু সনকার মাংস রাঁধার বর্ণনা পাই, 'মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল/ ছাল খসাইয়া রান্ধে বুড়া খাসির তেল।' মুসলমানি প্রভাবে বাংলায় কাবাব, জবাই করা মাংস জনপ্রিয় হয়। 'পাঁটা'র মাংসের সঙ্গে বাঙালির সেই যে মিলন হল, আজও বাঙালির পাঁঠার মাংসের নামে নোলা সকসক করে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সেই কবেই লিখেছেন, 'রসভরা রসময় রসের ছাগল/

তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।’ মুরগির ঝোল ঝাল ঝাল করে অপূর্ব রাঁধতেন গোয়ালন্দ, চাঁদপুরের মুসলমান খালাসিরা। কিন্তু বাঙালি ঘরে ‘রামপাখি’ ঢুকতে সময় নিয়েছে বেশ কয়েক যুগ।

প্রথম দিকে ডিম বলতে একমাত্র হাঁসের ডিম খেত বাঙালি। অনেক পরে মুরগি আর কচ্ছপের ডিম খাদ্যতালিকায় আসে; কচ্ছপের খোলা ছাড়া ডিম সেদ্ধ করে, ভেজে হলুদ, নুন, লংকা, পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে অপূর্ব রান্না হয়।

খাদ্যরসিক বাঙালির টকও বড্ড প্রিয়। খাবার শেষ হবার মুহূর্তে তার চাই-ই চাই অম্বল, চাটনি, নয় আচার। এর জন্য রয়েছে আম, আমড়া, করমচা, তেঁতুল, টমেটো, আনারস, আলুবোখরা, ইদানীং কাঁচা পেঁপের চাটনিও বাঙালিদের প্রিয় হয়েছে। প্রিয় হয়েছে ধনেপাতার চাটনিও। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যজীবনকথায় লিখছেন—

নেবু আদা আম্র কোলি বিবিধ বিধান

আমসী আম্রখণ্ড ইতলম্বি আমতা।

যত্ন করি গুন্তি করি পুরাণ মুকুতা।

সব খাওয়া শেষ হলে এক খিলি পান মুখে না পুরলে বাঙালির জমে না। আগে সব বাড়িতেই পান সাজার সরঞ্জাম থাকত। পান তিন রকমের— ছাঁচি পান, মিঠা পান আর দেশি পান। পান সাজাও এক আর্ট। খিলি পান, ডবল খিলি, চৌকা খিলি তো আছেই, অনেকে আবার পানের ধারকে কাঁটা কাঁটা করে অদ্ভুত সুন্দর আকৃতি দিত। সুপারি কাটা হত ডুমো ডুমো করে, অথবা সরু সরু চুলের মতো। জাহাজি সুপারি আগে দুধে সিদ্ধ করে তবে কাটা হত। কেউ কেউ কাটা সুপারিতে পদ্মকাঁটা গোলাপকাঁটার মতো ফুলও তুলতে পারতেন। সঙ্গে থাকত দারুচিনির কাঠি, মলমলের কাপড়ে ছাঁকা খয়ের, লবঙ্গের ফুল, চুন, দোক্তাপাতা, জরদা। কাশীতে পাওয়া যেত সোনা বা রুপার পাত মারা পান। আর সে পান খেয়ে রাঙা ঠোঁট, রাঙা জিভ নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলত বাঙালি।

ডিনার

কলকাতার সাহেবদের ক্রিসমাস ডিনার

শুরুতেই একটা জরুরি কথা বলে রাখি। বড়দিন মানে কিন্তু প্রভু যিশুর জন্মদিন না। সত্যি বলতে কী, যিশুর জন্মগ্রহণের সঠিক দিন-ক্ষণ পাওয়া যায় না। শুরুর দিকে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে বড়দিন অন্তর্ভুক্তই ছিল না। দ্বিতীয় শতাব্দীর দুজন খ্রিস্টধর্মগুরু ও ইতিহাসবিদ ইরেনাউস আর তার্তুলিয়ান খ্রিস্টানদের উৎসবের এক তালিকা বানান। তাতে বড়দিন ছিল না। ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মিশরে প্রথম বড়দিন পালনের প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রিক কবি, লেখক ও ইতিহাসবিদ লুসিয়ান তাঁর সময়ে ক্রিসমাস পালিত হত বলে উল্লেখ করেছেন। ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে রোমে সর্বপ্রথম বড়ো আকারে বড়দিন উদযাপন শুরু হয় 'স্যাটার্নালিয়া' নামে এক উৎসবকে কেন্দ্র করে। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দেশে। সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টানরা এ দিনকে আনন্দ ও মুক্তির দিন হিসেবে পালন করতে শুরু করেন। ৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবার রোমান ক্যালেন্ডারে ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন উল্লেখ করে দিনটিকে যিশুর জন্মদিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ৪৪০ সালে পোপ একে স্বীকৃতি দেন। সেই থেকেই ২৫ ডিসেম্বর আমরা যিশুর জন্মদিন পালন করি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালিত হলেও রাশিয়া, জর্জিয়া, মিশর, আর্মেনিয়া, ইউক্রেন ও সার্বিয়া এর ব্যতিক্রম। এ দেশগুলোতে ক্রিসমাস পালিত হয় ৭ জানুয়ারি। এশিয়া মাইনরের দেশগুলোতে আবার ৬ জানুয়ারি, মানে যিশুর ব্যাপ্টিজম বা দীক্ষাস্নান দিবসে এ উৎসব পালন করা হয়।

আমরা অনেক সময় শুভ বড়দিনের ইংরেজি লিখতে গিয়ে লিখে ফেলি 'হ্যাপি ক্রিসমাস' বা 'Happy Xmas।' কিন্তু ক্রিসমাসের বানানে এমন 'এক্স' কেন ব্যবহার করা হয়? আসলে ক্রিসমাস শব্দটিকে গ্রিসে ডাকা হয় Christos নামে। গ্রিক ভাষায় যার বানানটা শুরু হয় এক্সের মতন দেখতে একটি অক্ষর 'কাই' দিয়ে। আর সেখান থেকেই ছোটো করে একসময় ক্রিসমাসের বানান হয়ে গিয়েছে Xmas।

ভারতে ব্রিটিশদের ক্রিসমাস

ভারতবর্ষে প্রথম ক্রিসমাস উদযাপিত হয় ১৬৬৮ সালে। সে এক অবাক করা গল্প। কলকাতা নগরী গোড়াপত্তনকারী জোব চার্নক তখন প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিলেন হুগলি ছেড়ে। পিছনে তাড়া করেছেন মোগল সেনারা। চার্নক যাবেন বালেশ্বরে। যেতে যেতে মাত্র সাতাশ মাইল পেরোতেই তাঁর চোখে পড়ল বনজঙ্গলে ঢাকা এক গ্রাম। না আছে ঘরবাড়ি, না দোকানপাট। আছে শুধু এক হাট, নাম সুতানুটি। মোগলদের থেকে পালাতে পালাতে এই জায়গাতেই থেকে গেলেন তিনি। একদিন দুইদিন নয়, টানা দুই মাস। এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল, আরে! বড়দিন এল বলে! সেই সুতানুটিতে লুকিয়ে থাকার সময়ই বড়দিন পালন করেন চার্নক। কলকাতায় সেই প্রথম বড়দিন পালিত হল।

কলকাতার বড়দিনের একটা বিশেষ ব্যাপার ছিল, যা সারা পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। ইংরেজরা তাকে বলত 'ডলি।' হিন্দি ডালি শব্দ থেকে এসেছিল সেটি। দুর্গাপুজোতে যেমন ডালি দেওয়া হয়, তেমনি সাহেববাড়ির বেয়ারা, খানসামা ও অন্য কাজের লোকেরা বড়দিনে তাঁদের ইংরেজ মনিবদের 'ডলি' বা ভেট পাঠাতেন। তাতে থাকত ফলমূল, কেক, মিষ্টি থেকে শুরু করে মাছ-মাংস ইত্যাদি। এগুলি দিয়ে কেরানি, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি ও দালালরা সাহেব প্রভুদের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। ফ্যানি পার্কস এদের কিসমিস-বকশিশ (ক্রিসমাস বক্সেস) নাম দিয়েছিলেন। তবে এই বকশিশ নেবার জ্বালা ছিল। যে কর্মচারী এই ডলি দিত, তাকে ডলির মূল্যের বেশি দামের ফিরতি টাকা বা পার্বণী দেবার নিয়ম। ফলে

মেমসাহেব বড়ো দুঃখ করে বলেছেন, ‘এ উপহারে খরচা বড্ড বেশি।’ তবে সেই বড়দিনেই তিনি কী কী উপহার পেয়েছিলেন, তার লিস্টি দেখলে চমকে যেতে হয়— একটা ধূসর ঘোড়া, লর্ড বেন্টিঙ্কের ছবি, হিরের আংটি, পাহাড়ি শাল, দুই বোতল মধু, দুই বোতল জ্যাম, এক থলে আখরোট ইত্যাদি। ভাবা যায়!

EVERY BODY'S
TOAST BOOK,
AND
CONVIVIAL COMPANION;

CONTAINING

THE CHOICEST COLLECTION EVER ISSUED,

AND

BRIMMING OVER

WITH TOASTS AND SENTIMENTS FOR ALL CLASSES AND ALL OCCASIONS.

BY AN ADEPT.

"COME, LET THE TOAST PASS!"

PUBLISHED BY
FISHER & BROTHER,
No. 15 NORTH SIXTH STREET, PHILADELPHIA
74 CHATHAM STREET, NEW YORK.
71 COURT STREET, BOSTON;
62 BALTIMORE STREET, BALTIMORE

বড়দিন উৎসবের আসল আকর্ষণ ছিল পারিবারিক মহাভোজ। সে ভোজের মেনু শুনলে হাঁ হয়ে যেতে হয়। এই ভোজে খাবারের মধ্যে একটা প্রধান জিনিস ছিল 'বোরস্ হেড' বা শুয়োরের মাথা, যা রোজমেরি, বে-লিফ (তেজপাতা), আপেল আর অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে পরিবেশন করা হত। নানারকম খাদ্য, পানীয় থরে থরে টেবিলে রাখা থাকত। থাকত টার্কি, ডাক রোস্ট, প্লাম, পুডিং, যত রাজ্যের জিনিস দিয়ে তৈরি বিরাট ক্রিসমাস পাই, ট্যাঞ্জারিন, লেবু, খেজুর, বাদাম, কিসমিস, চকোলেট, আরও কত কী!! এইদিন সাহেবরা মহা আনন্দ করলেও বেয়ারাদের খাটতে খাটতে হাড় কালি হয়ে যেত। তবে ভালো কাজ করলে ভাগ্যে ভালো খাবার আর বকশিশও জুটত তাদের। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরে বা মার্চেন্ট অফিসের সাহেবরা বাড়িতেই বড়দিন পালন করতেন। কিন্তু পরের দিকে কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের একতলার বিরাট হলঘরটাকে বড়দিনের সন্ধ্যায় পৃথিবীর সব দেশের পতাকা দিয়ে করে সাজানো হত। নাম দেওয়া হত 'হল অফ অল নেশনস।' মজুত থাকত নানা খাদ্য আর পানীয়। সাহেবরা তাঁদের মেমসাহেবদের নিয়ে সেখানে এসে বড়দিন উদযাপন করতে পারতেন। সেখানে নাকি সাহেবরা এদেশীয়দের মতো কোলাকুলিও করতেন। দেশীয় মানুষদের এই অনুষ্ঠানে ঢুকতেই দেওয়া হত না। এ অনুষ্ঠানকে সাহেবদের বিজয়া সম্মিলনী বললেও ভুল বলা হয় না।

পুরোনো কলকাতার বড়দিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভোজ হত বড়োলাটের প্রাসাদে। কলকাতার পাশাপাশি সুবে বাংলার বহু জায়গার রাজকর্মচারী ও সেনাকর্তারা এতে নিমন্ত্রিত থাকতেন। উৎসব শুরু হত ব্রেকফাস্ট দিয়ে আর শেষ হত ডিনার আর বলড্যান্সের পরে। মুশকিল হল লর্ড কর্নওয়ালিস যখন বড়োলাট হলেন। তিনি ছিলেন বড়দিনের এই ফুর্তির ঘোর বিরোধী। মনে করতেন পবিত্র দিনটিতে উপাসনা এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো উচিত। ফলে ১৭৮৫ থেকে শুরু করে তাঁর গোটা শাসনকালে তিনি লাটভবনে বড়দিন উৎসব বন্ধ করে দেন। এতে সাহেব-মেমরা বেজায় রাগ করলেও কিছু বলতে পারেননি। কর্নওয়ালিস বিলেত চলে গেলে আবার সেই উৎসব শুরু হয়। সাহেব-মেমরাও যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

সেকালে বাঙালি ভোজবাড়ির খাওয়া

অষ্টাদশ শতকে ভোজবাড়িতে বিবাহে ফলাহার হত অর্থাৎ চিঁড়ে, দই, খই, ঘি ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতকে বিয়েবাড়িতে লুচির প্রবেশ ঘটে। কলাপাতায় বড়ো বড়ো লুচির সঙ্গে দেওয়া

হত আলুনি কুমড়োর ছক্কা। কলাপাতার এক কোণে থাকত সামান্য নুন। অনেক সময় এই নুন আবার অতিথিরা তাদের নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে আসত। তাতে জাত যাবার বা নিমকহারাম হবার ভয়ও থাকত না।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর লেখায় সেকালের কলকাতার ভোজবাড়ির এক চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন—

''কলাপাতার কোণে একটু নুন দিত। সে আলুনি কুমড়া এখনও বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। সে রান্নার পাকা হাত আর নাই। এখনকার কুমড়ার ঘণ্ট যেন রাবিশ... তারপর আসিত কচুরির সরা। সেটা উঠে গেছে। কড়াই ডালের পুরে আদা মৌরী দিয়ে কচুরি, নিমকি, খাজা, চৌকোগজা, মতিচূর এই রকম সরাতে থাকিত। অন্য খুরিতে সন্দেশ থাকিত। পেনেটির গুঁপো সন্দেশ খুব বিখ্যাত ছিল। তারপর আসিত ক্ষীর, দৈ। খাজা দিয়ে ক্ষীর খাওয়া হইত। ইহাকে ক্ষীরখাজা বলিত। তখনও রাবড়ি উঠে নি। রাবড়ির প্রচলন লক্ষৌতে হয়। রসগোল্লা, তিলকূট তখনও হয় নাই। ক্রমে ক্রমে শাকভাজার আবির্ভাব হইল। পরে পটলভাজা বাহির হইল। আর বিশেষ উন্নতি হইল না। তারপর ইংরাজি পড়ার ঠেলায় নুন দেওয়া ছোলার ডাল ও নুন দেওয়া আলুর দম প্রকাশ পাইলেন এবং আলুনি ঠান্ডামূর্তি কুমড়ার ছক্কা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। ক্রমে সরা সাজানো লোপ পাইল।''

তাঁর লেখায় বিয়েবাড়িতে মাছ প্রচলনের দারুণ মজার এক বিবরণও পাই—

"আমরা একবার রাত্রে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপনয়নের নিমন্ত্রণে গেছি। তখন নুন দেওয়া তরকারি খাবার প্রচলন হইয়াছে। হঠাৎ মালসা খুরি হাতে মাছের তরকারির আবির্ভাবে সকলেই হাঁ হাঁ, কি করেন। জাত গেল, ধর্ম গেল। বোধ হইল সকালেই সকলকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই তো কটা বুড়োয় রব তুললে। আমরা ছোকরার দল লোলুপ দৃষ্টিতে মালসার দিকে আর পাতের দিকে চাহিতে লাগিলাম, যদি লুচিতে আর মাছেতে সংযোগ হয় ত সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তখনই পাই। এমন সময় আমাদের দিকে একটা বুদ্ধিমান লোক বললে, 'কি জান, আমরা কায়স্থ, তা ব্রাহ্মণের পাতের এঁটো খেলেও জাত যায় না, ব্রাহ্মণের বাটিতে মাছের তরকারি প্রসাদের সামিল কাজেই সেটা রাত্রে বা দিনে সব সময়ই খাওয়া যেতে পারে' - এইসব স্মৃতির বচন সে আউড়াইল। তখন 'আমাকে দাও' 'আমাকে দাও' করে গামলা ফুরিয়ে গেল।"

অভিজাতদের ডিনারের মধ্যে আলুর দমপোক্ত, মোচার আমষোল, কাঁচকলার হিঙ্গি, উচ্ছে-পেঁয়াজ ও রসগোল্লার কালিয়ার নাম করা যায়। বাকিগুলো এখন রান্না হলেও মোচার

আমযোল বা কাঁচকলার হিঙ্গি বোধহয় এখন আর কেউ রাঁধে না। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গের বিয়েবাড়িতে লুচি-পোলাও-কোর্মার চল ছিল না। ভাত হত। শেষপাতে পায়েস দেওয়া হত। ছোটোবেলায় আমিও দেখেছি অঢেল পায়েস বালতি থেকে বড়ো হাতায় পাতে ঢেলে দেওয়া হত, গরমকালে পায়েসের সঙ্গে আমও দেওয়া হত। আম চিপে পায়েসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিমন্ত্রিতরা সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দে পায়েস খেতেন, কবজি বেয়ে রস গড়াত। এটাকেই বোধহয় প্রকৃত অর্থে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া বলে। বাঙালবাড়ির বিয়েতে মেনু হিসেবে কুমড়োর ঘ্যাঁট, এমনকি মানকচুও থাকত।

ঘটি বাড়ির মেনু ছিল আলাদা। বিয়েবাড়ির ভোজে লুচিই থাকত। সঙ্গে ছোলার ডাল, শাক ভাজা, কখনও কুমড়োর ছোকা ও ছ্যাঁচড়া। ডাঁটাওলা বেগুনভাজা থাকত বেগুনের সময়। মাছের কালিয়া, কখনও পোলাও, খাসির মাংস, দই, দরবেশ, রসগোল্লা বা সন্দেশ। মোটামুটি প্যাটার্নটা এরকমই। বড়লোকের বাড়ির মেনু নিশ্চয়ই আলাদা রকম। চিত্রা দেব কৃষ্ণনগরের মহারাজ সৌরীশ চন্দ্র রায়ের ‘পাকা দেখা’ অনুষ্ঠানের একটা মেনু পেয়েছিলেন। তাতে দেখা যায়— পাঁচ রকমের পোলাও, মাছের আট রকম পদ। যেমন রুই পেটি, ভেটকি ফ্রাই, রুই দমপোক্ত, কই পাতুরি, চিংড়ি মালাইকারি, ভেটকি ক্রুকেড, দই মাছ, মাছের অম্বল।

BARGAINING AT BHENDI BAZAAR.

মাংসের পদ থাকত পাঁচ রকম। মুরগির মাংস বিবর্জিত। উচ্চবর্ণ হিন্দু বাড়িতে সাধারণত মুরগির মাংস ঢুকত না। নিরামিষ তরকারির ছিল বারোটা পদ। কয়েকটা বলি। কুমড়োর হুসেন শা, লাউ রায়তা, ফুলকপির জামাইভোগ, ফুলকপির মোগলাই কারি, বাঁধাকপির বুক ধড়ফড়ি, ফুলকপির রোস্ট, পাঁপড় কারি, মোচার চপ, বাঁধাকপির মির্জাপুরী, আলুর জয়হিন্দ। সেসময় (১৯৪২ থেকে ১৯৫৭) নানা রকমের 'জয়হিন্দ' হত। কলকাতার একটা দোকানে 'জয়হিন্দ' সন্দেশ সেদিনও পাওয়া যেত। সেই বরফি সন্দেশের তিনটি স্তরে তিনটি রং থাকত। গেরুয়া,

সাদা, সবুজ। চিত্রা দেব শেষপাতের মিষ্টির যে তালিকা দিয়েছেন— তাতে দেখি দিগনগরের দেদো মন্ডা, স্বরূপগঞ্জের পানতোয়া, মুড়াগাছার ছানার জিলাপি, বর্ধমানের সীতাভোগ, বহরমপুরের ছানাবড়া, বেলডাঙার মনোহরা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়া, দ্বারিকের গোলাপ সন্দেশ, ও কালাকন্দ, নবদ্বীপের বেদানাবোঁদে, শান্তিপুরের নিখুঁতি, কালীগঞ্জের রসকদম্ব।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই, শোভাবাজার রাজবাড়ির ছেলে কেশবেন্দ্র দেবের বিয়ের মেনুকার্ডে ৩৬ রকম খাবার দেখতে পাই। তাদের লিস্টি দেবার লোভ সামলানো গেল না—

১। লুচি ২। ডালপুরি ৩। পদ্মলুচি ৪। গুজরাতি ভর্তা ৫। পুরি ৬। হোসনি কাবাব ৭। ছোঁকা ৮। মোগলাই কোর্মা ৯। চন্দ্রকলা ১০। মুগ মনোহর ১১। কোপ্তা কারি ১২। পাঁপড়ের ডালনা ১৩। মালাইকারি ১৪। কচুরি ১৫। বাদশাহি ভোগ ১৬। খিরের খড়ুই ১৭। রায়তা ১৮। সন্ধানিকা ১৯। ফুলকপির রায়তা ২০। মিঠে গোলাপি চাটনি ২১। বিপ্রভোগ ২২। সোহন মোহন ভোগ ২৩। সমসা ২৪। কমলালেবুর সন্দেশ ২৫। গোলাপী পেঁড়া ২৬। আবার খাবো ২৭। ক্ষীরের মালপো ২৮। সরপুরিয়া ২৯। সরভাজা ৩০। বরফি ৩১। বেসনের লাড্ডু ৩২। বাদামের বরফি ৩৩। পেস্তার বরফি ৩৪। মোরব্বা ৩৫। চাটনি ৩৬। ফল

ঠাকুরবাড়ির লোকেরা যথার্থ ভোজনরসিক ছিলেন। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। ঠাকুরবাড়িতে পাকা আম ভাতে, পাকা পটলের টক, কাঁচা ও কচি তেঁতুলের ঝোল, বেগুন ও কাঁচাকুলের টক, তিল বাটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল রান্না হত। রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী পাকা আমের মিঠাই বানাতেন। শেষপাতে দই ও সন্দেশ অপরিহার্য ছিল। মিষ্টির নানারকম নামও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার একটি মিষ্টি খেয়ে নাম দেন 'এলোঝেলো', পরে বদলে রাখেন 'পরিবন্ধ'। অবনীন্দ্রনাথ যে লাইব্রেরি থেকে রান্নার বই বার করে রীতিমতো রান্নার ক্লাস খুলেছিলেন, সে কথাও তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল লিখে গেছেন। অবন ঠাকুরের রাঁধুনি রাধুকে নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা চলত। প্রচলিত প্রথাকে বদলে দেওয়া হত। পেঁয়াজ প্রথমে ভাজার হলে তাকে শেষে ভাজতেন। শেষে সাঁতলাবার জিনিস প্রথমেই সাঁতলাতেন। যাকে ভাজতে হবে তাকে সিদ্ধ করতেন। এই প্রথাতেই তিনি 'মুরগির মাছের ঝোল' আর 'মাছের মাংসের কারি' আবিষ্কার করেন। সেই ক্লাসেই একদিন কবি জসীমুদ্দিন এসে অপূর্ব 'জোসী কাবাব' বানালেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি রান্না আবিষ্কার করেছিলেন। সে রান্নার কথা একটি খাতায় লেখা হয়ে তাঁর বড়ো মেয়ের কাছে ছিল। বড়ো মেয়ে মারা যাওয়ায় সে খাতাও হারিয়ে যায় চিরকালের মতো। রবীন্দ্রনাথের প্রিয়

ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর রান্নার উৎসাহ ছিল দেখার মতো। তাঁর একটি খাতায় নানা বিদেশের রান্না নিজের হাতে লিখে রাখতেন। সেসব একত্র করে ১৯৮৬ সালে পূর্ণিমা ঠাকুর 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' বইটি লেখেন।

চা-ই চাই

চায়ের গোপন কথা

পনেরোশো বছর আগের কথা। ইংরেজরা রোমানদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত। শুধু যুদ্ধের মাঝে মাঝে তাঁদের শক্তি যোগাচ্ছে দু ফোঁটা দুধ দেওয়া গরম জল। সেই যুদ্ধে যখন তাদের হার হয় হয়, তারা সাহায্য চাইল ফরাসিদের। ফ্রান্সের এক নাম না-জানা গ্রাম থেকে দুই যোদ্ধা আর এক পুরোহিত এলেন তাদের সাহায্যে। সেই পুরোহিত গরম জলে মিশিয়ে দিলেন অদ্ভুত এক পাতা। আর তাতেই চনমনে হয়ে লড়াইতে জিতে গেল ইংরেজরা। সেই থেকে সেই চা-পাতার ভেজানো জল, ইংল্যান্ডের জাতীয় পানীয় হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই চায়ের ইতিহাস লিখেছিলেন রেনে গোচিনি। অ্যাসটেরিক্স ইন ব্রিটেন কমিকসে। 'রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা!' কিন্তু চা নিয়ে যে কটা গল্প আসল বলে পরিচিত, সেগুলোও কম রোমাঞ্চকর না।

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। চিনে তখন তাং সাম্রাজ্য চলছে। চাং বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা বোধিধর্ম ধ্যানে বসেছিলেন। ধ্যান করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর টানা নয় বছর ঘুমিয়ে কাটান। ঘুম ভাঙতেই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন তিনি। আর যাতে কখনোই চোখ বুজে না আসে, সেজন্য নিজের চোখজোড়ার পাতা স্বহস্তে ছিঁড়ে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেন। চোখের পাতা দুটি যেখানে পড়েছিল, সেখান থেকেই নাকি তখন পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো জন্ম নেয় একটি চা গাছ, যার পাতা চিবিয়ে বা জলে ভিজিয়ে খেলে চোখ থেকে ঘুম ঘুম ভাব দূর হবেই! বিশ্বাস করুন, এই গল্প শুনে আমার চা পানের ইচ্ছে প্রায় চলে গেছিল।

যাঁদের আমার মতো এই গল্প শুনে গা ঘিনঘিন করবে, তাঁদের জন্য পেশ করি আরও এক 'সত্যি' গল্প। খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ সালে চিনের মহামহিম দিগ্বিজয়ী সম্রাট শেন্ নাং এক বিচিত্র আইন জারি করেছিলেন যে— সবাইকে জল পান করার আগে তা অবশ্যই ঠিকমতো ফুটিয়ে নিতে হবে (ভদ্রলোক হেলথ কনশাস ছিলেন, মানতেই হবে)। তো একদিন সম্রাটের খাওয়ার জন্য জল পাত্রে ফোটাতে দেওয়া হয়েছে, কোত্থেকে যেন কিছু চা গাছের পাতা উড়ে এসে তাতে পড়ল। ব্যস, জলের রং পালটে গিয়ে খয়েরি হয়ে গেল। সেই জল পান করে

মহারাজের এত ভালো লাগল যে তিনি আদেশ দিলেন সব প্রজারা এই পাতা ভিজিয়ে জল খাবে। এভাবেই গোটা চিন, আর তারপর সারা পৃথিবীতে এই পানীয় ছড়িয়ে যায়। ঐতিহাসিকরা অবশ্য চিনের ইউনান প্রদেশকেই চায়ের জন্মভূমি আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ চাইনিজ মাল মানেই চলবে না, এই ধারণা অন্তত চায়ের বেলায় খাটে না।

ব্রিটিশ ও চা (১৯৩৫) পাঞ্চ কার্টুন

ইংল্যান্ডে প্রথম চা আসে পর্তুগিজদের হাত ধরে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৬২ সালে পর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথরিন ব্রাগাঞ্জাকে বিয়ে করেন। ক্যাথরিনের ছিল ভয়ানক চায়ের নেশা। নিজে তো পান করতেনই, গোটা রাজপরিবারকে এই নেশা না ধরিয়ে তিনি ছাড়লেন না। মোটামুটি এই সময়ই ইংল্যান্ডের পত্রিকায় চায়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় আর জাহাজে করে পেটি পেটি চা আমদানি হতে থাকে। রানি অ্যানের নাকি ব্রেকফাস্টে চা না হলে ঘুমের রেশই কাটত না। ১৭৫০ নাগাদ ইংল্যান্ডের সব অভিজাতরা আবশ্যিকভাবে রোজ চা পান করতেন। চায়ের দাম ছিল চড়া। এক পাউন্ড চায়ের দামে একজন শ্রমিকের তিনদিনের মজুরি দেওয়া যেত।

ইংরেজদের চা পান অন্যদের থেকে দুটো বিষয়ে আলাদা। এক, এই পৃথিবীতে দুধ-চা নামক বস্তুটি তাঁদেরই আমদানি (আমারও ওটাই প্রিয়, জানিয়ে রাখি)। এর পিছনেও একটা কারণ আছে। চা পানের জন্য যে পাতলা পোর্সেলিনের পেয়ালা ব্যবহার করা হত, তা গরম

চা ঢাললেই ফেটে যেত অনেকসময়। তাই আগে ঠান্ডা দুধ ঢেলে তাতে চা ঢালার রীতি শুরু হয়। আর দুই হল, বিকেলে চা পান। এর পিছনে একটা ঘটনা আছে। আগেই বলেছি তখন লাঞ্চ হত বারোটার মধ্যে, আর ডিনার সন্ধ্যার ঠিক আগে। মাঝের এই লম্বা সময়ে বেডফোর্ডের সপ্তম ডাচেস অ্যানার লম্বা লম্বা হাই উঠত। ঘুম পেত। বাড়ির পুরুষরা কাজে বাইরে গেছে। তাই অ্যানা তার বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে রোজ বিকেলে নিজের বাড়িতে চায়ের আসর বসাত। তাতে শুধু চা নয়, টা-ও চলত। আর চলত দুনিয়ার গসিপ। ১৮৪০ থেকে শুরু হওয়া এই প্রথা ১৮৮০ নাগাদ এত জনপ্রিয় হয়ে যায় যে ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরে বিকেলের চা পান লাঞ্চ বা ডিনারের থেকেও গুরুত্ব পেতে থাকে। আমেরিকাতেও চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে হুহু করে। ইংরেজরা সুযোগ বুঝে চায়ের উপর ধার্য কর বাড়িয়ে দিলে বোস্টন বন্দরে পেটি পেটি চা জলে ফেলে দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু হয়, তা-ই ঐতিহাসিক বোস্টন টি পার্টি নামে খ্যাত। তবে ভারতের কলকাতা শহরের পাড়ার দোকানে তা কীভাবে এল, সে আর-এক কাণ্ড।

ভারতে চা যেভাবে এল তাকে ঘুরিয়ে নাক ধরা বলা যায়। সোজাসুজি চিন থেকে না এসে এল ব্রিটেন ঘুরে। অনেক চিনা পর্যটক ও ধর্মপ্রচারক ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে বহুবার এসেছিলেন। সেই ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দেও বঙ্গদেশ ঘুরে গেছেন ফা হিয়েন, ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে এসেছিলেন হিউয়েন সাং। কিন্তু তাঁদের লিখে যাওয়া ভ্রমণবৃত্তান্তের কোথাও চায়ের নামগন্ধটুকুও নেই। এমনকি পঞ্চদশ শতকে চিন থেকে যে ছয়জন দূত বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে এসেছিলেন, তাঁদের পাঠানো সরকারি রিপোর্টে এই অঞ্চলে চা-পানের কোনও কথা নেই। চায়ের নাম নেই দুই দেশের তখনকার পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের জন্য উপযোগী পণ্যের তালিকাতেও। মোগল আমলে নবাব আলিবর্দি খাঁ-র খাদ্যতালিকায় কফির বাধ্যতামূলক উপস্থিতি থাকলেও চায়ের হদিশ সেখানে মেলে না। তবে ১৫৯৮ সালে আসাম ঘুরে যাওয়া ওলন্দাজ পর্যটক জন হিউগেন তাঁর ভ্রমণঅভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার সময় লিখেছিলেন, আসাম অঞ্চলের আদিবাসীরা একধরনের বন্য চা গাছের পাতা তরকারি হিসেবে রসুন ও তেল দিয়ে রান্না করে খেয়ে থাকে। এমনকি তারা পানীয় হিসেবেও তা পান করে, কিন্তু সেই পানীয় তৈরির প্রক্রিয়া আদতে কীরকম বা নিদেন পক্ষে তা প্রচলিত চায়ের ধরনেরই কোনও পানীয় কি না, সেসব তথ্য আর ওই পর্যটক জানাতে পারেননি।

যাহাতে নাহিক মাদকতাদোষ
কিন্তু পানে করে চিত্তপরিতোষ

চা প্রচারের বিজ্ঞাপন। শিল্পী যতীন সেন। দমদম স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে তোলা

স্বদেশে চায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চিন থেকে চা আমদানির পরিমাণও সংগত কারণেই বাড়াতে হয়। তবে এদের তাতে তেমন সমস্যাও তৈরি হয়নি। আর্থিক লাভ ভালোই হচ্ছিল, উপরন্ত চিনের বাজারে তাদের দাপট ও প্রভাবও নেহাত কম ছিল না। বঙ্গদেশে যেসব ইংরেজ এসেছিলেন, তাঁরা তখন সেখানে থেকেও নিয়মিত চা খেতেন, এবং তা নির্ঘাত চিন থেকেই আনা হত। এই ধারণার সপক্ষে বাংলা একাডেমি

প্রকাশিত বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধানে পাই, ১৭৯৩ সালে আপজন প্রকাশিত ইংরেজি-বাংলা অভিধানে 'চা' শব্দটির দেখা মেলে, আছে 'চা-পানি' শব্দটিও। এ ছাড়া ১৭৯৭ সালে প্রকাশিত জন মিলারের 'সিক্ষ্যাগুরু' বইতে সংকলিত জনৈক সাহেবের দেওয়ান এবং চাকরের মধ্যে একটি সংলাপেও সাহেবের চা পানের অভ্যাসের উল্লেখ মেলে।

বাঙালি উনিশ শতকের শেষার্ধে এসেও ঠিক সেভাবে চায়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেনি, উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে এসে বলা চলে বাঙালি চায়ে আস্তে-ধীরে মজতে শুরু করে। স্বামী বিবেকানন্দর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত নিজের ছোটোবেলার স্মৃতি থেকে লিখেছেন ঔষধ হিসেবে চা পানের কথা। তাঁর 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' বইতে তিনি লিখেছেন :

অন্নদা মুনসীর চায়ের বিজ্ঞাপন

বাংলার পুরাতন কাঠখোদাইচিত্রের শৈলীতে ও, সি, অঙ্কিত একটি বিজ্ঞাপন চিত্র।

Lipton Limited

Independence Day 1955

ও.সি অঙ্কিত একটি বিজ্ঞাপন চিত্র

‘আমরা যখন খুব শিশু তখন একরকম জিনিস শোনা গেল— চা। সেটা নিরেট কি পাতলা কখনও দেখা হয়নি। আমাদের বাড়িতে তখন আমার কাকীর প্রসব হইলে তাঁহাকে একদিন ঔষধ হিসাবে চা খাওয়ান হইল। ...একটা কালো কেটলী মুখে একটা নল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর কুঁচো পাতার মতন কি দিলে, গরম জল দিলে, তারপর ঢাললে, একটু দুধ

চিনি দিয়ে খেলে। আমরা তো দেখে আশ্চর্য, যা হোক দেখা গেল, কিন্তু আস্বাদনটা তখনও জানিনি। আর লোকের কাছে গল্প, যে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, এই হল প্রথম দর্শন। তখন চীন থেকে চা আসত, ভারতবর্ষে তখনও চা হয়নি।'

লর্ড কার্জনের বক্তৃতায় চা পানের সপক্ষে প্রচারের কথা দেখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বভাবতই চায়ের মধ্যে দেখতে পান সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের নয়া কূটকৌশলের ছায়ারেখা। বাংলার সর্বস্তরে চায়ের জনপ্রিয়তাকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালিকে অলস ও নেশাতুর করার পথে ইংরেজের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেন, উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ 'চা-এর প্রচার ও দেশের সর্বনাশ'-এ। চা পানে বাঙালিকে উৎসাহিত করার জন্য ইংরেজদের গৃহীত বহুমুখী অদ্ভুত কূটনীতি ও চোখধাঁধানো কৌশলই ছিল সে লেখায় তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য। চা চাষের ফলে বাংলার অর্থনীতি কীরকম দুর্বল হয়ে পড়ছে তা নিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন। শেষে চা কীরকম স্বাস্থ্যগত ক্ষতি করে তারও বর্ণনা দিয়েছেন। তবে আচার্যের এই প্রবন্ধের প্রধান ভাবগত ঝোঁকটা চা পানের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও আত্মিক ক্ষতির রুক্ষ বিবরণের দিকেই বলে মনে হয় । তিনি জানাচ্ছেন, ইংরেজরা চা পানের দিকে বাঙালিদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য কলকাতার দুই বড়ো চৌরাস্তা, বৌবাজার ও ঠনঠনিয়ার মোড়ে চায়ের দোকান স্থাপন করেছিল, যেখান থেকে বিনামূল্যে সবাইকে চা তৈরি করে খাওয়ানো হত— বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষুদ্র মোড়কে এক পয়সার চা-পাতাও বিনা পয়সায় বিলি করা হত।

বিষয় যখন কেক

'দ্য অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি' অনুসারে, 'কেক' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৩ শতকে। 'কাকা' (Kaka) নামক প্রাচীন নর্স শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করে এই 'কেক' শব্দটি। কাকা কিন্তু বাবার ভাই নন। নিতান্তই এক চ্যাপটা রুটি। মধ্যযুগীয় ইউরোপবাসীও কেক তৈরি করতে পারত। তবে আগের দিনের কেকগুলো অনেকটা পাউরুটির মতো ছিল। আর কেককে মিষ্টি করার জন্য উপরে মধু দেওয়া হত। মাঝে মাঝে একে আকর্ষণীয় ও আরও সুস্বাদু করার উদ্দেশ্যে বাদাম এবং ড্রাই ফ্রুটস দেওয়া হত।

প্রথম ক্রিসমাস পালিত হয় রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের আমলে ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ক্রিসমাসে কেক খাওয়ার প্রচলন অবশ্য আরও পরে। ক্রিসমাসের আগের দিন উপবাস করার নিয়ম ছিল। উপবাস ভাঙা হত প্লাম পরিজ খেয়ে। এরপর পরিজ বানানো শুরু হয় ড্রাই ফ্রুটস

দিয়ে। ক্রমশ মশলা মধু সহযোগে পরিজ হয়ে ওঠে ক্রিসমাস পুডিং। ১৬ শতকে ওটমিলের বদলে ময়দা চিনি আর ডিম দিয়ে তৈরি করা হয় সেদ্ধ প্লাম কেক। অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিদের কাছে আভেন থাকত। তাঁরা ইস্টারের কেকের স্টাইলে ড্রাই ফ্রুটস আর প্রাচ্যের মশলা ব্যবহার করে বানাতে শুরু করেন আজকের দিনের প্রচলিত ক্লাসিক ক্রিসমাস কেক।

খাদ্যগবেষকদের মতে, প্রাচীন মিশরীয়রা অন্য অনেক কিছুর মতোই পৃথিবীতে প্রথমবার কেক বানানোর কৌশল আবিষ্কার করেন। খাদ্যবিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক কেক প্রথমবারের মতো প্রস্তুত করা হয় ইউরোপে, আর সময়টা ছিল ১৭ শতকের মাঝামাঝি। উল্লেখ্য, আধুনিক কেক বলতে গোলাকার কেকগুলোকে বোঝানো হয়, যেগুলোর উপর আইসিং করা হয়। এর পেছনে মূলত ভূমিকা ছিল ইউরোপের প্রযুক্তিগত উন্নতির। ১৭ শতকের মাঝামাঝি প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে ওভেন ও কেক বানানোর জন্য বিভিন্ন আকৃতির ছাঁচ পাওয়া যেত। তা ছাড়া বিভিন্ন খাদ্য উপাদানও তখন সহজলভ্য হয়, যার ফলে কেক তৈরির কাজটি সহজ হয়ে যায়। কেকগুলোকে আকার দেওয়ার জন্য তখন শুধুমাত্র একধরনের ছাঁচই ব্যবহৃত হত, যা তৈরি করা হত ধাতু, কাগজ বা কাঠ দিয়ে। এগুলোর মধ্যে কিছু ছাঁচ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ছিল। কখনও কখনও কেক-প্যানও ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

মিসেস বিটনের বইতে আঁকা নানা রকমের কেক

কলকাতায় প্রথম বিখ্যাত কেকের দোকান মানে নাহুম। সেটা ব্রিটিশ আমল, ইউনিয়ন জ্যাক তখনও সগৌরবে পতপত করে উড়ছে ফোর্ট উইলিয়মের মাথায়, কলকাতা জুড়ে তখন

সাহেবসুবোদের আনাগোনা। জমিয়ে ক্রিসমাস পালন হয়, পার্টি দেন নামজাদা সাহেবরা, অর্ডার আসে কেকের... কলকাতাকে তখন একটুকরো লন্ডন বললেও বোধহয় ভুল বলা হয় না! 'জুয়েল অফ দ্য ক্রাউন', ব্রিটিশ রাজের অতি গর্বের শহর কলকাতার তখন সে বড়ো সুদিন। নিত্যনতুন রোজগার আর সেই রোজগারের আশায় নানা ভিনজাতির লোকের আগমন। উনিশ শতকের শেষের দিকেই সেই সুদূর ইরাক থেকে কলকাতা সহ ভারতের নানা জায়গায় আসতে শুরু করেছিলেন ইহুদিরা। সেই সূত্রেই নাহুম ইজ়রায়েল মোরদেকাইয়ের কলকাতায় আগমন। নতুন শহর, এখানে বাঁচার তরিকাও আলাদা, তাই ১৯০২ সালে কলকাতার বুকে নাহুম খুলে ফেললেন ছোট্ট একটা দোকান, ফেঁদে বসলেন বেকারির ব্যবসা। পুঁজি কম, ডোর-টু-ডোর মডেলে তাই শুরু হল ব্যবসা। অচিরেই লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল নবাগত এই ইহুদির কেকের দোকানের গল্প, সাহেবপাড়ার পার্টিতে নাহুম আর তাঁর কেক রীতিমতো চর্চার এক বিষয়। সেই শুরু। নাহুম ইজ়রায়েলের হাত ধরে নাহুম'স-এর যাত্রার সূচনা হলেও পারিবারিক ব্যবসায় কাঁধে কাঁধ মেলাতে এগিয়ে এলেন তাঁর ছেলেরা। ততদিনে নাহুম'স কলকাতায় রীতিমতো এক নাম! ১৯০২-এর পুরোনো দোকান শেষমেশ ১৯১৬ সালে উঠে এল বর্তমান ঠিকানায়, সিলিংয়ের ডেকোরেশন থেকে শুরু করে কাঠের টেবিল... ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে অবিকৃত রাখা হল দোকানের অন্দরসজ্জা, রমরমিয়ে চলতে লাগল নাহুম-এর ব্যবসা। এই সময়েই নানা গভর্মমেন্ট হাউজ়েও সাপ্লাই করতে শুরু করে নাহুম'স। শোনা যায়, ১৯৬০-এ আর্চবিশপ অফ ক্যান্টারবেরি জিওফ্রে ফিশার এখানকার কেক খেয়ে সেরা কেকের তকমাও দিয়েছিলেন।

তবে কেক না পোড়ালে রাজা আলফ্রেড দ্য গ্রেট বোধহয় গ্রেট হতে পারতেন না। ভাইকিংদের তাড়া খেয়ে রাজা তখন ছদ্মবেশে পালাচ্ছেন। এক কৃষকের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছেন রাতে মাথা গোঁজার জন্য। চাষিবউ বলল, 'দ্যাখো বাছা, গায়ে খাটতে হবে। এই কেকগুলো বেক করতে দিলাম। খেয়াল রেখো।' আলফ্রেড তো তাঁর দুর্দশার কথা ভাবছেন। এদিকে কেক গেছে পুড়ে। চাষিবউ দেখে এমন বকা বকলেন, সে আর বলার নয়। বললেন, 'আরে তুমি হাতে যেটা আছে সেটায় মন দাও। পরের কথা পরে ভাববে। নিজের কাজটা ঠিক করে করো আগে।' টনক নড়ল রাজার। তাই তো। তিনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে অগ্রাহ্য করছেন। লোকজন জমা করে তিনি আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভাইকিংদের বিরুদ্ধে। এবার জয়লাভ করলেন। আজও তাই কাঠের ফাঁকেফোকরে গজিয়ে ওঠা পুরু কেকের মতো ছত্রাককে (যার বৈজ্ঞানিক নাম Daldinia concentrica)-কে সবাই ডাকেন কিং আলফ্রেড'স

কেক বলে।

'To take the cake' নামে ইংরেজিতে একটা কথা আছে। মানে অনেকের মধ্যে দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া। স্পটলাইট নিজের দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া। এর উৎস কিন্তু উনবিংশ শতকের আমেরিকার কালো ক্রীতদাসরা। সারাবছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাঝেমধ্যে যদি বা ছুটি পেত, তারা নানারকম মজার খেলা খেলত। তাদের একটা ছিল জোড়ায় জোড়ায় ফ্যাশন প্যারেডের মতো হেঁটে আসা। যাদের পোশাক, হাঁটা সবচেয়ে ভালো হত, তারা পুরস্কার হিসেবে একটা বড় কেক পেত। আর এই হাঁটাকে কী বলত? কেকওয়াক।

দুইবার রাঁধা বিস্কুট

শুনলে অবাক লাগতে পারে, বিস্কুট এখন চায়ের অপরিহার্য সঙ্গী হলেও প্রথমে এটা খাওয়া হত লাঞ্চ হিসেবে। নাবিকরা যখন মাসের পর মাস সমুদ্রে কাটাতেন, তখন নরম খাবার নষ্ট হয়ে যেত। ১১৯০ সালে সিংহহৃদয় রিচার্ড তৃতীয় ক্রুসেডে পাড়ি দেবার সময় জাহাজ ভরে বিস্কুট নিয়েছিলেন। স্প্যানিশ আর্মাডার সৈন্যদের দুপুরের খাওয়ার মেনুই ছিল এক পাউন্ড বিস্কুট আর এক গ্যালন বিয়ার।

বিস্কুট নামটা এসেছে ল্যাটিন 'বিস', মানে দুবার, আর 'ককটাস', মানে রান্না করা (কুক শব্দটাও এখান থেকেই এসেছে) থেকে। আসলে বিস্কুট বানাতে গেলে মণ্ডকে প্রথমে বেক করা হয়, তারপর ধীরে ধীরে অল্প আঁচে শুকাতে হয়, তাই এমন নাম। তবে জাহাজে যে বিস্কুট নিয়ে যাওয়া হত তা সঠিক অর্থে বিস্কুট না। টোস্টকে খুব বেশি কড়া করে শুকিয়ে এই বিস্কুট হত (যা অবশ্য এখন পাড়ায় পাড়ায় লড়াইয়ের বিস্কুট আর তা থেকে লেড়ো বিস্কুট নামে খ্যাত)। ১৮৫৪ সালে বিখ্যাত ইতালিয়ান বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি যখন ইংল্যান্ডে আসেন, সেখানকার মানুষ তাঁকে পেয়ে যেন পাগলপারা হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণি তাঁকে মসিহা ভেবে স্লোগান দিতে থাকে, "We'll get a rope and hang the pope, up with Garbaldi." স্বয়ং রানি ভিক্টোরিয়া তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে ভয় পেয়ে যান। তিনি ইতালি চলে যাবার পর নাকি রানি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, "যাক বাবা, বাঁচা গেছে।" এহেন গ্যারিবল্ডিকে ইংল্যান্ড কিন্তু আজও ভুলতে পারেনি। ইংল্যান্ডের কেক কারিগর পিক ফ্রিয়ান ১৮৫৪ সালের এপ্রিলে গ্যারিবল্ডির সেনাদের জন্য কিসমিস দেওয়া একধরনের বিস্কুট বানান, যা আজও গ্যারিবল্ডি বিস্কুট নামে খ্যাত। কিছুদিন পরেই ১৮৮৫-তে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জোসেফ হটন গেঁজিয়ে যাওয়া ময়দা দিয়ে এক নতুন ধরনের বিস্কুট বানালেন। এই বিস্কুট বেক করার

আগে এর গায়ে সামান্য চর্বি মাখিয়ে নেওয়া হত। চর্বি মাখানোর এই পদ্ধতির নাম ছিল ক্রিমিং। আর তাই বিস্কুটের নাম হয় ক্রিম ক্র্যাকার। পরে উইলিয়াল জেকব একে বাজারজাত করলেন। বাংলাদেশে, বিশেষত চট্টগ্রামে বেলা বিস্কুট নামে এক গোলাকার বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে খাবার প্রচলন আছে। অনেকের মতে বেলা বিস্কুট উপমহাদেশের প্রাচীনতম বিস্কুট। কারও মতে আব্দুল গনি সওদাগর পর্তুগিজদের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম এই বিস্কুটের প্রচলন ঘটান। চট্টগ্রামের লেখক আবুল ফজল তাঁর ১৯৬৬ সালে রচিত রেখাচিত্র গ্রন্থে চন্দনপুরার বেলায়েত আলি নামক এক বিস্কুটবিক্রেতার নামানুসারে বেলা বিস্কুটের নামকরণ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। বেলা বিস্কুটের বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি মাটির তন্দুরে বানানো হত। শুধুমাত্র তন্দুরে বানালেই নাকি বিস্কুটের আসল স্বাদ ও গুণগত মান ঠিক থাকে। কেক আর পাউরুটি থেকেই যেমন বিস্কুটের জন্ম, তেমনি কেকওয়াক করতে গিয়ে কেউ বোকামো বা বাড়াবাড়ি করলে, তাকে কেকের বদলে বিস্কুট দেওয়া হত। সেই থেকে বাড়াবাড়ির অপর নাম 'To take the biscuit'।

মুড়ির গান এবং..

দুপুরবেলা ভরপেট খাওয়া কিংবা যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া ছাড়াও বাঙালির রসনায় বেশ বড়োসড়ো জায়গা নিয়ে আছে জলখাবার। জলখাবারে প্রথমেই যার নাম মনে আসে, সে হল মুড়ি। এই মুড়ি নিয়ে যমদত্তর ডায়ারীতে একখানা গান লেখা আছে। দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি আসি এই বঙ্গভূমি
উদ্ধারিছ বঙ্গবাসীজন।
কাঙাল বিষয়ী যত, সদা তব অনুগত
কভু হর তাপসের মন।।
মুড়ি ভোজী পেলে লঙ্কা, স্বর্গে যায় মেরে ডঙ্কা
শঙ্কা করে সদা তারে যম।
আদার সঙ্গে হলে যোগ অমৃতে আদিত্য ভোগ
ফলার সঙ্গে নহে কিছু কম।।

ভারতের ইতিহাসে মৌর্য যুগেরও বেশ আগে, সেই জনপদের সময় তথা মগধের উত্থানপর্ব থেকে মুড়ির প্রচলন হয়েছিল। অনেকে মনে করে বৈদিক যুগে দেবতাদের জন্য যে নৈবেদ্য

পাঠানো হত সেখানেও চালভাজার স্থান ছিল। তাই আমরা ওই চালভাজাকে মুড়ির আদিরূপ হিসেবে শনাক্ত করতে গেলে সেটা দোষের কিছু হবে না। ধারণা করা হয় হিব্রু সভ্যতার সাথে মুড়ির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। হিব্রু তথা হাবিরু, খাবিরু বা বর্তমান ইহুদি জাতি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই যাযাবর ছিল। বিভিন্ন জাতির তাড়া খেয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তখন তারা বহনযোগ্য খাদ্য হিসেবে শুকনো মাংস বা জার্কির (গোমাংস) পাশাপাশি, কিসমিস ও মুড়িকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিত। হিব্রুরা মুড়িকে পিপুজে ওরেজ নামে ডাকত। যুদ্ধবাজ স্পার্টান কিংবা গণতান্ত্রিক গ্রিসেও মুড়িকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বহনযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সহজপাচ্য খাদ্য হিসেবে ধরা হত। তারা মুড়িকে রাইজো সোফিত্তো নামে ডাকত বলে জানা যায়। একইভাবে দক্ষিণ ভারতে ছত্রপতি শিবাজি তাঁর যোদ্ধাদের শুকনো খাবার হিসেবে চাক চাক গুড় এবং মুড়িকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে এখন যে মজাদার মশলা সহ ঝালমুড়ি খেতে দেখি, সেটার ইতিহাসও বেশ পুরোনো। ধারণা করা হয় মোগলাই ডিশগুলোর স্পাইসি টেস্ট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশীয় রন্ধনশিল্পীরা মুড়ির সাথে তেল মশলা মাখিয়ে তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মুচটি, ভুজা, মালারু, ভুজিয়া, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, দক্ষিণ ভারতে মুড়ি স্মরণাতীত কাল থেকে বেশ জনপ্রিয়।

পুরোনো বাংলা সাহিত্যে বালির খোলায় খড়কের কোস্তা দিয়ে গরম গরম মুড়ি ভাজার গল্প পাই। মুড়ির সঙ্গে ধানি লংকা, ঝুনো নারকেল কোরা, তেল মাখানো কাঁঠালবীজ সেঁকা, এলোকেশী বেগুনের বেগুনি, রানি কুমড়োর টাটকা ভাজা ফুলুরি দিয়ে খাওয়া হত। মুড়ি মাখা হত আমতেল অথবা ঘানির সর্ষের তেল দিয়ে। শীতকালে মুড়ির সঙ্গে মুলো চলত। লংকা বেগুনি উনিশ শতকের মাঝের দিকে আসে। তা খেয়ে ঝাল লাগলে শাঁকালু খেয়ে মুখ মিষ্টি করা হত।

মুড়ি এখনও আছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে সেই মুড়ি, যা তৈরি হত 'ডহর কলমা' 'রাজ ঝিভেশাল' ধানে। বাংলার মাটিতে ওই দুই ধানের চালের মুড়ি হত সাদা লম্বা লম্বা। স্বাদেও ছিল অতুলনীয়, যা আজ কল্পনা করা কঠিন। এই মুড়ি ভাজার কাজ বেশ কষ্টসাধ্য। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে মুড়ি ভাজার বর্ণনার একটু অংশ তুলে ধরছি—'খুটে কয়লার উনুনের বারুয়ানি নয়, গোটা গাঁয়ের চারদিক গাছপালা, অনেক কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনা শুকনো ডালপালা, গাছের শুকনো পাতা চেলাকাঠ মজুত থাকে পাশে। তলার দিকে হাঁ-এ নিরন্তর গুঁজে যেতে হয় শুকনো পাতা, গরম বালিতে ফেলতেই যেমন খোলা ভরে ফটফটিয়ে ফুটে উঠছে মুড়ি। চিড়বিড়ানিতে জ্বলছে শরীরটা। একই কুচিকাটি গরম বালি

নাড়ে”। এই মুড়িভাজুনি মাসি-পিসিদের নিয়ে বিশিষ্ট ছড়াকার বিজন দাসের একটি ছড়ায় এদের জীবন কেমন ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়— ‘মিষ্টি নামের চাল ছিল/ তার থেকে সেই মুড়ি/ মুড়ি ভাজানি মাসি-পিসির/ নেইকো তাদের জুড়ি/ ফুটতে মুড়ির পাল/ সেইসব মাসি পিসি/ কোথায় গেল চলে/ আজকে তারা হারিয়ে গেছে/ স্মৃতির অতল তলে...’

আমার ভিনদেশি শিঙাড়া

চায়ের সঙ্গে মাংসের শিঙাড়া দিয়ে খেতেন হেমেন্দ্রকুমারের সুন্দরবাবু। এই অদ্ভুতদর্শন পুরযুক্ত বস্তুটি বাংলায় চায়ের সঙ্গে এমন সংগত করে, যা একমাত্র আল্লারাখা সাহেবের তবলার সঙ্গে পণ্ডিত রবিশংকরের সেতারের তুলনায় আসবে। সন্দেহ করা হয় শিঙাড়ার আগমন কচুরির মতোই কাশীধাম থেকে। রসরাজ অমৃতলাল বসুর লেখা ‘বৌমা’ নাটকের গানে লেখক শিঙাড়ার উল্লেখ দেখান— ‘তপত কচুরি ঘিয়েতে ভাজে/ পুরত সিঙাড়া আলুয়া সাজে/ করব গরম তেয়াগি লাজে/ শাশুড়ি লেয়াও লেয়াও লো।’ আদতে এই খাবার ভারতেরও না। তাজাকিস্তান থেকে সোমালিয়া, কেনিয়া থেকে মাদাগাস্কার, সব জায়গায় এই খাবার সমান জনপ্রিয়। কোথাও এর নাম সামোসা, কোথাও সাম্বোসা, আবার কোথাও বা কামুকা। দশম শতাব্দীর ইরানি ইতিহাসবিদ আবুল ফজল বেহাগি তাঁর ‘তারিখ-ই-বেহাগি’তে প্রথম সামবুসাকের কথা উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের কথা ধরতে গেলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমির খসরু এই মহার্ঘ খাদ্যটিকে সুলতানদের খাবার টেবিলে দেখেন। চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতার বয়ানেও পাওয়া যাচ্ছে সুলতানি খাদ্যসম্ভারে এই সামুসাক বা সামবুসাকের গল্প। তখন কিন্তু এই সামুসাক বা সামোসায় আলুর তরকারি থাকত না। থাকত মাংস বা অন্য কোনও সবজির পুর। আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল বলছেন, এই সাম্বোসাকে নাকি ভারতীয়রা কুতাব নামে ডাকত। শুধু বলেননি, রেসিপিও দিয়েছেন। তাহলে বাংলায় এমন অদ্ভুত নাম কেন? জানা নেই। শুধু একটা কথা জানিয়ে রাখি, শিঙাড়াকে ঠিক যে ফলটির মতো দেখতে অর্থাৎ পানিফল, যার জন্ম নাকি কাশ্মীরের হ্রদগুলিতে, তাকে হিন্দিতেও বলা হয় শিঙাড়া! সুতরাং যারা শিঙাড়াকে নিতান্ত বাঙালি খাবার ভাবছেন, তাঁরা সাবধান। এর নামটাও হিন্দি থেকে এসেছে।

ফাস্ট ফুড

গোড়ার কথা

গ্রামীণ সভ্যতা থেকে মানুষ যখনই নাগরিক সভ্যতার দিকে ঝুঁকল, তার জীবনের গতি গেল বেড়ে। নিজেদের জন্য রান্নার জায়গা বা সময় গেল কমে। ফলে একধরনের মানুষ রাস্তায় রাস্তায় তৈরি খাবার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সেই খাবার খেয়েই অনেকের জীবন চলত। পৃথিবীর প্রথম আধুনিক শহর তৈরি করে রোমানরা। তারাই প্রথম বাড়িকে চওড়ায় বড়ো না করে উচ্চতায় লম্বা বানিয়ে এক-এক তলায় এক-এক পরিবারকে রাখার প্ল্যানটা দেয়। সোজা কথা এই ফ্ল্যাট কালচার, যে যাই বলুক, নতুন তো না-ই, বরং যিশুর জন্মের আগেকার কনসেপ্ট। সেইসব ফ্ল্যাটে রান্নাবান্না করতে গিয়ে আগুন লাগত প্রায়ই। ফলে রান্নাবান্না একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। বেচারারা তাই রাস্তার ফেরিওয়ালাদের থেকে খাবার কিনে খেত। আজকের দিনের অর্থে ফাস্ট ফুড হয়তো ছিল না, কিন্তু সকালে মদে ভেজানো রুটি, দুপুরে বা রাতে সবজি, স্ট্যু পাওয়া যেত দেদার।

মধ্যযুগে ইউরোপে এই ফিরিওয়ালাদের খাওয়ার রমরমা শুরু হয়। বড়ো বড়ো শহরের অনেক বাড়িতে সারাবছর রান্নাই হত না। খাওয়া জোগাতেন এই ফেরিওয়ালারা। এ ছাড়াও শ্রমিক, পথিক, তীর্থযাত্রী, যাঁদের নিজেদের রান্না করার উপায় নেই, তাঁরা নির্ভর করতেন এই খাবারের উপর। এখানে একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি। পথিকরা বা তীর্থযাত্রীরা তখন দল বেঁধে ঘুরতেন। খিদে পেলে একসঙ্গে রুটি ভাগ করে খেতেন। রুটির ল্যাটিন নাম panis আর com মানে একসঙ্গে। তাই যাদের সঙ্গে রুটি ভাগ করে খাওয়া হত, তাদের company বা companion নামে ডাকা শুরু হয়। চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস-এও তীর্থযাত্রীদের নানারকম খাবার (পেঁয়াজের রোস্ট থেকে মিষ্টি) ভাগ করে খাবার কথা আছে।

লন্ডনের হকাররা

পঞ্চদশ শতকে জন লিডগেট নামে এক সাধু 'London Lickpenny' নামে এক মজার কবিতা লেখেন। তাতে তিনি ছবির মতন লন্ডনের ফেরিওয়ালাদের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কবিতা থেকেই জানতে পাই লন্ডনের ফেরিওয়ালারা কেমন করে গরম গরম ভেড়ার পা, ঝিনুক থেকে শুরু করে মাংসের রোস্ট, পাই, গরম গরম চেস্টনাট, ক্রিম চিজ, পেঁয়াজকলি, আপেলের টুকরি, মোটা মোটা হাঁস, দুধ, মিষ্টি চেরি, নরম মুলো বেচত। একটু উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

"Hot peascods!" one began to cry,

"Strawberr saffron y ripe!" and "Cherries in the rise!"

One bade me come near and buy some spice,

Pepper and they gan me bede,

But for lack of Money I might not speed.

বিভিন্ন ফেরিওয়ালার চিৎকারে লন্ডনের রাস্তায় কান পাতা দায় হত। ১৭০০ সালের মাঝামাঝি ছাপা 'Cries of London' বইটা এই বিষয়ে এক অসামান্য আকর গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন ফেরিওয়ালা আর তাদের ছবি প্রায় নিখুঁত কাঠখোদাইতে ছাপা হয়েছে। শুধু ইংল্যান্ড না, আলেকজান্দার দুমা লিখছেন, সেই ১৩ শতকে পারির ফেরিওয়ালারা ঠিক রাতে খাবার

আগে ভালো ভিনিগার, কাসুন্দি, গার্লিক সস, স্ক্যালিয়ন সস বলে চিৎকার করত, আর বাড়ির গিন্নিরাও মাংসের সঙ্গে মেখে খাবার জন্য পছন্দসই সস কিনতেন।

সেকালের বাঙালি কি বাইরের খাবার খেত না? রসরাজ অমৃতলালের লেখায় পাই, বাদুরবাগানের 'চাই পা-ও-ও-রুটি বিস্কুট, ঝা-য়া-ল বিস্কুট' আসত সকালের দিকে। তার গলায় ঝুলত পইতের গোছা। বাড়িতে চায়ের চল ছিল না। রোগীকে এই পাউরুটি দেওয়া হত। আর আসত 'মুড়ির চাক, ছোলার চাক, চিঁড়ের চাক।' শীতে কাকডাকা ভোরে আসত 'চাই খেজুর রস।' রাস্তার ধারে তেলেভাজা আর কলাইয়ের ডালের বড়ার দোকান ছিল। বড়ার ওপরটা ছিল শক্ত, কিন্তু ভিতরটা মাখনের মতন। ফিরিওয়ালারা ফিরি করতেন সাড়ে বত্রিশ ভাজা, অবাক জলপান, চটপটি আলু কচালু, নকুলদানা, ঘুগনি দানা আর মনোমোহিনী চপ। সে চপ আবার বিক্রি হত গান গেয়ে গেয়ে—

মাছ মাংস ডিম্ব ছাড়া

শুদ্ধভাবে তৈরি করা

মনোমোহিনী চপ।

আলুর মধ্যে এঁচোড় বা মোচার পুর আর পোস্তদানা দিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজা এক পয়সায় এই চপকে ছেলেরা বলত 'মুড়মুড়ে চপ।' সাড়ে বত্রিশ ভাজা নিয়ে স্বয়ং অমৃতলালকেই স্মরণ করা যাক। তাঁর পুরাতন পঞ্জিকায় লিখেছেন, 'আজ বছর ৩০/৩৫ আগে কলকাতার একটা ফিরিওয়ালা সাড়ে আঠার ভাজার ওপর সুর চড়াতে গিয়ে সাড়ে বত্রিশ ভাজা হেঁকে বেরুতে আরম্ভ করলে। দেখাদেখি আরও দু-চারজন বেরুল— আঃ রাম রাম! সে একেবারে হাটখোলার ধুলো ঝাঁট দেওয়া হাঁটকা, মুখে বালি কাঁকড় যা ইচ্ছে তাই ঢুকে গেল, শেষে অতকালের সখের 'সখের জলপান'টা উঠে গিয়ে এলেন কিনা পাঁটার (কি না কুকুরের নাড়ী সিদ্ধর) ঘুঘনি দানা আর অবাক জলপান।' সাড়ে বত্রিশ ভাজার সাড়েটা ছিল আধখানা শুকনো (মতান্তরে কাঁচা) লংকা। আর অবাক জলপানে থাকত ছোলা ভাজা, চালভাজা, লংকার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, তেল, নুন আর একটু লেবুর রস। রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত বই বাঙালিয়ানাতে আরও কিছু ফেরিওয়ালার কথা বলেছেন, 'চাই মুংগ কি ডাল', 'হাঁসের ডিম চাই গো', 'মালসি দই চাই গো', 'জারক লেবু, বেল মোরব্বা, হজমি গোলী, আম্বাচার, টোপাকুল, কাসুন্দি', 'মণ্ডা-মেঠাই', 'রুটি, বিস্কুট, নানখাট্টাই, গোলাপি রেউড়ি চাই', 'চাই নারকেল দানা আর চানাচুর গরমাগরম।' এই হাঁসের ডিম হিন্দু বাঙালির কত প্রিয় ছিল তা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় জানা যায়—

ঘৃণায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ডিম।
মরুক সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম।।
বৃথাই রসনা তার বৃথা তার মুখ।
কোনকালে নাহি পায় আহারের সুখ।।

দুপুরের রোদ গড়াতে না গড়াতেই হাজির হত নানান রকম খাওয়ার জিনিস নিয়ে ফেরিয়ালারা। যেমন বিচিত্র ছিল সেসব মানুষেরা, তেমনি বিচিত্র ছিল তাদের খরিদ্দার ডাকার আওয়াজ। 'ঘুগনি-আলুরদম', হেঁকে একজন আসত বিকেলের দিকে। বড়ো বিস্কুটের খালি টিনের গায়ে আংটা লাগিয়ে তাতে কাপড় বেঁধে গলায় ঝোলানো। সেই টিনের মধ্যে আবার দুটো আলাদা খালি ডালডার কৌটোয় থাকত ঘুগনি আর আলুর দম। শালপাতার টুকরোয় মুড়ে বিক্রি করত সেই সুস্বাদু খাবার। ওইরকম ভাবেই গলায় বড়ো বিস্কুটের খালি টিনে মুড়ি আর তার গা ঘিরে লাগানো অনেকগুলো ছোটো কৌটোয় মশলা নিয়ে একজন বিক্রি করতে আসত ঝালমুড়ি। মাথায় বিরাট ভরা থালা আর কাঁধে বাঁশের স্ট্যান্ড নিয়ে ফেরিওয়ালা আসত আলুকাবলি ও ফুচকা বেচতে। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছোটোবেলার কথা 'যখন ছোটো ছিলাম'-এ বলেছেন, "সপ্তাহে দু'দিন না তিনদিন যেত মিসেস উডের বাক্সওয়ালা। বারান্দা থেকে মা মাসি ডাক দিতেন, 'এই বাক্সওয়ালা, এখানে এস।' মনটা নেচে উঠত, কারণ বিকেলের খাওয়াটা জমবে ভাল; বাক্সে আছে মেমসাহেবের তৈরি কেক, পেস্ট্রি, প্যাটি।" এসব পথে পথে ঘুরে বিক্রি হওয়া মুখরোচক খাবার দিয়ে দিব্যি বিকেলের জলখাবারটা সেরে ফেলা যেত। মোড়ে মোড়ে তখন ছিল তেলেভাজার দোকান। বড়ো লোহার কড়াইয়ে ভাজা হত আলুর চপ, বেগুনি, ফুলুরি আর পেঁয়াজি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বাগবাজারের মোড়ে এক তেলেভাজার দোকান ছোটো ছোটো গোল গুলির মতো ভেজিটেবল চপ বানিয়ে তার নাম দিয়েছিল লড়াইয়ের চপ। আর বিধান সরণিতে রংমহল থিয়েটারের উলটোদিকে 'নেতাজির তেলেভাজা' বলে একটা দোকান ছিল। তেইশে জানুয়ারি, নেতাজির জন্মদিনে বিনি পয়সায় তারা তেলেভাজা বিলি করত। এখন অবশ্য ফিরিওয়ালাদের জায়গা নিয়েছে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং আর টিভির জিঙ্গল। মাইক্রোওভেনে ঢোকালেই চোখের নিমেষে রান্না হয়ে যাচ্ছে ফাস্ট ফুড।

ম্যাকডোনাল্ড-বার্গারের বিশ্বজয়

ফাস্ট ফুডের জন্ম যেখানেই হোক না কেন, আধুনিক ফাস্ট ফুডের জনক (নাকি জাঙ্ক বলব?) আমেরিকাই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯১২ সালের ৭ জুলাই নিউ ইয়র্কে অটোম্যাট নামে পৃথিবীর প্রথম ফাস্ট ফুড জয়েন্ট খোলা হয়। এতে কাচের আলমারিতে থরে থরে খাবার সাজানো থাকত, সঙ্গে দাম লেখা। ক্রেতাকে নির্দিষ্ট মূল্যের কয়েন ফেলতে হত। তবেই স্লট বেয়ে নেমে আসত তাঁর পছন্দের ফাস্ট ফুড। এই অটোম্যাটের আবিষ্কার করেছিলেন জোসেফ হর্ন আর ফ্রাঙ্ক হার্ডার্ট নামের দুই তরুণ। ১৯০২ সালে ফিলাডেলফিয়াতে তাঁরা একবার অটোম্যাট চালু করতে গেছিলেন। সফল হননি। কিন্তু নিউ ইয়র্কে এই অটোম্যাট রাতারাতি হিট হয়ে যায়। ব্রডওয়েতে অটোম্যাটের সামনে লম্বা লাইন পড়ত। সে লাইন এমনই যে লাইনে না দাঁড়িয়ে সাধারণ রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার খেলে কম সময় লাগত। কিন্তু সে কথা আর হুজুগে মার্কিনদের কে বোঝাবে? গোটা আমেরিকা জুড়ে গড়ে উঠল ব্যাঙের ছাতার মতো অটোম্যাট রেস্টুরেন্ট।

ম্যাকডোনাল্ডের সামনে রে ক্রক

১৯৪০ সালে নিউ হ্যাম্পশায়ারের দুই ভাই রিচার্ড আর মরিস ম্যাকডোনাল্ড ক্যালিফোর্নিয়ায় বারবিকিউ ড্রাইভ ইন রেস্টুরেন্ট খোলেন। ড্রাইভ ইন রেস্টুরেন্ট মানে ক্রেতাকে গাড়ি থেকে নামতে হবে না। গাড়ি চেপে এক জানালায় অর্ডার দেবে, আর অন্য জানালায় খাবার সার্ভ করা হবে। সেই খাবার নিয়ে 'তারপর যাও যেথায় খুশি জ্বালিও নাকো মোরে! ' ততদিনে আমেরিকায় টেক অ্যাওয়ে ফুডের রমরমা। 'Less work for mother' বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে চারদিক। ম্যাকডোনাল্ড ভাইয়েরা কিছুদিন বাদেই বুঝলেন একগাদা খাওয়াদাওয়ার মেনু থাকলে খাবার দিতে দেরি হবে। ব্যাপারটা আরও দ্রুত করার জন্য ১৯৪৮ সালে তিন মাসের জন্য ম্যাকডোনাল্ডস বন্ধ রাখলেন তাঁরা। তিন মাস পর সবকিছু সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজালেন। তাঁরা দেখলেন, খাবারের মেনুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় হ্যামবার্গার। ফলে খাবারের আইটেম রাতারাতি ২৫ থেকে ৯-এ নামিয়ে আনলেন। রাখলেন

শুধু হ্যামবার্গার, চিজবার্গার, কোকা কোলা, দুধ, কফি, আলুর চিপস এবং পাই। পরবর্তীতে আলুর চিপসের জায়গায় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়ে আসা হয়। খাবার বিক্রির ধরনেও নিয়ে আসা হয় নতুনত্ব। চালু করা হয় ‘সেলফ সার্ভিস’ সিস্টেম। এখানে ক্রেতারা খাবার কেনার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াতেন, তারপর তাঁদের কাগজের প্যাকেটে মুড়ে খাবারগুলো দেওয়া হত। বার্গারের দামও রাখা হয় মাত্র ১৫ সেন্ট। দোকানের চেহারাতে নিয়ে আসা হয় আভিজাত্যের ছাপ। স্ট্যানলি ক্লার্ক মেস্টনকে দেওয়া হয় ডিজাইনের দায়িত্ব। দোকানের ছাদে সোনালি রঙের বলয় দেওয়া হয়, যা এর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে। দারুণ এক পারিবারিক বিনোদনের জায়গা হয়ে ওঠে ম্যাকডোনাল্ডস। তবে তারপরেও ম্যাকডোনাল্ডস আজকের ব্র্যান্ড ভ্যালু পেত না, যদি না ১৯৫৪-তে রে ক্রক নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁদের নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতেন। তবে সেই গল্প বলার আগে একটা ছোট্ট ডি-ট্যুর করে দুটো অন্য গল্প বলে ফেলি।

১৯৬১ সালে ম্যাকডোনাল্ডের বিজ্ঞাপন

আমেরিকায় প্রতি বছর ১৪ বিলিয়ন হ্যামবার্গার খাওয়া হয়। শুধু এই বেচেই ম্যাকডোনাল্ড কোটি কোটি ডলার কামাচ্ছে। কিন্তু এর শুরু খুব সাধারণ ভাবে। ১৮৮৫ সালে উইসকনসিনের ছোট্ট গ্রাম সিম্যুরে প্রথমবারের জন্য এক বিশাল মেলা হচ্ছিল (এখনও সেই মেলা ধুমধাম করে চলছে)। সেই মেলাতে চার্লস নাগ্রিন নামে এক বছর পনেরোর কিশোর খাবার দোকান দিয়ে বসেছিল। সে মিটবলের দোকান দিলেও বিক্রিবাটা হচ্ছিল না একেবারেই। নেগ্রিনের মাথায় প্ল্যান এল। মিটবলগুলোকে চ্যাপটা করে পাউরুটির মধ্যে পুরে সে হ্যামবার্গার নামে বেচতে লাগল। প্রশ্ন আসবেই, এত নাম থাকতে হ্যামবার্গার কেন? চেঙ্গিস খান ১৩০০ সালের শুরুর দিকে ইউরোপ আক্রমণ করলে মোঙ্গলদের কিছু খাওয়াদাওয়াও ইউরোপের মেনুতে ঢুকে যায়। গোটা ইউরোপ নুন মাখানো মাংসের ফালি মনের সুখে খেতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানির হ্যামবার্গ থেকে আমেরিকায়

জাহাজ চলাচল শুরু হয়। যাত্রীরা তাঁদের সঙ্গে এই মাংসের ফালি নিয়ে এলে মার্কিনরাও এই খাওয়া শিখে ফ্যালে। গোটা আমেরিকায় হ্যামবার্গার স্টেক দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নাগ্রিন এই জনপ্রিয় নামটাকেই ব্যবহার করেছিলেন এই যা। বেঁচে থাকতেই নাগ্রিন হ্যামবার্গার বিক্রি করে বেশ দু পয়সা কামিয়ে নেন। ততদিনে আমেরিকা জুড়ে হ্যামবার্গার ছড়িয়ে গেছে। এই হ্যামবার্গারই মুখে মুখে ছোটো হয়ে বার্গার নাম নিয়েছে।

রে ক্রক ছিলেন ইলিনয়ের বাসিন্দা। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মাত্র ১৫ বছর বয়সে রেড ক্রসের অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার হিসেবে কাজ করেন। যুদ্ধের পর তিনি পিয়ানোবাদক, মিউজিক ডিরেক্টর, সেলসম্যান ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার কাজ করছিলেন, কিন্তু সাফল্য পাননি। এসময় আর্ল প্রিন্স নামে এক আইসক্রিমের দোকান মালিকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। প্রিন্স একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যেটা একইসঙ্গে পাঁচরকম মিল্কশেক তৈরি করতে পারত। এর নাম ছিল 'মাল্টিমিক্সার।' ক্রক তাঁর চাকরি ছেড়ে গোটা আমেরিকা জুড়ে এই মাল্টিমিক্সার বিক্রি বাড়ানোর জন্য সেলসম্যানের কাজ শুরু করেন। এমন সময় ম্যাকডোনাল্ডস থেকে তিনি ডাক পান মাল্টিমিক্সার বিক্রির জন্য। রে ক্রক মাল্টিমিক্সারের মেশিন খুব একটা বিক্রি করতে পারছিলেন না। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডস থেকে তিনি একসঙ্গে আটটি মেশিনের অর্ডার পান। ক্রক অবাক। ভাবেন, একটি রেস্টুরেন্ট কতটা লাভজনক হলে এতগুলো মেশিন অর্ডার করতে পারে! তাই তিনি মেশিন নিয়ে যখন যান, তখন মূলত দুই ভাইয়ের ব্যবসার অবস্থা বোঝার জন্যই গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন, ম্যাকডোনাল্ডস ভাইয়েরা এই ব্যবসার বিপুল সম্ভাবনার কথা বুঝতেই পারছিলেন না। ক্রক চাইলেন ম্যাকডোনাল্ডসকে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পরিণত করে সমগ্র আমেরিকায় ছড়িয়ে দিতে। ভাইদের প্রস্তাব দিলেন, তিনি ম্যাকডোনাল্ডসের হয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন। মূল শাখার মতো অন্যান্যগুলো ভালো চলছিল না। তাই দুই সহোদর রে ক্রককে সেই সুযোগ দিলেন। দায়িত্ব নিয়েই ক্রক তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা শুরু করলেন। ১৯৫৫ সালে তাঁর প্রথম ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্ট চালু হয় ইলিনয়ের ডেস প্লেইনসে। ১৯৫৯ সালের মধ্যে ক্রক ১০০তম রেস্টুরেন্টটিও খুলে ফেলেন। কিন্তু তাতেও খুব বেশি লাভ হচ্ছিল না। কারণ ম্যাকডোনাল্ডস ভাইয়েরা মূলত তাঁদের মূল শাখাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। বাকিগুলো সব তাঁকে একাই দেখতে হত। এদিকে সবগুলোর লভ্যাংশের ভাগ দুই ভাইকে দিতে হত। ১৯৬১ সালে ক্রক ২.৭ মিলিয়ন ডলার দিয়ে দুই ভাইয়ের কাছ থেকে ম্যাকডোনাল্ডস কিনে নেন। এরপর তাঁকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

১৯৬৮ সালের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ডসের শাখার সংখ্যা ১,০০০ ছাড়িয়ে যায়। এসময় দেশ

ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে ম্যাকডোনাল্ডস। ১৯৬৭ সালে প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে ক্রক কানাডায় শাখা চালু করেন এই ব্র্যান্ডের। ম্যাকডোনাল্ডসকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে রে ক্রক ১৯৭৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৪ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ক্রক। বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে ১০০টিরও বেশি দেশে ম্যাকডোনাল্ডসের ৩৭,২৪১টি শাখা আছে। শেষে একটাই কথা জানাই, সব ম্যাকডোনাল্ডে মেনু মোটামুটি এক হলেও একমাত্র মালয়েশিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডসে ঝোল-ভাত পর্যন্ত পাওয়া যায়। গেলে মিস করবেন না।

গরম কুকুরের কথা

ব্যাটম্যান আর রবিনের একটা কমিক সে প্রথম ওঁদের হটডগ খেতে দেখেছিলাম। শুরুতেই নামটা কেমন বেয়াক্কেলে লেগেছিল। খাবারের নামে কুকুর আসে ক্যামনে? বেশ কিছুদিন বাদে যখন মিও আমোরে আর মনজিনিসের দোকানে সাজানো চিকেন হটডগ দেখেছি, তখন জানলাম এ জিনিস মুরগি দিয়েও হয়। কুকুর নিধনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্নটা রয়েই গেল। রুটির মধ্যে সসেজ ভরা আমেরিকার এই 'জাতীয়' খাদ্যর সঙ্গে কুকুরের (তাও গরম) সম্পর্ক কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে সোজা চলে গেলাম মধ্যযুগের জার্মানিতে। সসেজ রান্নায় চিরকালই জার্মানি সেরা। ১৫৬৪ সালে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় ম্যাক্সমিলানের সময়কালে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে বেশ মোটাসোটা কোলবালিশের মতো একধরনের সসেজ তৈরি হত। এর নাম ছিল ফ্রাঙ্কফুর্টার। উনিশ শতকের শুরু শুরুতে জার্মান কশাই জন গ্রেগ লেহনার তাঁর দোকানে নতুন রেসিপিতে ফ্রাঙ্কফুর্টার বেচতে থাকেন। দেখতে একেবারে চকচকে, বাদামি আর রসালো। কে একজন দেখেই বলল, 'আরে! এ তো অনেকটা সেই ডাশহুন্ড কুকুরের মতো দেখতে!' ব্যস! আর যায় কোথায়? ফ্রাঙ্কফুর্টারের সঙ্গে ডাশহুন্ডের নাম এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে লোকের মুখে মুখে এই কুকুরকে 'সসেজ কুকুর' নামে ডাকা হত।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে হাজার হাজার জার্মান উদ্বাস্তুরা আমেরিকায় আসা শুরু করলে তারা তাদের প্রিয় ফ্রাঙ্কফুর্টারকেও আমেরিকায় নিয়ে আসে। মোড়ে মোড়ে সসেজের স্টল আর তাতে বিক্রি হত গরম ধোঁয়া ওঠা সসেজ। মুশকিল একটাই। মার্কিন দেশে লোকের সময় কম। দাঁড়িয়ে খাবার উপায় নেই। এদিকে চলতে চলতে খেতে গেলে হাত পুড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই জার্মান দোকানিরা সেই গরম সসেজ একটুকরো বানরুটির মধ্যে পুরে দিত।

এভাবেই চলছিল। ১৯০১ সালের ঘটনা। নিউ ইয়র্ক ইয়াঙ্কিস আর জায়ান্টস দলের মধ্যে বেসবল খেলা চলছে। সেদিন কনকনে ঠান্ডা আর মাঠের বাইরে স্টল খুলে বসে হ্যারি স্টিভেন্স নামে এক দোকানি চেঁচাচ্ছিলেন, 'They are red hot. Get your dachshund sausages while they are red hot.' তা শুনে কার্টুনিস্ট টি এ গর্ডনের বেশ মজা লাগল। পরদিন পত্রিকায় দারুণ একটা কার্টুন আঁকলেন তিনি। লম্বা একটা বানরুটি থেকে একটা কুকুর ল্যাজ বার করে আছে। শুধু হট ডাশহুন্ড নামটা না দিয়ে নাম দিলেন 'হট ডগ।' প্রথমদিকে এই নাম অতটা জনপ্রিয় হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগতেই আমেরিকানরা জার্মান নামের সবকিছু বদলে দিতে শুরু করলেন। ফলে ফ্রাঙ্কফুর্টার চিরদিনের মতো হটডগ নাম পেয়ে আমেরিকার খাদ্য সংস্কৃতির আইকনে পরিণত হল।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই

আমেরিকার এক প্রিয় খাদ্য যদি জার্মানি থেকে এসে থাকে, অন্য প্রিয় সাইড ডিশ 'ফ্রেঞ্চ ফ্রাই' এসেছে বেলজিয়াম থেকে। হ্যাঁ, ফেঞ্চ ফ্রাই আদৌ ফ্রান্সের কুইজিন না। তবে হট ডগে আমেরিকার যেমন কোনও ভূমিকাই নেই, এখানে তেমন না। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরির উপাদান যে আলু, তা প্রথম আমেরিকা থেকেই স্প্যানিশরা ইউরোপে নিয়ে যায়। এই পর্যন্তই। তবে টমেটোর মতো আলুকেও প্রথম প্রথম ওষুধ হিসেবে অল্প অল্প গুলি বানিয়ে খাওয়ানো হত। ১৬৮০ সালে লিজের কাছে মিউস উপত্যকার বেলজিয়ানরা প্রথম আলুর চোকলা ছুলে তাকে লম্বা লম্বা করে কেটে তেলে ভেজে খাওয়া শুরু করেন। নাম দেন pommes frites। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসে বিশ শতকের মাঝামাঝি আর আমেরিকার ঘর ঘরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাবার চল শুরু হয়। এখানেই একটা প্রশ্ন আসতে বাধ্য। রান্না করল বেলজিয়ানরা আর নাম হল ফ্রেঞ্চদের। কেন? আসলে এই নাম দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেলজিয়ামে পোস্টিং হওয়া মার্কিন সৈন্যরা। সেখানে রাস্তায় রাস্তায় আলু ভাজার দোকান। মেয়োনিজে ডুবিয়ে আলুভাজা খেতে খেতে সৈন্যরা ভাবলেন এরা যেহেতু ফরাসি ভাষায় কথা বলে, নির্ঘাত এরা ফরাসি। তাই নাম রাখলেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই।

অন্য একটা গল্পও আছে অবশ্য। তাতে এই নামের উৎস আরও প্রাচীন। ১৮০১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার পর টমাস জেফারসন নাকি অঁরে জুলিয়েন নামে এক ফরাসি শেফকে তাঁর রান্নাঘরের দায়িত্ব দেন। এই ভদ্রলোকই প্রথম আলু ফালি ফালি করে কেটে ডিপ ফ্রাই করে প্রেসিডেন্টকে খাইয়ে তাঁকে খুশি করে দেন। প্রেসিডেন্টও এই আলুভাজার নাম রাখেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ম্যাকডোনাল্ডসে এককালে শুধু টমেটো কেচাপ দিয়ে দিত। ইদানীং দেখছি ইউরোপীয় কায়দায় মেয়োনিজও দিচ্ছে।

ফিস অ্যান্ড চিপস

আমেরিকার জাতীয় খাবার যদি হট ডগ হয়, তবে ইংল্যান্ডে সেই সম্মান অবশ্যই 'ফিস অ্যান্ড চিপস'-এর প্রাপ্য। প্রভু যিশুকে শুক্রবার ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তাই ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানরা শুক্রবার মাংস খেতেন না। এখনও অনেকে খান না (যেমন হিন্দুরা অনেকে শনি, মঙ্গল বা বৃহস্পতিবার নিরামিষ খান)। কিন্তু ষোড়শ শতক অবধি ব্যাপারটা নিয়ে বেজার বাড়াবাড়ি ছিল। কেউ যদি ভুল করে বা লোভের বশে শুক্রবার মাংস খেয়েও ফেলত তবে

তার প্রাণদণ্ড অবধি হতে পারত। তাই আমিষপ্রেমীরা শুক্রবার মুড অফ করে ঘুরতেন, আর সেই থেকেই ইংরাজিতে 'Friday faced' শব্দটা এসেছে। বুদ্ধিমান ইংরেজরা একটা উপায় বার করল। আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও আছে। মাংস খেতে মানা, কিন্তু মাছের মাংস খেতে (মানে মাছ খেতে) তো শাস্ত্রমতে বাধা নেই। তাই শুক্রবার হয়ে গেল ইংরেজদের মাছ খাবার দিন। লম্বা লম্বা চারাপোনাকে বেসনে ডুবিয়ে ডিপ ফ্রাই করে খাওয়ার রেওয়াজ ইংল্যান্ডে প্রথম চালু করেন ইহুদি অনুপ্রবেশকারীরা। লন্ডনের ইস্ট এন্ডে তাঁদের আস্তানার কথা ডিকেন্সের অলিভার টুইস্টেও পাই। তবে চিপসে গোল গোল করে আলু ভাজার রেওয়াজ ছিল। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো লম্বা করে না। এর আগে অবশ্য আলুকে বেক করেই খেতে শিখেছিল ইংরেজরা। ইংল্যান্ডে প্রথম ফিস অ্যান্ড চিপস শপ খোলেন জোসেফ মালিন নামের এক ইহুদি। ১৮৬০ সালে ইস্ট এন্ডে খোলা এই দোকান ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম ফিস অ্যান্ড চিপসের দোকান। শিল্পবিপ্লব শুরু হলে শ্রমিকদের সস্তায় পুষ্টিকর খাওয়ার দোকান ছিল এরা। ১৯২৫ নাগাদ গোটা ইংল্যান্ডে ৩৫০০০-এর বেশি ফিস অ্যান্ড চিপসের দোকান খুলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার সব খাবারে রেশনিং চালু করলেও ফিস অ্যান্ড চিপস-কে এর বাইরে রেখেছিলেন, এতটাই ছিল এর চাহিদা।

কাবাব কাহিনি

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম খাবারের একটা অবশ্যই মাংস পোড়া। আদিম মানুষ আগুন আবিষ্কারের পরেই মাংসকে কাঁচা না খেয়ে আগুনে ঝলসে নিতে শিখেছিল। হোমারের ইলিয়াডেও মাংস ছোটো ছোটো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে খাবার কথা আছে। গ্রিকরা এদের বলতেন ওবেলিস্কস। কিন্তু মাংসকে রোস্ট করে, টোস্ট করে খাবার কথা জানা থাকলেও গ্রিল করে মাংস খাওয়া ইউরোপকে শিখিয়েছিল তুর্কিরা। ইউরোপে ঠান্ডা বেশি পড়ে। তাই গোটা মাংস সংরক্ষণের সুবিধে। কিন্তু সেই তুলনায় এশিয়ায় গরম বেশি। তাই মাংসকে তারা কেটে নিত ছোটো ছোটো টুকরোতে। এ ছাড়াও ইউরোপে কাঠ বা গাছের যে প্রাচুর্য, তুর্কি বা এশিয়ার মরু-পর্বতে সেই সুযোগ নেই। কম আগুনে মাংস ঝলসাতে তাই উপায় একটাই। ছোটো ছোটো করে মাংস কেটে তলোয়ারে গেঁথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝলসানো; আর সেটাই তারা করত। কাবাব শব্দটা এসেছে আরবি কাবাব্বা থেকে, যার মানে ভাজা মাংস (গ্রিল করা নয় কিন্তু)। আরবে গ্রিল করা মাংসকে বলা হত শিওয়া। আর অনেকের মতে এই দুই শব্দ মিলেমিশে শিশ কাবাব বা শিক কাবাব নাম নিয়েছে (এর সঙ্গে লোহার শিকের কোনও সম্পর্ক

নেই)। এখানে মাংসকে নরম করতে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা হয়। ফলে কাবাব অনেক সুস্বাদু, রসালো আর মুখে দিলে গলে যায় টাইপ হয়ে যায়। নীলাঞ্জন হাজরা তাঁর কাবাব কিসসা-য় লিখছেন, 'এইখানে আমরা ফের খুলব গিল মার্কস-এর Encyclopedia of Jewish Food। কিন্তু সে বই তো ওমর খৈয়ামের ঘাড়ে কাবাব চাপিয়ে একটা বিশ্রী গোলমাল পাকিয়েছিল। ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে গোটা বইটাই ভুল। হ্যাঁ, সেখান থেকে যা তথ্য পরিবেশন করব, তাকে পরখ করে করতে হবে। এই বিশ্বকোষ আমাদের কাবাব বিষয়ে কী বলছে? অনেক কিছু।

১। কাবাব, কেবাব, ক্যাবব, কেবাপ— এ সব শব্দই এসেছে 'আরমিয়হ্' বা Aramaic ভাষা থেকে। কী সে ভাষা? খুব সংক্ষেপে পশ্চিম এশিয়ায় যে ভাষা চলে— হিব্রু, আরবি বা সিরিয়, তার ঠাকুদ্দা। ইয়োনা সাবার (Yona Sabar) তাঁর A Jewish Neo-Aramaic Dictionary (Harrasswitz Verlag. Wiebaden. 2002)-তে জানাচ্ছেন সে ভাষায় Kababu : to roast, roasting। Kababa : One Kebab, ground meat broiled on skewer। আর Kababi : Seller of Kebab। মোদ্দা কাবাব মানে মাংসের কিমা শিকে লাগিয়ে তাকে ঝলসানো। ভালো কথা, কাবাব কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ। আর কাবাবি— পুং!

প্রাচীন লখনৌতে কাবাব তৈরি

২। ১২২৬ সালে মহম্মদ ইবন অল-হাসান অল-বাগদাদি-র লেখা বই 'কিতাব অল তবিখ' (খাবারের বই), যা আসলে দশম শতকের পারস্যের নানা পদের বিবরণ, তাতে যে 'কাবাব'-এর কথা বলা হচ্ছে, তার মানে meatballs। মাংসের মুইঠ্যা। এই বইয়ে যে তিন রকমের কাবাবের কথা আছে, তার একটিও ঝলসানো নয়— শাক দিয়ে, কমলালেবু দিয়ে আর 'ভেরজুস' দিয়ে? কী এই 'ভেরজুস'? কথাটা এসেছে ফরাসি 'ভের্ত' থেকে, মানে সবুজ।

তবে সবুজ মানে এখানে রং নয়, কাঁচা। কাঁচা আঙুর ও অন্যান্য নানা ফল দিয়ে মধ্যযুগে এই 'ভেরজুস' তৈরি হত খানাদানায়, বিশেষ করে মাংসের রান্নায় একটা ধারালো টকসা ভাব আনতে।

দু-তিনটে চেনা কাবাবের গল্প এই ফাঁকে বলে ফেলি। পার্ক স্ট্রিটের পিটার ক্যাটে খেতে গেলে নিশ্চিত আপনি চেলো কাবাব খাবেন। এই চেলো মানে সিদ্ধ ফেন ঝরানো ভাত। ঠিক এখানে পিনাকী ভট্টাচার্যের স্মরণ নিলাম। আনন্দবাজারে প্রকাশিত তাঁর কলামে তিনি লিখেছেন, "চেলোর সঙ্গের কাবাবটা এসেছিল প্রতিবেশী ককেশীয়দের কাবাব কুবিদেহ্ থেকে। কথিত আছে কাজার সাম্রাজ্যের নবাব নাসির-আল-দিন শাহ প্রায় শুক্রবার 'সপরিবারে', মানে তিনি, তাঁর চার স্ত্রী, ৮৭ উপপত্নী, ২০০ ক্রীতদাসী ছাড়াও ভৃত্যের দল, সব মিলিয়ে প্রায় হাজারখানেক লোক নিয়ে হজরত আব্দুল আজিমের দরগায় যেতেন। বিবিসাহেবারা ওখানকার কুবিদেহ্ খেতে পছন্দ করতেন বলে বাদশা স্থানীয় ককেশীয়দের কাছ থেকে এক বিশেষ কুবিদেহ্ বানানোর কৌশল আদায় করেছিলেন আর সেই কৌশলে প্রথম আজকের চেলো কাবাব তৈরি হয়।

কাকোরি কাবাবের নাম এসেছে লখনউয়ের পাশে এক ছোট্ট শহরতলি কাকোরি থেকে। সেখানে হজরত শাহ আবি আহদের দরগায় মাথা ঠেকাতে আসা লক্ষ ভক্তদের খাওয়ানোর জন্যে স্থানীয় পাচকরা এক 'তবাররুখ পরশাদ' বানায় যা পরে কাকোরি কাবাব হয়ে দাঁড়ায়।

গলৌতি কাবাব বানানো হয়েছিল বর্ষীয়ান নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্-র জন্যে। প্রথমে রাজ্য, তারপর দাঁত, একের পর এক প্রিয় জিনিস হারিয়ে নবাব শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। মাংসের প্রতি তাঁর ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। কচি পেঁপের ক্বাথ, কিছু নির্দিষ্ট শেকড় আর মশলা মিহি করে বেটে মাংসে মাখিয়ে তাকে নরম করে গাওয়া ঘিয়ে ভেজে 'গলৌতি' কাবাব প্রথম তৈরি হয়। যার অর্থ 'মুখে গলে যাওয়া।'

তুন্ডা কাবাবও তৈরি হয়েছিল এক কাবাব-প্রেমিক দন্তহীন নবাবের জন্যে, যিনি ঘোষণা করেন, যে তাঁকে সবচেয়ে নরম মাংস খাওয়াতে পারবে, পুরস্কার পাবে ।

এক-হাতহীন হাজি মুরাদ আলি, যিনি তুন্ডা মিয়া নামে খ্যাত ছিলেন (তুন্ডা-র অর্থ নুলো), এই বাজি জেতেন। এই কাবাব বানাতে তুন্ডা মিয়া ১৬০ রকমের শেকড় আর মশলা নাকি ব্যবহার করেন, যার মধ্যে চন্দন কাঠও ছিল। তাঁর নামেই এই কাবাবের নাম তুন্ডা কাবাব। এই কাবাবের উপকরণ আজও গোপনীয়, শুধু তুন্ডা মিয়ার পরিবারের মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।"

কাবাবের কথায় বারবিকিউ আসবেই। অনেকে বলেন শব্দটা এসেছে ফরাসি বার্ব-আ-কিউ থেকে, মানে দাড়ি থেকে ল্যাজ অবধি। একদম ভুল কথা। বারবিকিউ এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আদিবাসীদের মাংস পোড়ানোর একটা জালি জালি কাঠামোর নাম থেকে। স্প্যানিশরা ওই দেশ আক্রমণ করলে মাংস গ্রিলের এক পদ্ধতি তাঁদের খাসা লাগে। ওই কাঠামো নিজেদের দেশে এনে গ্রিল করা শুরু করেন। নাম দেন বারবাকোয়া। সেখান থেকেই বারবিকিউ এসেছে।

ইতালিয়ান আর চিনা খাবার

পাস্তার উৎস সন্ধানে

বেশিরভাগ খাবারের ইতিহাস বইতে পরিষ্কার লেখা আছে, মার্কো পোলো ১২৯৫ সালে কুবলাই খানের দরবার থেকে ইতালিতে ফিরলে তিনিই সঙ্গে করে পাস্তা নিয়ে ফেরেন। একেবারে ভুল কথা। ইতালীয়রা তার অনেক আগে থেকেই পাস্তা খেয়ে অভ্যস্ত। ১২৭৯ সালে পঞ্জিও বাস্তোনে নামের এক মৃত ইতালীয়র ছেড়ে যাওয়া সম্পদের তালিকায় আরও অনেক জিনিসের সঙ্গে এক ব্যাগ শুকনো পাস্তাও ছিল। ময়দা দিয়ে সরু লম্বা খাবার বানানোর প্রচলন অনেক আগেকার। ডিউরাম প্রজাতির বিশেষ এক গম সেমোলিনা থেকে এগুলো বানানো হত। সিমুই বা সেমুই নাম সম্ভবত সেমোলিনা থেকেই এসেছে। চিনারা অবশ্য চালের গুঁড়ো বা রাগি থেকেও নুডল বানাত। কিন্তু এর শুরু ঠিক কবে, তা নিয়ে ঐতিহাসিকরাও দ্বিধান্বিত। ৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এট্রুস্কান সভ্যতার এক শিলালিপিতে নাকি পাস্তা বানানোর যন্ত্রের ছবি সহ বর্ণনা আছে। রোমানদের নিজস্ব পাস্তা ডিশ ছিল। রোমান লাসানাম বা রান্নার কড়াই থেকে আসা সেই পাস্তা আজও লাসানিয়া বা লাসানে নামে রেস্তোরাঁ আলো করছে। ১১৫৪ সালে সিসিলির পালের্মোতে রীতিমতো ডিউরাম গমের ময়দা দিয়ে লম্বা লম্বা নলের মতো পাস্তা বানানো হত। এই ময়দায় গ্লুটেন বেশি, তাই যা খুশি আকার দেওয়া যেত সহজেই। পাস্তা ধীরে ধীরে ইতালীয়দের পেড়ে ফ্যালে। ঘুমের মধ্যেও তারা পাস্তার স্বপ্ন দেখত। ১৩৫১ সালে বোকাচিও তাঁর বিখ্যাত বই ডেকামেরনে এমন এক কাল্পনিক দেশের কথা লেখেন, যেখানে পাহাড়গুলো সব চিজ দিয়ে তৈরি আর তা বেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা রোল করছে একের পর এক সুস্বাদু পাস্তা। ১৩০০ সনের দিকে পাস্তা এর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ করার সুবিধা এবং পুষ্টিগুণের জন্য লম্বা সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এদিকে ইতালিতে পাস্তা ধীরে ধীরে উত্তরে নেপলসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সপ্তদশ শতকে এটি নেপলসে জেঁকে বসতে সক্ষম হয়। ১৮৬০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইতালীয় Risorgimento-এর সময় এটি মুখ্য খাবারের একটিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইতালীয় সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গিসেপ্পো গ্যারিবল্ডি ১৮৯১ সালে পেল্লেগ্রিনো আরটুসির লেখা “La Scienza in cucina e l’Arte I Mangiar bene” নামের বইয়ের দারুণ প্রশংসা করে

সবাইকে পড়তে বলেছিলেন। মজার ব্যাপার, বইটি লেখা হয়েছিল পাস্তাকে কেন্দ্র করেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা থেকে ইতালিতে আগত টমেটো সসকে ইতালীয়রা শুরুতে স্বাগত জানায়নি। ধীরে ধীরে এই ভুল ধারণা কেটে যায়। পাস্তায় এর ব্যবহার হতে বাধা থাকে না। টমেটো সস ছাড়া পাস্তা এখন ভাবাই যায় না।

রাজনীতিতেও পাস্তাকে ব্যবহারের উদাহরণ আছে। মুসোলিনি ঠিক করলেন ইতালির এই জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য আরও বেশি জমিতে ডিউরাম গম লাগানো হবে। বিরোধীরা উলটো প্রচার করে দিলেন। বললেন মুসোলিনি নাকি পাস্তা ব্যান করতে চলেছেন। ব্যস! আর যায় কোথায়? প্রাণ যায়ে পর পাস্তা না যায়ে। গোটা ইতালিতে দাঙ্গা বেধে গেল। বিশ শতকের শুরুর দিকে ইতালিতে ফিউচারিস্ট আঁকিয়েদের গোষ্ঠী প্রথম পাস্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। তাঁরা যে-কোনো অধীনতার বিরোধী ছিলেন। এমনকি সেটা পাস্তার হলেও। এই আন্দোলন বেশিদিন টেকেনি। মুশকিল হল আন্দোলনকারীরাই খিদে পেলে পাস্তা খেয়ে পেট ভরাতেন।

পাস্তা মূলত দু প্রকার: pasta fresca (টাটকা, যা কিনা বানাবার পরপরই রেঁধে খেয়ে ফেলা হয়) ও pasta secca (শুকনো, যেটা সেই মরা মানুষের সম্পত্তিতে পাওয়া গেছিল)। এই দুরকম পাস্তাকে ছশোর বেশি প্রকারে ভাগ করা সম্ভব, যার প্রত্যেকটিই অন্যটি থেকে কোনো-না-কোনোভাবে আলাদা ও অনন্য। পাতলা পাত, ফলা কিংবা লম্বা সুতোর ন্যায়, সিলিন্ডার আকৃতির, নানা আকারের ও স্বাদের এবং নানা আঞ্চলিক ধরনের পাস্তার অস্তিত্ব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান। তাদের নামও অনেকরকম। সব মনে রাখা সম্ভব না। ঘণ্টার মতো দেখতে ক্যাম্পানোলি, শামুকের খোলের মতো দেখতে কনচিগ্লি, চাকতির মতো করজেট্টি, প্রজাপতির মতো ফারফ্যাল্লে, টিউবের মতো বোকাটিনি... কত বলব? তবে বিশ্বে যত পাস্তা বিক্রি হয় তার তিন ভাগের দুই ভাগ হল স্প্যাগেটি। মানে সরু দড়ি। এখানে জানিয়ে রাখি, গ্যালিলিও তাঁর সেই বিখ্যাত বল আর দড়ির পরীক্ষায় লিখেছেন, 'attached two balls to spaghetti'। ১৮৩৬ সালে, মানে হালেই এই ধরনের পাস্তাকে এই নামে ডাকা শুরু হয়। এই পাস্তা বানানো সহজ, রান্না সহজ, মেশিনে বানানো যায় হাজার হাজার টন, ফলে দাম কম। শ্রমিক আর নিম্নবিত্ত মানুষদের মধ্যে এই পাস্তার জুড়ি নেই। তবে ইতালীয়রা আমেরিকায় গিয়ে এই পাস্তা এত জনপ্রিয় করে দেয় যে সস্তা আর কম বাজেটের ওয়েস্টার্ন মুভিকেও স্প্যাগেটি ওয়েস্টার্ন নামে ডাকা শুরু হয় (দি গুড, দি ব্যাড অ্যান্ড দি আগলি এই ধরনের ছবির সেরা উদাহরণ)। বার্লি থেকে তৈরি পাস্তাকে বলে ম্যাকারনি, যা গ্রিক মাকারিয়া থেকে

এসেছে। মানে? বার্লি থেকে তৈরি।

স্প্যাগেটিকে আরও সরু সরু সুতোর মতো করলে যা তৈরি হবে, তার নাম ভার্মিসেল্লি বা ছোটো কেঁচো। এটা আমরা দুধ দিয়ে, চিনি দিয়ে সিমাইয়ের পায়েস বানিয়ে খাই। পাস্তার দুই পরতের মাঝে পুর ভরা থাকলে তাকে বলে র‍্যাভিওলি বা টরটেলিনি (ছোটো কেক)। এই টরটেলিনি নিয়ে একটা দারুণ গল্প আছে। বলার লোভ সামলানো মুশকিল। বিখ্যাত ইতালিয়ান সুন্দরী লুক্রেসিয়া বোরজিয়া একবার মোদেনার এক হোটেলে এসে ওঠেন। তাঁকে দেখে হোটেলের মালিক এতটাই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন যে লুকিয়ে তিনি লুক্রেসিয়ার কামরার চাবির ফুটোয় চোখ রাখেন। ঘরে লুক্রেসিয়া তখন উলঙ্গ। কিন্তু মৃদু আলোতে সেই মালিক লুক্রেসিয়ার নাভি শুধু দেখতে পান। সেই রাতেই নাভি দর্শনের সেই স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখতে তিনি লুক্রেসিয়ার নাভির মতো দেখতে এক পাস্তা বানান। সেই পাস্তাই টরটেলিনি।

এই গল্পের পর আর কিছু বলা যায় না। পাস্তা তবে এই অবধিই থাক।

পিজ্জা কি সত্যিই ইতালিয়ান?

পাস্তা খাঁটি ইতালির হলেও পিজ্জা একেবারেই অনুপ্রবেশকারী। হাজার বছরেরও আগে গ্রিক আর পারস্যে ব্যাপক হারে পিজ্জা খাবার প্রচলন ছিল। সম্রাট প্রথম দরায়ুসের সৈন্যরা নাকি সেই ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই আগুনের উপরে লোহার ঢাল রেখে তাতে মোটা রুটি, চিজ আর খেজুর মিশিয়ে পৃথিবীর প্রথম পিজ্জাটি বানান। একই সময় গ্রিকরাও চিজ আর অলিভ অয়েল দিয়ে এক মোটা রুটি বানাতেন। নাম ছিল পিত্তা। অনেকেই ভাবেন এই পিত্তাই পরে পিজ্জা নাম নিয়েছে। অবশ্য অন্য মতও আছে পিজ্জা কথাটা নাকি জার্মান পিজ্জো থেকে এলেও আসতে পারে। পিজ্জো মানে চিবানো। তবে লিখিত ভাবে প্রথম পিজ্জা শব্দটা দেখা যায় ইতালিতেই। নাপেলসের কাছে এক ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিতে পিজ্জা তৈরির রেসিপি পাওয়া গেছে। সে পাণ্ডুলিপিও বহু পুরোনো, ৯৯৭ অব্দের। ধীরে ধীরে পিজ্জাও পাস্তার মতো ইতালির খাবার হয়ে ওঠে। বাচ্চা বুড়ো, গরিব বড়োলোক, সবাই পিজ্জায় মেতে গেল।

পিজ্জা হাটের বিজ্ঞাপন

একেবারে শুরুতে টপিং হিসেবে দেওয়া হত টমেটো, অরিগানো, রসুন আর অলিভ অয়েল। নেপলসের এই আদিমতম পিজ্জা এখনও পাওয়া যায় মারিয়ানা পিজ্জা নামে। নাবিক বা মেরিনাররা এই পিজ্জার ভক্ত ছিল, সেই থেকে এমন নাম। কেউ কেউ আরও এক ধাপ

এগিয়ে বলেন, বহুদিন পর বাড়িতে ফিরে আসা নাবিকদের জন্য নাকি এই পিজ্জা রেঁধে রাখতেন তাঁর গিন্নি। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় পিজ্জাদের মধ্যে একটা হল পিজ্জা মার্গারিটা। মার্গারিটা মারিয়া থেরেসা জিওভান্না ১৮৭৮ সালে ইতালির রানি হন। তাঁর মতো জাতীয়তাবাদী, সুবক্তা, কলার সমঝদার রানি তখনকার দিনে (এখনও) বিরল। তাঁর নামেই আফ্রিকার তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ মার্গারিটা পিকের নাম রাখা হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে তিনি নেপলসে এলে পিজারিয়া দি পিয়েত্রোর মালিক কাম হেড শেফ রাফাল এস্পোসিতো ইতালির জাতীয় পতাকা সবুজ, সাদা আর লালে রাঙানো (চিজ, টমেটো আর পুদিনা পাতা মিশিয়ে) এক পিজ্জা বানিয়ে রানিকে উৎসর্গ করেন। আজও সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া অরিজিনাল পিজ্জা এই পিজ্জা মার্গারিটা।

আমেরিকার প্রথম পিজ্জা

পাস্তার মতো পিজ্জাও ইতালীয়দের হাত ধরে আমেরিকায় পাড়ি জমায়। ১৯০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পিজ্জারিয়া বা পিজ্জার দোকান গড়ে ওঠে মানহাটানের স্প্রিং স্ট্রিটে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল এর প্রতিষ্ঠাতা জেনারো লোম্বারডি-র নামানুসারে 'জি লোম্বারডিস।' এখনও সেই আগের স্বাদের পিজ্জা বিক্রি করে যাচ্ছে এই দোকান, যদিও ১৯০৫ সালের সে স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। পিজ্জার আসল জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে 'পিজ্জা হাট'-এর মাধ্যমে। এরপর ১৯৫৯ সালে 'লিটল সিজারস', ১৯৬০ সালে 'ডমিনোস' এবং ১৯৮৯ সালে 'পাপা জনস'-এর মতো বিখ্যাত পিজ্জা কোম্পানিগুলো প্রতিষ্ঠার পর পিজ্জা পৌঁছে যেতে

থাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে। এখন তো শুধু ফোনের অপেক্ষা আর গরম গরম পিজ্জা নিয়ে পিজ্জাবালক আপনার দরজায় কড়া নাড়বে, থুড়ি কলিং বেল বাজাবে।

চাউমিন আর চপস্যুই

আমরা যতই চাউমিন বলি না কেন, আসলে এ জিনিস নুডলস ছাড়া কিছু না। নুডলস খাওয়ার সবথেকে পুরোনো নিদর্শন রয়েছে ৪০০০ বছর আগেকার চিনে। ২০০৫ সালে একদল প্রত্নতাত্ত্বিক গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে কাজ করার সময়ে মাটির পাত্র খুঁজে পান, যেখানে ফক্সটেইল মিলেট এবং ব্রুমকর্ন মিলেটের সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুটোই লাগে নুডলস তৈরিতে। নুডলসের লিখিত নথি প্রথম পাওয়া যায় ২৫-২২০ সালের মধ্যে পূর্ব হান সাম্রাজ্যকালে লেখা একটা বইতে। গমের ময়দা থেকে তৈরি নুডলস হান রাজত্বের প্রধান খাদ্যে পরিণত হয়। ট্যাং সাম্রাজ্যকালে সর্বপ্রথম নুডলস কেটে সুতোর মতো তৈরি করা হয়। ইউয়ান রাজত্বকালে শুকনো নুডলস তৈরির প্রচলন হয়। নবম শতকের শুরুর দিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে চিনের গমের নুডলস জাপানে আসে। ১৩ শতকে পারস্যের জনগণ নুডলস খেত প্রমাণ আছে। বিভিন্ন উপাদান থেকে নুডলস তৈরির গবেষণা চলতেই থাকে। ১৯২ থেকে ১৮৯৭ সালে কোরিয়ার জোসেয়ন রাজত্বকালে বাজরা থেকে নুডলস তৈরি আবিষ্কার হয়। চাইনিজ নুডলসের উপর ভিত্তি করে তৈরি র‍্যামেন নুডলস ১৯০০ সালে জাপানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চাউমিন শব্দটা এসেছে চিন দেশের তাইশানের শব্দ শব্দ চাউ-মেইং থেকে। মানে ভাজা নুডলস। দোকানে দোকানে নুডলস কেবলই এক খাবার হয়ে রয়ে যেত, যদি না এক ভদ্রলোক আসতেন। ইনি একা হাতে নুডলসকে শেফের হাত থেকে একেবারে নবিশ রাঁধুনির কাছে পৌঁছে দেন। ভদ্রলোকের নাম জুলিয়াস ম্যাগি।

ম্যাগি স্যুপ মশলার বিজ্ঞাপন

১৮৭২ সাল। সুইজারল্যান্ড। জুলিয়াস ম্যাগি খুঁজে বেড়াচ্ছেন চটজলদি পুষ্টিকর খাবারের রেসিপি। কারণ সুইস সরকারের নির্দেশ। মহিলারা বেশিরভাগ সময়েই বাইরে কাজ করেন, আবার সরকারি কর্মীরা যাতে কাজে ফাঁকি দিয়ে খাবারের পিছনে বেশি সময় নষ্ট না করেন,

সেই কারণেই এমন সরকারি নির্দেশ জারি হয়েছিল। তাই এমন খাবার চাই, যা বানাতে বেশি সময় লাগবে না, আবার পুষ্টিকরও হবে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ আবিষ্কার ম্যাগির রেসিপি। যদিও সেসময়, নুডলস নয়, ম্যাগি ছিল কেবলই 'ফ্লেভার'। ১৮৭২ সালেই বাবার মিলের কাজ দেখাশোনা করার দায়িত্ব পড়ে জুলিয়াসের হাতে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিখ্যাত ফুড প্রোডাকশন গড়ে তোলেন তিনি। ম্যাগির ফ্লেভার আবিষ্কার করার পরেই জার্মানিতে তিনি নতুন কোম্পানি তৈরি করেন। সেটা এখনও সেখানেই আছে। নুডলসের আগে ম্যাগি ছিল শুধুই মশলা, যা জলে গুলে সহজেই স্যুপ তৈরি করা যেত। মোট তিন রকমের ফ্লেভারের মশলা বাজারে নিয়ে আসেন জুলিয়াস। এর প্রায় বেশ কয়েক বছর পরেই আসে হাতবদলের পালা। ১৯৪৭ সালে ম্যাগির 'রাইট' কিনে নেয় নেসলে কোম্পানি। এদিকে সেই ১৮৫৮ সালে জাপানের 'নিশিন ফুডস'-এর আবিষ্কারক মুমুফুকু আনদু সর্বপ্রথম ইনস্ট্যান্ট নুডলস তৈরি করেছিলেন। ১৮৫৮ সালেই তাঁরা 'চিকিন র‍্যামেন' কোম্পানি শুরু করেন। নেসলে ম্যাগির মশলা সঙ্গে দিয়ে সেই ইনস্ট্যান্ট নুডলস বাজারে আনলেন। রং দিলেন হলুদ-লাল। সমীক্ষায় দেখা গেছে এই দুই রংই নাকি খিদের ভাব জাগ্রত করে। ভারতের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে ম্যাগি নুডলস। এরপরেই চড়চড় করে জনপ্রিয়তা পায় ম্যাগি। শুধু নুডলস নয়, ম্যাগি সস, পরে ম্যাগি মশলাও বাজারে বিকোতে শুরু করে হুহু করে। মাত্র দুই মিনিটে বানানো না গেলেও সস্তায় পুষ্টিকর খাবার (!) হিসেবে এর জুড়ি নেই।

চপস্যুই নিয়ে অবশ্য দারুণ একটা গল্প প্রচলিত। সত্যি মিথ্যে জানা নেই। এক রেস্তোরাঁয় গভীর রাতে একদল গোল্ডমাইনার এলেন। হাতে বিপজ্জনক সব অস্ত্র। পেটে বুভুক্ষু খিদে। রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। খাবার সব বাড়ন্ত। কুক ছিল যে চিনা লোকটি, সে সাফ জানাল খাবার শেষ। কিন্তু এঁরা ভালো কথায় মানার লোক না। খেতে দাও নইলে প্রাণ দাও। ঠেলার নাম বাবাজি। বেচারা যা যা বেঁচে ছিল, তরিতরকারি, মাংসের কুচি, মাছের টুকরো, সব মিলিয়ে মিশিয়ে সস দিয়ে নুডলস দিয়ে পেশ করল। খিদের মুখে তাঁদের অমৃতসম লাগল এই খাবার। জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম এই খাবারের? চিনা শেফ বাঁকা হেসে বলল 'চপস্যুই', ক্যান্টনিজে যার মানে ফেলা ছড়ানো খাবার। ইউরোপিয়ান মাইনাররা তো দারুণ খুশ। তবে অনেকে আবার এই গল্প মানেন না। তাঁদের মতে চিনারা আমেরিকায় এলে তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন। তাই ফেলে দেওয়া মাংস বা সবজির টুকরো দিয়েও খাবার রেঁধে খেতে হত তাঁদের। আর সেই দারিদ্র্য থেকেই চপস্যুই-এর উদ্ভব। তাই মেনল্যান্ড চায়নায় বসে মহার্ঘ চপস্যুই খেতে খেতে মনে রাখবেন আদতে এটা কিন্তু একটি আদর্শ প্রোলেতারিয়েত খানা।

ডিমসাম কিংবা মোমো

সেই সুদূর অতীতে চীনাংশুক বা চিনা সিল্ক যখন ছড়িয়ে পড়ছিল দেশে দেশে, তখন তাঁদের সেই চলার পথে, সেই সিল্ক রুটে গজিয়ে উঠেছিল প্রচুর চায়ের দোকান। প্রথমে মনে করা হত চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু খেলে মানুষ অহেতুক মোটা হয়ে যায়। পরে যখন জানা গেল চা নিজেই হজমের কাজ করে, তখন চায়ের সঙ্গে অনুপান হিসেবে নানা স্ন্যাক্স খাওয়া শুরু হয়। ঠিক সেই সময় থেকেই তেলবিহীন স্টিমে সিদ্ধ মাংসের পুরে ভরা ডিমসাম চিনাদের রসনাকে তৃপ্ত করেছিল। চিনা ভাষায় ডিম মানে হৃদয় আর সাম মানে তৃপ্তিদায়ক। মনোহরা এই খাবার ধীরে ধীরে চায়ের অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে ওঠে। চিনারা ইয়ুম চা বললে শুধু চা না, চায়ের সঙ্গে ডিমসাম খাওয়াও বুঝত। কীভাবে চায়ের সঙ্গে ডিমসাম খেতে হবে তা নিয়ে আস্ত বই লেখা হয়েছে চিনদেশে। ভাবা যায়! মার্কো পোলো চিনদেশ ভ্রমণে এসে অন্য অনেক কিছুর মতো ডিমসামকেও ইউরোপে পরিচিত করান। এই ডিমসামই যখন তিব্বত ঘুরে রেশম ব্যবসায়ীদের হাত ধরে নেপালে এল, নাম নিল মোমো। মোমো মানে ভাপে রান্না করা। প্রথাগতভাবে এই খাদ্য তৈরির সময় চমরী গাই-এর মাংসকে পুর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভারতে মুরগি ও মোষের মাংস দিয়ে তৈরি মোমোই বেশি জনপ্রিয়। আমিষ মোমোর পাশাপাশি নিরামিষ মোমোও হয়ে থাকে। অনেকের হয়তো মনে আছে ফেলুদা আর জটায়ুকে সেই কাঠমান্ডু পাড়ি দিতে হয়েছিল মোমো খাবার জন্য। ২০০০ সালের মাঝামাঝি ভারতের সমস্ত মেগাসিটিতে এই খাবারটি ছড়িয়ে পড়ে। আর এখন তো পাড়ায় পাড়ায় মোমোর স্টলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। মোমোর দোকানের নাম আগে নেপালি রাখা হত অথেন্টিসিটি বোঝাতে। বাঙালি মোমো বিক্রেতার দোকানের নাম 'হামরো মোমো।' আজকাল সেই বালাই নেই। জয় মা তারা মোমো সেন্টার বা বাবা লোকনাথ মোমো আমি নিজে দেখেছি। ক্রসওভারের চরম আর কী!

পিকিং-এর হাঁস এবং হাজার বছরের পুরোনো ডিম

চিনাদের খাবারের মধ্যে অন্যতম সেরা ডেলিকেসি হল পিকিং ডাক। ব্যাপারটা আর কিছুই না, মোটাসোটা একটা গোটা হাঁসের কচমচে রোস্ট। কিন্তু এই পিকিং ডাক রান্না আবিষ্কারই হত না, যদি না মিং বংশের রাজারা নানকিং থেকে পিকিং-এ রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যেতেন। নানকিং-এর হাঁসেরা ছিল ছোটো আর তাই তেমন ভালো রোস্ট হত না। রাজধানী পিকিং-এ

নিয়ে যাবার সময় মালবাহী সব জাহাজ থেকে প্রচুর খাদ্যকণা জলে পড়ে যায়। আর সেই খাবার খেয়ে নানকিং-এর নদীনালার হাঁসরা বেশ ফুলেফেঁপে মোটাসোটা হয়ে যায়। যত দিন যেতে লাগল, এই হাঁসেরা আর ডায়েট কন্ট্রোল না করতে পেরে আকারে বড়ো হল আর পিকিং-এর রাঁধুনিরা এদের রোস্ট করে রাজার পাতে উপস্থিত করতে লাগল। একসময় জাহাজ চলা বন্ধ হল। কিন্তু ততদিনে পিকিং ডাকের চাহিদা বেড়েছে। সাধারণ হাঁসকেই প্রচুর গিলিয়ে গিলিয়ে মোটা করা হত, যাতে তার মাংস আরও মুচমুচে, আরও সুস্বাদু হয়। চিনারা ধীরে ধীরে হাঁসের চামড়াকে সুন্দর বাদামি সোনালি রং দেওয়া শিখল। সেই চামড়া অবশ্য রাজারা খেতেন না। তাঁরা শুধু ভিতরের নরম মাংসটা খেতেন। চামড়া খেত চাকর খানসামারা। ব্রিটেনে অবশ্য এই রান্নাকে ক্রিস্পি অ্যারোমেটিক ডাক নামে ডাকা হয়, যদিও আসলে তা পিকিং ডাকই।

হাজার বছরের পুরোনো ডিম কিন্তু হাজার বছর পুরোনো না। সেইরকম হলে সেই ডিম আদৌ খাওয়া যেত কি না সন্দেহ। তবে এই রেসিপি হাজার বছরের বেশি পুরোনো। হাঁস, কোয়েল বা মুরগির ডিমকে ক্ষারীয় মাটি মিশিয়ে বহু বছর রেখে দেওয়া হয়। গল্প আছে একবার এক চিনা মিস্ত্রি নাকি বাড়ি বানাতে গিয়ে নিচে চাপা পড়া বেশ কিছু ডিম অক্ষত অবস্থায় পান। সাহস করে খেয়ে দেখেন, খেতে মন্দ নয়। সেই নাম না-জানা ভদ্রলোকই নাকি হাজার বছরের ডিম সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। মাটির সঙ্গে নুন মেশানোও নাকি তাঁরই প্ল্যান।

প্রথমে কাদা মাখিয়ে ডিম একশো দিন রেখে দেওয়া হত, যতক্ষণ না ডিমের সাদা অংশ কালচে বেগুনি হয়ে যায়। এখন অবশ্য মাস প্রোডাকশনের যুগে মাত্র কয়েক সপ্তাহেই এই কালচে রং আনা সম্ভব হচ্ছে। চিন, বর্মা, জাপান, হ কং-এ রাস্তায় স্ট্রিট ফুড হিসেবে, বিয়েবাড়ি, অনুষ্ঠানবাড়িতে এই ডিম থাকবেই। এই ডিমের ডেভিল নাকি দুরন্ত খেতে। যাঁরা খেতে চাইছেন তাঁদের একটা কথা জানিয়ে রাখি। এতদিন রেখে দেওয়ায় ডিমের প্রোটিনের একটা অংশ অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়, আর সেই গন্ধ ডিমে কামড় দিলেই পাবেন। শুরুতে বলা হত এই ডিম নাকি তিন মাস মূত্রের জালায় ডুবিয়ে রাখা হয়। ভাবা আশ্চর্য না, কারণ খেলেই আপনার মনে হতে পারে, ‘গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কী আহ্লাদ? থাইল্যান্ডে তাই এর নাম থাই ইউ মা, মানে ঘোড়ার মূত্রে ডোবানো ডিম।

একবার চিন ভ্রমণকালে রবি ঠাকুর সহ শান্তিনিকেতনী অতিথিদের নাকি চিনারা এই ডিম দিয়ে বরণ করেছিল। বেশ গাঢ় নীল ডিমগুলো খেয়ে নন্দলাল বসু কোনোক্রমে টিকে গেলেও

ক্ষিতিমোহন সেন মশাইয়ের সারারাত বারেবারে বমি বাহ্যে অবস্থা খারাপ। সবারই প্রায় সেই দশা। ব্যতিক্রম একমাত্র গুরুদেব স্বয়ং। তিনি বেশ কটি ডিম খেয়েও স্থির। সবাই অবাক। পরে জানা গেল গুরুদেব নাকি প্রায় ম্যাজিকের কায়দায় ডিমগুলোকে মুখে না ঢুকিয়ে দাড়ির আড়ালে বুকে পাতা ন্যাপকিনের তলা দিয়ে শিল্পীসুলভ কৌশলে সরাসরি জোব্বার পকেটে চালান করেছিলেন। সাধে কি বলে গুরুদেব!

স্যুপ আর ব্যুফে

স্যুপ

ছোটোবেলায় আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল সুপ সুপ করে পান করতে হয় বলে এই পানীয়ের নাম স্যুপ। ব্যাকরণে উৎসাহী পাঠকদের জানাই, সুপসুপা সমাস নামে একখানা সমাস আছে, যার সঙ্গে স্যুপের কোনও যোগ আছে বলে জানা যায়নি। স্যুপের ইতিহাস বহু পুরাতন। মানুষ যবে থেকে মাটির বা পাথরের পাত্র বানিয়ে জল ফোটাতে শিখল, প্রায় তবে থেকে স্যুপের শুরু। চিনের জিয়াংজি প্রদেশের জিয়ানরেনডং গুহায় ২০ হাজার বছর আগের একটি স্যুপ বোল পাওয়া গেছে। মাটির পাত্রটিতে পুড়ে যাওয়ার দাগ পাওয়া গেছে, যার অর্থ এতে গরম স্যুপ রাখা হয়েছিল। প্রাচীন মানুষ গর্ত খুঁড়েছিল প্রথমে। তারপর চকমকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বেলেছিল। পাত্রটি জলে পূর্ণ করে তার মধ্যে শিকার করা পশুর নাড়িভুঁড়ি রেখেছিল। শেষে সেটি আগুনের ওপর ধরেছিল। তৈরি হয়ে গিয়েছিল প্রাচীন মানুষের স্যুপ।

ম্যাড ম্যাগাজিনে স্যুপের মজার বিজ্ঞাপন

অবশ্য তখন তাকে আদিম মানবেরা কী বলত জানা নেই, তবে অনেক পরে ফরাসি স্যুপা থেকে এই শব্দটা এসেছে। ফরাসি শব্দটাও এসেছে ল্যাটিন স্যুপা থেকে, যার মানে ঝোলে চোবানো পাউরুটি। জার্মানরা অবশ্য এখনও ঘন স্যুপে ডোবানো রুটিকে সপ বলেই ডাকেন। ৫০০ বছর ধরে রোমানরা বিশ্বের এদিক-ওদিক দাপিয়ে বেড়িয়েছে। স্যুপের ইতিহাসেও তারা দাগ রেখে গেছে। স্পেনে তারা নিয়ে গিয়েছিল গাজপাচো। বিয়ের আসরে বিশেষ রকমের স্যুপ তারা তৈরি করত। ৪৭৬ অব্দে পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে স্যুপ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে টিকে গেল, বিশেষ করে কনস্টান্টিনোপলে স্যুপের ভালো চল ছিল।

তারপর ১৪৫৪ সালে অটোমানরা কনস্টান্টিনোপল জয় করে নিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্যুপের মিলন ঘটল। তুর্কিরা স্যুপে প্রচুর সবজি দিত আর ইউরোপীয়দের স্যুপে মাংস থাকত। তুর্কিদের স্যুপ খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় ছিল না, দিনের যে-কোনো সময় খেত। এদিকে ইংল্যান্ড, জার্মানি আর গ্রিসের লোকেরা রুটির ওপর স্যুপ ঢেলে খেতে বেশি পছন্দ করত। রেনেসাঁর আমলে ইউরোপে একটা ফ্যাশন চালু হল— গলায় আলগা কলার পরার। এই কলার পরার কারণে লোকদের বোলে করে স্যুপ খেতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই এল স্যুপ স্পুন বা স্যুপের চামচ। ঠিকই ধরেছেন, তার আগে বাটি ধরে স্যুপ গলায় ঢালার প্রথাই ছিল, ডালে চুমুক দেবার মতো। আর আজকাল তো চামচ ছাড়া স্যুপ খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। ষোড়শ শতকে ফ্রান্সে প্রথম রেস্তোরাঁ চালু হলে (এই রেস্তোরাঁ শব্দটা এসেছে রেস্টোর বা গড়ে তোলা থেকে) প্রথমেই সবচেয়ে সস্তায় একমাত্র যে খাবার সরবরাহ করা হত, তা হল সবজির স্যুপ। ১৭৬৫ সাল অবধি রেস্তোরাঁ মানে স্যুপের দোকানই বুঝতেন জনগণ। ১৭৭২ সালের বিখ্যাত কুকবুক 'The Frugal Housewife'-এ গোটা একটা অধ্যায় আছে স্যুপ রান্নার রেসিপি নিয়ে। শুধু ইউরোপে না, এশিয়াতেও স্যুপ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো স্যুপ হল ফো। এই ফো-এর উৎপত্তি হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, উত্তর ভিয়েতনামে, হ্যানয়-এর দক্ষিণ-পূর্বে নাম ডিন প্রদেশে। ঐতিহ্যগতভাবে ফো-এর আঁতুড়ঘর ধরা হয় ভান চু এবং ডাম চু গ্রামকে। গ্রামবাসীদের মতে ভান চু গ্রামে ফরাসি ঔপনিবেশিক যুগের আগে থেকেই ফো খাওয়া হত। ফো-এর জনপ্রিয়তা আসে ফরাসি উপনিবেশ স্থাপনের পর, যখন গোরুর মাংসের আমদানি বৃদ্ধি পায়। চিনের ইউনান এবং কুয়াংতোং প্রদেশের শ্রমিকেরা একে জনপ্রিয় করে তোলে। ফো সাধারণত চিনে ফেরিওয়ালারা ভোরে এবং সন্ধ্যায় তাদের ভ্রাম্যমাণ চুলায় নিয়ে বিক্রি করত। তাদের ভ্রাম্যমাণ চুলার দুটো অংশ থাকত, এক অংশে কাঠ দিয়ে জ্বালানো আগুন এবং আর-এক অংশে ফোটানো জল, নুডলস, মশলা, ভেষজ এবং মাংস থাকত। এখন যত চাইনিজ স্যুপ খাই, সব এই ফো-এরই নাতিনাতনি।

তবে ফ্রান্সে স্যুপ নিয়ে যত বাড়াবাড়ি, তেমনটা আর কোথাও নেই। নানা দাঁতভাঙা নামের অদ্ভুত স্যুপ রয়েছে তাদের রেসিপিতে। এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে জনপ্রিয় পেঁয়াজের স্যুপ। ক্যারামেলাইজড পেঁয়াজ মাখন আর চিজের সঙ্গে মিলে অদ্ভুত স্বাদ তৈরি করে।

অনেকদিন অবধি ধারণা ছিল, এ বুঝি ফরাসিদের নিজস্ব আবিষ্কার। পরে দেখা গেল ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যের রাজা সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার সময় সৈন্যদের জন্য প্রচুর পরিমাণে এই স্যুপ বানিয়ে নিয়ে গেছিলেন। পারস্যে অবশ্য এর নাম আস-এ-নাজরি বা প্রার্থনার স্যুপ।

বাড়িতে কোনও শিশু অসুস্থ হয়ে পড়লে বা কেউ দূরদেশে গেলে শিশুর রোগমুক্তি বা সেই যাত্রীর শুভ আগমনের কামনায় বাড়ির সবাই মিলে এই স্যুপ রান্না করতেন। রান্নার উপকরণ দিতেন সব আত্মীয় আর বন্ধুরা, সমান পরিমাণে। এতে কোনও গরিব বা বড়োলোক ভেদ থাকত না। সবাই মিলে প্রার্থনা করতেন সেই স্যুপ ঘিরে। আর যদি তাঁদের প্রার্থনাপূরণ হত, তবে প্রতি বছর সেই এক দিনে আবার সবাই মিলে এই স্যুপ বানাতেন।

MODERN COOKERY,

FOR PRIVATE FAMILIES,

REDUCED TO A SYSTEM OF EASY PRACTICE,

CAREFULLY TESTED RECEIPTS,

BARON LIEBIG AND OTHER EMINENT WRITERS

BY ELIZA ACTON.

COPIOUSLY ILLUSTRATED.

LONDON:
LONGMAN, GREEN, LONGMAN, ROBERTS, AND GREEN.

1864.
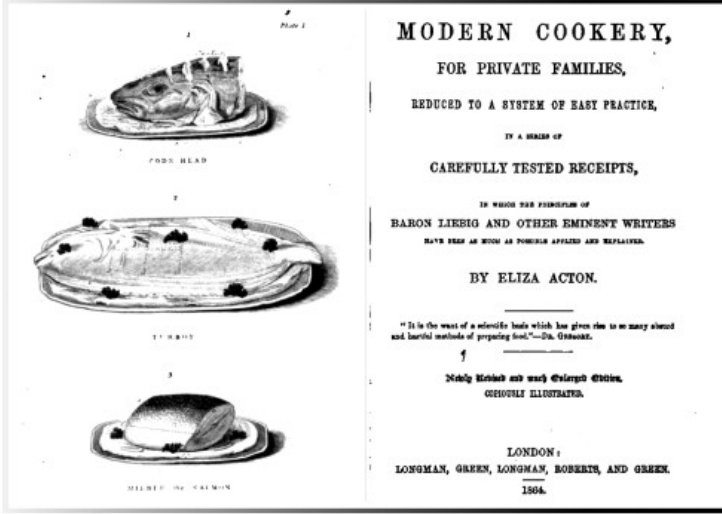
এলিজা অ্যাক্টনের রেসিপির বই

খাঁটি ভারতীয় স্যুপ বলতে কি কিছুই নেই? আছে তো। মুল্লিগাটাওনি স্যুপ। চলে যাওয়া ব্রিটিশ রাজের স্মৃতি হিসেবে যে কটা খাদ্য রয়ে গেছে, তাদের অন্যতম এটি। তামিল মিলাগাউ-তান্নির মানে লংকা মেশানো জল। মাংসের টুকরো জলে ফুটিয়ে তার সঙ্গে লবণ, লংকা আর মশলা দেওয়া এই স্যুপ ব্রিটিশদের দারুণ পছন্দের ছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পোস্টেড সব ইংরেজরা এই মুল্লি বলতে অজ্ঞান। ১৮৪৫ সালে এলিজা অ্যাক্টন তাঁর রেসিপির বই ‘Modern Cookeries for Private Families’-এ এই স্যুপের রেসিপি প্রথম ফাঁস করে দিলে ব্রিটেনে এই স্যুপের জয়যাত্রা শুরু হয়।

বহনযোগ্য বা পকেট স্যুপের প্রচলন হয় উনিশ শতকের শেষে। ব্রিটিশরা যখন তাঁদের উপনিবেশগুলোতে বেড়াতে যেতেন, তখন ব্যাগে স্যুপ বহন করতেন। এতে শুধু গরম জল মেশালেই হত। এরপরই ক্যানড স্যুপের চল হয়। ক্যাম্পবেল স্যুপ কোম্পানির ড. জন টি

ডরেন্স ১৮৯৭ সালে এটি আবিষ্কার করেন। কাউবয় ও সৈনিকদের মধ্যে ক্যানড স্যুপের আদর ছিল বেশি। উজ্জ্বল লাল রঙের এই স্যুপ ক্যান এখন প্রায় আমেরিকান আইকনে পরিণত হয়েছে, বিশেষত অ্যান্ডি ওয়ারল একে নিয়ে ছবি আঁকার পর।

ব্যুফের ইতিবৃত্ত

ব্যুফে শুনলেই মনের খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। যা খুশি খাও, যত খুশি খাও। উনিশ শতকে ফ্রান্সে প্রথম ভোজবাড়িতে এই ব্যুফের চল হয়। রান্নাঘরের একপাশে কাঠের তক্তায় স্টার্টার থেকে ডেজার্ট, সবকিছু সাজানো থাকত। সময় সুযোগ বুঝে যে যার মতো খেয়ে নিত। সুইডেনে স্মরগাসবোর্ড নামে ঠিক এই জিনিসই চলত। তক্তার তলায় ড্রয়ারে রাখা থাকত ছুরি, কাঁটা, প্লেট আর মদ।

ব্যুফের নাম ব্যুফে অবশ্য হয়েছে আলফাঁস ব্যুফের নামে। এই ভদ্রলোক ছিলেন খাঁটি প্যারিসের মানুষ আর তাই অসংযমী, জুয়ারি এবং মাতাল। লর্ড স্যান্ডউইচের মতো ইনিও তাস খেলায় বাধা পড়ুক, তা চাইতেন না। চাকরদের বলাই থাকত, যত খাবারদাবার আছে তা তাস খেলার টেবিলের পাশে এনে জড়ো করতে। তিনি সুযোগ বুঝে খেয়ে নেবেন। তাঁর সঙ্গীরাও খাওয়াতে অংশ নিতেন। মুশকিল হল, ইদানীং জানা গেছে এই গোটা গল্পটাই মিথ্যে, ফরাসি ঢপবাজি, ইংরেজদের স্যান্ডউইচের গল্পকে টেক্কা দিতে।

পুরোনো ফরাসি শব্দে ব্যুফে মানে কাঠের টুল বা বেঞ্চি। যে কাঠের বেঞ্চে এই খাবার রাখা থাকত, তার নামেই এই ব্যুফের নাম। কীভাবে যেন ইংরাজিতে শব্দটা চলে আসে, সঙ্গে গল্পটাও। আর স্যান্ডউইচে বিশ্বাস রাখা ইংরেজ এই ফরাসি চালাকিটা ধরার আগেই গল্পটা লোকমুখে সত্যি হয়ে গেছিল।

তরিতরকারি আর স্যালাড

পেঁয়াজের কথা

বেদ উপনিষদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পেঁয়াজের নাম পাইনি। এসব বিধর্মী যবন আর ম্লেচ্ছদের খাবার। দাম বাড়ল কি কমল, আপনার কী এসে যায় তাতে? আরও জানিয়ে রাখি পেঁয়াজে নাকি উত্তেজনা বাড়ে, তাই ছাত্র আর বিধবাদের পেঁয়াজ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। ফা হিয়েন সারা ভারতে পেঁয়াজ দেখেননি। হিউয়েন সাং দেখেছিলেন, কিন্তু পেঁয়াজ খেলে নাকি শহরের বাইরে বের করে দেওয়া হত। মুখের গন্ধের জন্য কি না কে জানে!)। তাহলে ভারতীয়দের মধ্যে পেঁয়াজ চালু করলেন কে? খুব সম্ভব চরক। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক, যিনি আয়ুর্বেদের উপর দারুণ একটা সংহিতা লিখেছিলেন। পেঁয়াজ তখন ব্যবহার হত একমাত্র ওষুধ হিসেবে। সেখানে পেঁয়াজকে মূত্রবর্ধক, হজমে সহায়ক, হৃৎপিণ্ড ও চোখের জন্য উপকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, কোকাকোলাও প্রথমে মাথা ধরার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হত। তারপর নবাবি আমলে তো পেঁয়াজের পুর দেওয়া শিঙাড়া থেকে মিসরি রুটি, সবেতেই পেঁয়াজের ছড়াছড়ি যেত। মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সাত সহস্রাব্দ আগের ব্রোঞ্জ যুগের কিছু মানববসতিতে সবজি হিসাবে পেঁয়াজের ব্যবহারের কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছে। আর-এক দল গবেষকের মতে, ইরান ও পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বপ্রথম পেঁয়াজের চাষ করা হয়। ইতিহাসবিদদের মতে, প্রাচীন ইতিহাসের গোড়ার দিকে চাষ হওয়া কিছু ফসলের মধ্যে পেঁয়াজ অন্যতম। সহজেই নানা জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, ধীর পচনশীলতা ও সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় প্রাচীন মানুষের কাছে পেঁয়াজ ছিল প্রয়োজনীয় একটি খাদ্য। আমেরিকান পেঁয়াজ সমিতির তথ্য অনুযায়ী, প্রাচীন মানুষের তৃষ্ণাও মেটাত পেঁয়াজ। যখন সব পুষ্টিকর খাদ্য ফুরিয়ে যেত, সেসময় খাওয়ার জন্য আগে মানুষ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করত। পৃথিবীর বহু স্থানে এই পেঁয়াজকেই অনন্ত জীবনের প্রতীক হিসাবে দেখা হত এককালে। পেঁয়াজের গোলাকার আকৃতি আর সমকেন্দ্রিক একটির উপর আর-একটি চক্রাকার রিং থেকে এই ধারণার জন্ম বলে মনে করা হয়। পিরামিডের দেওয়ালে তাই পেঁয়াজের ছবি আঁকা দেখতে পাই। আর হ্যাঁ, মিশরীয়দের কথা উঠল যখন, বলেই ফেলি, তারা মনে করত মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য পেঁয়াজ অতি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তাদের সমাধির মধ্যে তারা

পেঁয়াজ রাখত। এই ঘটনার সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রমাণ পাওয়া যায় রাজা চতুর্থ রামেসিসের সমাধিতে। এই সমাধি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা যায় রাজা চতুর্থ রামেসিসের মমির দুই চক্ষুকোটরে ভরে রাখা হয়েছে পেঁয়াজ! এ ছাড়াও মৃতদেহের শরীরের নানা অংশে পেঁয়াজ রাখা হত। বুকে পেঁয়াজের ফুল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। মমির কান, পায়ের পাতা ইত্যাদি স্থানে পেঁয়াজ দিয়ে সাজানো হত। বহু মিশরীয় যাজকদেরও ছবিতে পেঁয়াজ হাতে দেখা গিয়েছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল পেঁয়াজের এই ঝাঁঝালো গন্ধ ও তার জাদুকরী ক্ষমতায় মৃত মানুষ আবার নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করে। সোজা কথা, পেঁয়াজের গন্ধে মড়াও জেগে ওঠে। পেঁয়াজের এই গন্ধের কারণ গন্ধকঘটিত কিছু যৌগ, এটাও এখন অনেকে জানেন। গ্রিসের ক্রীড়াবিদরা প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ খেত। এ ছাড়াও নিজেদের পেশি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করতে রোমান গ্ল্যাডিয়েটররা তাদের শরীরে পেঁয়াজ মালিশ করত। রোমানরাও পেঁয়াজের নানা উপকারী দিক সম্পর্কে জানত। তারা দাঁতের ব্যথা কিংবা অনিদ্রা দূর করতে পেঁয়াজ খেত। প্রাচীন রোমে যে ব্যাপক আকারে পেঁয়াজের চাষ হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় অগ্ন্যুৎপাতে চাপা পড়ে যাওয়া পম্পেই নগরীতে। সেখানেও প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেয়েছেন পেঁয়াজ চাষের প্রমাণ। বাইবেলেও ইজরায়েলিদের পেঁয়াজ খাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

How to Avoid Tears when Peeling Onions

হিথ রবিনসনের আঁকা কার্টুন

শেষকালে বলি, মধ্যযুগে মানুষ ঠিক মুদ্রার মতো পেঁয়াজ ব্যবহার করত। নানা কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে কিংবা ভাড়া পরিশোধ করার ক্ষেত্রেও পেঁয়াজের প্রচলন ছিল। এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান, যেমন বিয়েতে মানুষ বর-কনেকে পেঁয়াজ উপহার দিত। চিন্তা নেই। আবার সেই দিন আসতে চলেছে...

আলুর উত্থান পতন

আশা করি এই আলোচনায় পাঠক দোষের কিছু পাবেন না। এখন সবজিতে আলু ছাড়া চিন্তা করা অসম্ভব হলেও কিছুদিন আগেও ইউরোপীয়রা আলুকে বিষাক্ত ভেবে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যখন আলু চালু হল, তখনও মাপে অতি অল্প, ওষুধ হিসেবে। ১৭৭৮ সালে ফ্রান্স সরকার রীতিমতো আইন করে আলুর চাষ বন্ধ করে দেন। তাঁরা স্থির বিশ্বাস করতেন আলু থেকে কুষ্ঠ সহ নানা বিচিত্র রোগ ছড়ায়। এই বিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল যে ১৭৭০ সালে মহাদুর্ভিক্ষের সময় রাজা ফ্রেডরিখ দ্য গ্রেট টন টন আলুর বস্তা চাষিদের পাঠালেও তাঁরা ফেরত পাঠিয়ে দেন। না খেয়ে মরেন, তবু আলু খেতে অস্বীকার করেন।

নাঃ, শুরু থেকেই শুরু করা যাক বরং। বিজ্ঞানীরা ধারণা করে থাকেন আজ থেকে প্রায় ১৩০০০ বছর আগে আলুর বুনো জাতের উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রায় ৭০০০ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে পাহাড়ি অঞ্চলে প্রথম আলু চাষ শুরু হয়।

ইনকা সভ্যতা স্মরণীয় হয়ে আছে এই আলুর জন্য। তারা আলুর ভিতরের আর্দ্রতা বের করে এক বিশেষ উপায়ে একে চূর্ণ করে চুচু নামক এক খাবার তৈরি করত। প্রায় দশ বছর সংরক্ষণ করা যেত সেই খাবার। সেটা ছিল তাদের আকালের দিনের রক্ষাকবচ। তারা বিশ্বাস করত যে, গর্ভবতী মায়েরা বেশি আলু খেলে প্রসববেদনা কম হয়। আলু দিয়ে অনেক রোগের চিকিৎসাও করা হত ইনকা সভ্যতায়। সেই ইনকাদের কথা যখন স্প্যানিশরা লিখলেন, তাঁরা এই ফসলকে নাম দেন বাটাটা। আজও ভারতের পশ্চিমে, বিশেষ করে মুম্বাইতে বা গোয়ায়, যেখানে পর্তুগিজরা আস্তানা গেড়েছিলেন, সেখানে আলুকে বাটাটা নামেই ডাকা হয়। ১৫৩২ সালে পেরুতে সোনার খোঁজে এসেছিল স্প্যানিশ দখলদাররা। তারা জানত যে সোনার খনিতে কাজ করা ইনকারা আলু বা চুচু খেত। যদিও স্প্যানিশরা তখন পর্যন্ত সোনার চেয়েও দামি আলুর মর্ম বুঝতে পারেনি, কিন্তু যখনই জাহাজে করে তারা বিভিন্ন এলাকায় যেত, সঙ্গে করে খাবার হিসেবে আলু নিয়ে যেত। কিন্তু সেটা ওই জাহাজ পর্যন্তই ছিল, ঘরবাড়িতে আলুর প্রবেশ তখনও হয়নি।

১৫৭০ সালে স্পেনে প্রথম আলুর ছোটোখাটোভাবে চাষ হয়। মজার ব্যাপার হল এই আলু চাষ করা হয়েছিল গোরু ছাগলের খাবারের জন্য। মানুষ তখন আলু খাবে?? কভি নেহি। আলু আস্তে ধীরে ইউরোপে ছড়িয়েছে, কিন্তু ইতিবাচকভাবে না। মানুষ এটাকে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ভয়ের চোখে দেখত। একেবারে খাওয়ার কিছু না থাকলে একেবারে হতদরিদ্র মানুষ আলু খেত, অন্যথায় ওটা গোরু ছাগলই খেত। নেহাত নতুন ধরনের গাছ বলে উত্তর ইউরোপে কিছু বোটানিকেল গার্ডেনে লাগানো হয়েছিল আলু গাছ। ইউরোপের মানুষের

নাকউঁচু স্বভাব ছিল। এমনকি কিছু লোক তো রীতিমতো ভাবতে শুরু করল আলু গাছ ডাইনিদের সৃষ্টি। মানুষকে সম্মোহিত করতে নাকি ডাইনি জাদুকররা আলু বানিয়েছে। এইরকম ভাবা একেবারে অমূলক না। আসলে আলু যে প্রজাতির গাছ, তার নাম ডেডলি নাইটশেড। ঠিক একই প্রজাতির বেশ কিছু বিষাক্ত গাছ আছে। তাই প্রথম দর্শনে আলুর প্রতি সন্দেহ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক না। ইউরোপে আলুর একটা কারণেই কদর ছিল। আলুর ফুল। আলুর ফুল দিয়ে ঘর সাজানো ধীরে ধীরে ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মজার ব্যাপার, পরে যখন ব্যাপক হারে আলু খাওয়া শুরু হল, তখন আলুর ফুল তার মর্যাদা হারাল। খাবার জিনিস দিয়ে ঘর সাজাতে কে চায়?

আরও প্রায় ১০০ বছর পরেও মাংসপ্রিয় ইউরোপিয়ানদের আলু খাওয়ানো যায়নি। আলু নাকি বিস্বাদ!! ১৬৬২ সালে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি সুপারিশ করে সরকারের প্রতি ও জনগণের প্রতি আলু চাষের জন্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অবশ্য আলুর কপাল খুলতে বেশি দেরিও হয়নি। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডে রেভোল্যুশনারি যুদ্ধ শুরু হলে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। জনগণ বাধ্য হয় খাবার টেবিলে আলু রাখতে। তখন ইংল্যান্ডের তৎকালীন বোর্ড অব এগ্রিকালচার আলু চাষের নিয়মকানুন নিয়ে প্রচার শুরু করে। শুরু হয় নতুন অধ্যায়ের। এই ধরনের ঘটনাগুলো শুধু ইংল্যান্ডেই নয়, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সেও ঘটেছিল। সেই সময়ের সৈন্যরা যখন খাবারের খোঁজে কৃষকের মাঠে লুটতরাজ করত, মূলত তারা গম, আঙুর ইত্যাদি ফসল, যেগুলো সহজেই কেটে ফেলা যায়, সেগুলো লুট করে নিয়ে যেত। আলু যেহেতু মাটির নিচে থাকত, মাটি কেটে আলু লুট করার ঝামেলায় তারা যায়নি। এ কারণে কৃষকরাও আলু চাষ করে নিরাপদ থাকত।

যা দিয়ে শুরু করেছিলাম, ১৭০০ সালের আগে পর্যন্ত আলু চাষে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। হবে কী করে? জনগণের ধারণা আলু খারাপ, না দেখতে ভালো, না খেতে ভালো! খেলে আবার অসুখবিসুখ হয়! ১৭৭১ সালে ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা হয় আলু চাষ করলে 'লাভ আছে, ক্ষতি নাই।' তবে মানুষের ভুল ধারণার অবসান ঘটানোর জন্য রাজা ষোড়শ লুই জামার বোতামে আলুর ফুল লাগিয়েছিলেন, রানি মেরি এন্টোনি চুলের খোঁপায় আলুর গোলাপি মুকুল রাখতেন। আলুর কপাল এমনি এমনি খোলেনি। এদিকে প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডেরিকও বেজায় চেষ্টা করেছিলেন তাঁর রাজ্যের লোকদের আলু খাওয়াতে; পারেননি। কারণ? ওই যে, আলু বিষাক্ত। এদিকে রাজ্যে খাদ্যসংকট চলছে, গমের দাম হুহু করে বেড়ে চলছে। লোকজন না খেয়ে মরবে নাকি? রাজা পড়লেন বিপদে। রাজা ফন্দি আঁটলেন।

রাজ্যের লোকজনের ওপর উলটো সাইকোলজি প্রয়োগ করলেন। তাঁর রাজকীয় বাগানে তিনি আলু চাষ করলেন, কঠিনভাবে ঘোষণা দিলেন এখান থেকে কোনও আলু চুরি করা যাবে না। কে না জানে নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণ বেশি থাকে? লোকজন ওই বাগান থেকেই আলু চুরি করল। যেটা এত গার্ড দিয়ে রাখা হয়, সেটাই তো চুরির জন্য উপযুক্ত। চুরি করে আলু গাছ নিজেদের বাগানে লাগিয়ে দিল কৃষকরা। রাজা মিটিমিটি হাসলেন। তিনি তো এটাই চেয়েছিলেন।

ইতিহাসবিদরা বলেন শিল্পবিপ্লব যুগে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নাকি ছিল আলু। শিল্পবিপ্লব অনেক নতুন কিছুর আবিষ্কারক। তো যেই শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ইংল্যান্ডের মানুষের খাবার ছিল রুটি, মাংস, মাখন ইত্যাদি, সেই শিল্পবিপ্লবই বাধ্য করেছে তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে। এর অবশ্য যৌক্তিক কারণও ছিল। ওই সময় প্রচুর মানুষ শহরে ভিড় করেছিল কাজের জন্য। এত মানুষ তো বাসাবাড়িতে ফ্রিজ কিংবা ওভেন কিনতে পারত না। তো ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করে কার ইচ্ছে থাকত বাসায় এসে আবার রুটি বানাবে, মাংস পাকাবে! তার চেয়ে দ্যাখো ভালো আলুর এত ঝামেলা নেই। একটা বড়ো সাইজের আলু খেলেই পেট ভরে যায়,এত আয়োজন করে রান্নাও করতে হয় না।

অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল আইরিশরা। তারা ইনকাদের মতোই আলুর মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছিল। আয়ারল্যান্ডের মাটি আর আবহাওয়াও অবশ্য আলু চাষের অনুকূল ছিল। সে কারণে কৃষকরাও একে সহজভাবে নিয়েছে কোনোরকম সন্দেহ ছাড়াই। আয়ারল্যান্ডে আলু প্রধান খাবার হিসেবে পরিগণিত হয় ১৮০০ সালের দিকে। জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে তখন থেকে। তাহলে কি আলুই জনসংখ্যা বাড়িয়েছে? ঐতিহাসিকরা ওইরকমই মত দিয়েছেন। ১৭৮০ সাল এবং ১৮৪০ সালের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। আলুর ব্যাপক চাষ ছাড়া লক্ষণীয় এমন কোনও বিষয় পাওয়া যায় না, যার কারণে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। আয়ারল্যান্ডের কৃষি ব্যবস্থা তখন এতটা উন্নত ছিল না। কিন্তু ইতিহাস বলে, সেখানকার সবচেয়ে গরিব চাষিটিও অনেক স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারত এই আলু চাষের দৌলতে। এতে তেমন বড়ো কোনও বিনিয়োগ লাগত না কিংবা খুব শ্রমও দিতে হত না। এমনকি ছোটো ছোটো শিশুরাও সহজে আলু রোপণ করত, মাঠ থেকে আলু সংগ্রহ করত। কোনও মাড়াইয়ের প্রয়োজন হয়নি কিংবা প্রয়োজন হয়নি ফসল হওয়ার পর শ্রমসাধ্য কোনও কাজের। এই যে আলু এত প্রাচুর্য দিল, তাতে করে শিশুমৃত্যুর হার কমে যায়, বেড়ে যায় বাল্যবিবাহের হার। আর এরপরই তাদের উপর নেমে এল চরম অভিশাপ।

আলুর উপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল আইরিশরা যে ৩৩ শতাংশ জনগণের বাঁচা মরা নির্ভর করত আলুর ফলনের উপরে। ১৮৪৫ সালে ডাউনি মিলডিউ বা নাবি ধ্বসা নামে এক ছত্রাকবাহী রোগে খেতের পর খেত শেষ হয়ে গেল। এই ছত্রাকের উপদ্রবে ধ্বংস হয়ে যায় আইরিশদের প্রধান খাদ্য আলুর প্রায় এক-দ্বিতীয়াংশ জমি। এবং সেবছর সহ পরবর্তী ৭ বছরে নষ্ট হয় আরও এক-তৃতীয়াংশ জমি। সেসময় আয়ারল্যান্ডের প্রজা কৃষকেরা গ্রেট ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত হত এবং তাদের একমাত্র খাদ্যের নির্ভরশীলতা ছিল আলুর উপর। হঠাৎ এই বিপত্তিতে অসহায় হয়ে পড়ে আইরিশরা। ১৮৫২ সালের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দুর্ভিক্ষের ফলে মারা যায় প্রায় ১০ লাখ আইরিশ। এর সঙ্গে আরও ১০ লাখ মানুষ হারায় তাদের ঘরবাড়ি এবং শূন্য হাতে দেশ ছেড়ে অধিবাসী হয় অন্যত্র। মাত্র সাত বছরে নয় মিলিয়ান থেকে আয়ারল্যান্ডের জনসংখ্যা নেমে আসে চার মিলিয়নে। আর এই সব কিছু হয়েছিল একমাত্র আলুর কারণে।

বাঙালির পাতে আলু এসেছে পর্তুগিজদের হাত ধরে। ১৬ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৭ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পর্তুগিজরা বাংলার রাষ্ট্রীয় সকল কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। কলকাতা-ঢাকা-মুর্শিদাবাদের কথা যেমনই হোক, বাংলার গ্রামাঞ্চলে আলু পৌঁছেছিল অনেক পরে। বিভূতিভূষণ ‘ইছামতী’ উপন্যাসে আলু পান কলকাতায়, ওখান থেকে গ্রামে আলু নিয়ে এলে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। আলুর চেয়েও আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বা অভূতপূর্ব উপকরণ পর্তুগিজরা আমদানি করে, তা হল মরিচ আর তামাক। যা বাংলাদেশের লোক লুফে নিয়েছিল। এবং দ্রুত তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি— তিনটিও সম্ভবত পর্তুগিজরা এদেশে এনেছিল। তাই খাঁটি বাঙালি রান্নায় শুরুতেই যখন লুচি আর আলুর দম থাকে, কিংবা খিচুড়ি আর বাঁধাকপির তরকারি, তখন মজা লাগে বই কি।

বাঙালি খানায় ডাল ও শাকসবজি

ভাত কার্বোহাইড্রেট আর ডাল প্রোটিন— তাই ডালে ভাতে এক সুষম খাবারের দিশা দেখায়। বাংলায় ডাল খাওয়া খুব সম্ভব মধ্যযুগ থেকে শুরু। ডালের একঘেয়েমি দূর করতে ভিন্ন ভিন্ন ফোড়নের নির্দেশ দিয়েছেন বাঙালি রাঁধুনিরা। কাঁচালংকা, পাঁচফোড়ন, জিরে, কালোজিরে, মেথি, শুকনো লংকা, রাঁধুনি, পেঁয়াজ, রসুন— এক এক ডালে এক এক ফোড়ন। প্রাচীন বাঙালি ডাল খেত কি না তা নিয়ে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ গ্রন্থে একটি প্রশ্নচিহ্ন তুলেছেন। এক তো কোনও প্রাচীন গ্রন্থে বাঙালির ডাল খাওয়ার কোনও খবর নেই,

উপরন্তু এই অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী-কৌম সমাজের খাওয়াদাওয়ার মধ্যেও ডাল খাওয়ার চল দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে ডালের উল্লেখ না থাকলেও বড়ির উল্লেখ রয়েছে, আর কে না জানে যে বড়ি তৈরির একটি প্রধান উপাদান ডাল। তবে সে যুগে ডাল ছাড়াও বড়ি তৈরির অন্য কোনও উপকরণ ছিল কি না তা জানা যায় না। সে যাই হোক, সেকালে চল না থাকলেও পরবর্তীকালে বাঙালির রান্নায় ডাল ক্রমে একটি অতি আবশ্যকীয় পদ হয়ে ওঠে সম্ভবত দক্ষিণ থেকে সেন রাজবংশ ও উত্তর-পশ্চিম থেকে ইসলামের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই। তার প্রমাণ পাই 'ব্যঞ্জন রত্নাকর' নামক আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম রান্নার বইতে। এই বইতে ডাল রান্নার একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে, যেখানে মুদগ, অড়হর, মসুর ও কলাই ইত্যাদি ডাল রান্নার বিভিন্ন পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

ডাল-ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন সবজি খাবার প্রচলন অনেক আগের। তবে পর্তুগিজরা আসার আগে বাঙালি আলুর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। মধ্যযুগের নানা লেখা থেকে বোঝা যায়, তরকারি হিসেবে প্রধান ছিল কুমড়ো, বেগুন, ঝিঙে, থোড়, মোচা, কাঁচকলা, পটল, লাউ, ওল, কচু, মুলো, শিম আর নিমপাতা। সেকালে 'শুক্তা' রান্না করা হত— বেগুন, কাঁচা কুমড়ো, কাঁচকলা, মোচা এই সবজিগুলি গুঁড়ো বা বাটা মশলা অথবা বেসনের সঙ্গে বেশ ভালো করে মেখে বা নেড়ে নিয়ে ঘন 'পিঠালি' মিশিয়ে। পরে হিং, জিরা ও মেথি দিয়ে ঘিয়ে সাঁতলিয়ে নামাতে হত। কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃতে' সুকুতা, শুকুতা বা সুক্তা বলতে একধরনের শুকনো পাতাকে বলা হয়েছে। এটি ছিল আম-নাশক। সম্ভবত এটি ছিল শুকনো তিতো পাটপাতা। রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর জন্য নীলাচলে যেসব জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে এই দ্রব্যটিও ছিল। আবার 'সুকুতা' বলতে সেই সময় শুকনো শাকের ব্যঞ্জনকেও বোঝাত। পদ্মপুরাণে বেহুলার বিয়ের নিরামিষ খাবারের মধ্যে শুক্তোর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও বাইশ রকমের নিরামিষ পদের মধ্যে শুক্তুনিকে পাওয়া যায়।

বাঙালির আনুষ্ঠানিক ভোজে নাকি খাদ্য অপচয়ের চূড়ান্ত হত— এমন কথা লিখে গিয়েছেন চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং। তাঁর দেখা ব্যঞ্জনের তালিকায় রয়েছে দই আর রাই সরষে দিয়ে রান্না করা পদ। যা খেয়ে অতিথিদের মাথা ঝাঁকাতে ও মাথা চাপড়াতে হত তীব্র ঝালের আক্রমণে। একটু অতীতে ফেরা যাক। নবম ও দশম শতকে বাংলা সমৃদ্ধ ছিল হরেক রকমের শস্য-ফলে। এ অঞ্চলের মাটিতেই জন্মেছে ৪০ ধরনের ধান, ৬০ রকমের ফল আর ১২০ প্রজাতির বেশি শাকসবজি। এর মধ্যে ছিল শশা, গাজর, বিভিন্ন ধরনের লাউ, বেগুন, রসুন, মেথি, মুলা, মাশরুম, ইত্যাদি।

শুক্তোর পরেই আসে শাকের কথা। শাক খাবারে স্বাদ বাড়ায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে, রক্তাল্পতা দূর করে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ভাতের সাথে আহার্য কিছু খাদ্যের খোঁজ পাওয়া যায়। যেমন-

'নটে রাঙা তোলে শাক পালঙ্গ নলিতা
তিক্ত ফল তাঁর শাক কলতা পলতা
সাঁজতা বনতা বন পুঁই ভদ্র পলা
নটুয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে
মহুরী শুলকা ধন্যা ক্ষীর পাই বেটে।'

বিভিন্ন দেশীয় শাকপাতাও ভাতের সাথে খাওয়া হত। কখনও ভর্তা, কখনও বা ঝোল-তরকারি। টক দই খাওয়ারও বেশ প্রচলন ছিল ভাতের সাথে বা আহার শেষে। তবে সবজি ছাড়াও আরও একটা পদ এর সঙ্গেই এসে পড়ে, তা হল ছানা। ছানার ডালনা একটি অতি প্রাচীন বাঙালি পদ, যা বহু যুগ ধরে বাঙালির রসনাকে তৃপ্ত করে আসছে। পনিরের সঙ্গে এর তফাত অনেক। যদিও আজকাল ছানার ডালনা প্রায় উঠেই গেছে। এসেছে শাহি পনির বা চিলি পনির। পনিরের আবিষ্কার অবশ্য নেহাতই দুর্ঘটনা। আজ থেকে আট হাজার বছর আগে পশুপালকরা বাড়তি দুধ রাখত পশুর পাকস্থলী দিয়ে তৈরি থলেতে। পশুর পাকস্থলীতে রেনেট নামে এক এনজাইম থাকে। একবার নাকি এক থলেতে এমন কিছু এনজাইম ছিল, যা দুধকে কেটে পনির বানিয়ে দিয়েছিল। তবে পনির নিতান্তই হালের বাঙালি খানা। বিশ বছর আগেও এর নাম তেমন শোনা যেত না।

স্যালাডের রকমফের

গোল করে কাটা শসা, সঙ্গে টমেটো আর পেঁয়াজের কুচি। ব্যস হয়ে গেল বাঙালির স্যালাড। উঁহুঁ মশাই, ভুল করেন। নুনই তো ছড়ালেন না। আর আলুনি হলে এ জিনিস আর যাই হোক স্যালাড না। স্যালাড শব্দের উৎস ল্যাটিন শব্দ স্যাল, যার মানেই হল নুন। 'Oxford Dictionary of Food and Drink in America' জানাচ্ছে বিশ্বকে দেওয়া রোমান সাম্রাজ্যের সেরা দান নাকি এই স্যালাড। কাঁচা শাকপাতাকে নিয়ে তেল আর নুনে জারিয়ে তৈরি হত রোমান স্যালাড। এই স্যালাড ব্রিটিশদের মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে গেছিল যে ১৬৯৯ সালে জন এভেলিন 'Acetaria : A Discourse on Sallets' বলে স্যালাড নিয়ে গোটা একখানা বইই

লিখে ফেলেছিলেন। স্যালাড নিয়ে দারুণ একখানা কবতে ১৮০৮ সালে লিখে ফেলেছিলেন ইংরেজ পুরোহিত সিডনি স্মিথ। গোটাটা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

Recipe for a Salad

To make this condiment your poet begs

The pounded yellow of two hard-boil'd eggs;

Two boiled potatoes, passed through kitchen sieve,

Smoothness and softness to the salad give.

Let onion atoms lurk within the bowl,

And, half-suspected, animate the whole.

Of mordant mustard add a single spoon,

Distrust the condiment that bites so soon;

But deem it not, thou man of herbs, a fault

To add a double quantity of salt;

Four times the spoon with oil of Lucca crown,

And twice with vinegar procur'd from town;

And lastly o'er the flavour'd compound toss

A magic soup on of anchovy sauce.

Oh, green and glorious! Oh, herbaceous treat!

Twould tempt the dying anchorite to eat;

Back to the world he'd turn his fleeting soul,

And plunge his fingers in the salad-bowl!

Serenely full, the epicure would say,

`Fate cannot harm me, I have dined today.

মেরি, কুইন অফ স্কট নাকি খাবারের সঙ্গে সেলেরি পাতা আর ডিমসেদ্ধ মেশানো স্যালাড খেতে বড্ড ভালোবাসতেন। বিভিন্ন বিখ্যাত স্যালাডের জন্য এদিক-ওদিক উঁকি মেরে বেশ কটা নাম আর তাদের ইতিহাস জানা গেল।

সিজার স্যালাড-এর সঙ্গে সম্রাট সিজারের কোনও সম্পর্ক নেই। এই স্যালাডের আবিষ্কর্তা মেক্সিকোর তিজুয়ানা শহরের এক রেস্তোরাঁ মালিক: সিজার কার্দিনি। স্বয়ং সিজারের মেয়ের

বক্তব্য অনুযায়ী, ৪ জুলাই ১৯২৪-এ রেস্তোরাঁতে এত ভিড় হয়েছিল যে রেস্তোরাঁর হেঁশেলে সবজি কম পড়ে গিয়েছিল। বেগতিক দেখে অবস্থা সামাল দিতে হাতের কাছে যা সবজি আর ড্রেসিং ছিল, তাই দিয়ে এক পাঁচমিশেলি স্যালাড বানিয়েছিলেন সিজার সাহেব, আর তাড়াহুড়ো করে বানানো সেই স্যালাড ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল রাতারাতি, আর তার নামকরণ করা হয়েছিল সিজার সাহেবের নামে। আবার সিজারের রেস্তোরাঁর এক অংশীদারের বক্তব্য : রোমেইন, রসুন, প্যামেসান চিজ, সেদ্ধ ডিম, অলিভ তেল, উস্টারশায়ার সস দিয়ে তৈরি সিজার স্যালাডের আসল নাম অ্যাভিয়েট্রস স্যালাড, আর তা বানানো হয়েছিল সান দিয়াগোর এক আমেরিকান পাইলটের সম্মানে। সিজারের রেস্তোরাঁ এই স্যালাডকে জনপ্রিয় করে, আর সময়ের সঙ্গে এর নাম বদলে হয় 'সিজার স্যালাড।'
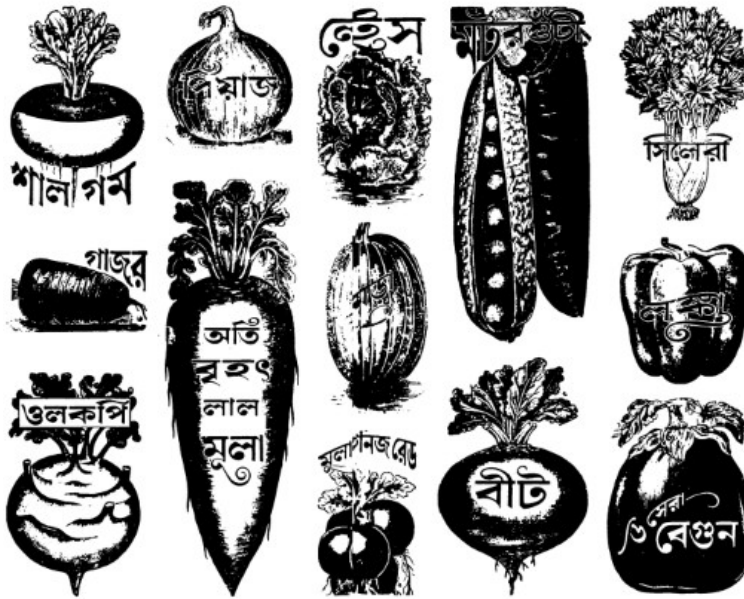
পুরাতন পঞ্জিকায় সবজির বিজ্ঞাপন

কব্ব স্যালাড— বব কব্ব ১৯২৬ সালে তাঁর লস অ্যাঞ্জেলেসের রেস্তোরাঁয় রান্না করতে করতে বেঁচে যাওয়া অ্যাভোক্যাডো, সেলেরি, টমেটো, সেদ্ধ ডিম, চিকেন, রকফোর্থ চিজ আর বেকন দিয়ে এই স্যালাড বানান। এই রেস্তোরাঁ আজও চালু— এখন এর নাম ব্রাউন ডার্বি।

পটেটো স্যালাড— ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপকে আলুর সঙ্গে পরিচয় করান স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা আমেরিকা থেকে ফিরে, আর পটেটো স্যালাড তাঁরাই বানাতে শেখান। প্রথম

জমানায় পটেটো স্যালাড তৈরি হত ওয়াইন-এ আলু সেদ্ধ করে— ভিনিগারে আলু সেদ্ধ করে পটেটো স্যালাড বানানো শুরু হয় অনেক পরে।

গ্রিক স্যালাড— এর নামকরণে কী করে 'গ্রিক' শব্দটা প্রবেশ করল, সেটা বেশ রহস্যের। কারণ, কোনোভাবেই গ্রিক স্যালাড খানদানি গ্রিক রান্না-ঘরানার মধ্যে পড়ে না। কারণ গ্রিক স্যালাডের মূল উপাদান 'টমেটো', সেটা গ্রিসে প্রবেশই করেছে হালে উনিশ শতকে।

ওয়ালডর্ফ স্যালাড— সেলেরি আর আপেল মেশানো এই স্যালাড ১৮৯৩ সালে ওয়ালডর্ফ হোটেলের রেস্তোরাঁয় প্রথম পরিবেশন করা হয়। ১৮৯৬তে "The Cook Book by 'Oscar' of Waldorf" প্রকাশ পেলে আমেরিকার ঘরে ঘরে এই স্যালাড বানানো শুরু হয়। এতটাই বিখ্যাত এই স্যালাড যে কোল পোর্টারের বিখ্যাত গান "You're the top"-এ গায়ক প্রেমিকাকে দুনিয়ার সেরা সব জিনিসের সঙ্গে তুলনা করছেন— মোনালিসার হাসি, ফ্রেড অ্যাস্টায়ারের নাচ, মিকি মাউস, মহাত্মা গান্ধি এবং... ওয়ালডর্ফ স্যালাড।

রবি ঠাকুরও স্যালাড খেয়েছেন দেখতে পাই। ১৯১৩ সালে কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগের বছর ১৯১২ সালে লন্ডনে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি, লন্ডন। সেদিনের খাদ্যতালিকা হয়েছিল কবির পছন্দে। এই খাবারের তালিকায় ছিল: গ্রিন ভেজিটেবল স্যুপ, ক্রিম অব টমেটো স্যুপ, স্যামন ইন হল্যান্ডেন সস অ্যান্ড কিউকাম্বার, প্রি সলটেড ল্যাম্ব উইথ গ্রিন ভেজিটেবল, রোস্ট চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, গ্রিন স্যালাড ও আইসক্রিম। এ ছাড়া রানী চন্দের লেখাতে দেখি মাঝে কিছুদিন তিনি কাঁচা শাকসবজি শুধু নুন ছড়িয়ে খেতেন। এ স্যালাড নয় তো কী?

এবার কয়েকটা ড্রেসিং-এর কথা বলি। স্যালাডের ড্রেসিং অগুনতি হলেও মূলত দুভাগে তাকে ভাগ করতে পারেন— ভিনিগ্রেত এবং ক্রিমি। ভিনিগ্রেত হল তেল ও ভিনিগারের মিশ্রণ। আর ক্রিমি স্যালাড ড্রেসিংয়ে থাকে বাকি নানা উপকরণের মিশ্রণ। ক্রিমি ড্রেসিংয়ের বেস কিন্তু সাধারণত মেয়োনেজ, দই কিংবা সাওয়ার ক্রিম হয়। গ্রিন গডেস ড্রেসিং বানানো হয়েছিল সানফ্রান্সিসকোর প্যালেস হোটেলে ১৯২০-তে, অভিনেতা জর্জ অ্যালিস-এর সম্মানে। তিনি সেখানে থাকতেন 'দ্য গ্রিন গডেস' নাটকে অভিনয় করার সময়। সবুজ অলিভ, গোলমরিচ, আচার, পেঁয়াজ,আর সেদ্ধ ডিম দিয়ে তৈরি টকমিষ্টি থাউজেন্ড আইল্যান্ড ড্রেসিং-এর নামকরণ হয়েছিল সেন্ট লরেন্স নদীর থাউজেন্ড আইল্যান্ডসকে মনে রেখে। ডিমের কুসুম আর তেল দিয়ে তৈরি মেয়োনিজ ড্রেসিং তৈরি হয়েছিল ১৭৫৬ সালে ফরাসিদের স্পেনের

অধীন মিন্‌রকা দ্বীপের মেয়ন শহর জয় করার আনন্দ উদ্‌যাপন করতে। এই যুদ্ধে ফরাসি ফৌজের সেনাপতি ছিলেন রিচেলিউ’র ডিউক। এই ডিউক ছিলেন ভোজনরসিক, খাওয়াতেও ভালবাসতেন। তাঁরই শেফের হাতে প্রথম তৈরি হয়েছিল মেয়নিজ ড্রেসিং। রিচেলিউ’র ডিউকের ভোজের পোশাকবিধি ছিল অনন্য। উলঙ্গ হয়ে সেই ভোজসভায় খেতে যেতে হত!

মাছের কথা

ভাতে মাছে বাঙালি

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর 'মাছ আর বাঙালি' বইতে বাঙালির মাছ খাবার ইতিহাসের এক দারুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগের রান্নার বর্ণনায় জিরে লবঙ্গ দিয়ে কই, মরিচ দিয়ে চিতল মাছ, মাগুর মাছের ঝোল, মানকচু দিয়ে শোল মাছ, সবজি দিয়ে রুই মাছের কথা পাই।

নীহাররঞ্জন তাঁর বইতে লিখছেন পাহাড়পুর আর ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলোতে অবধি নাকি 'মাছ কোটা এবং ঝুড়িতে মাছ ভরিয়া হাটে লইয়া যাওয়ার দুটি অতি বাস্তব চিত্র' আঁকা আছে। বাঙালি বিয়ে মাছ ছাড়া হয় না। বিয়ের তত্ত্বে সিঁদুরমাখা জোড়া রুই যায়। মুখে তার পান গোঁজা। বিয়ের পর কনে বাড়িতে এলেই তার হাত দিয়ে পুকুরে ল্যাটা মাছ ছেড়ে দেওয়া হত। আবার সেই কনেই একদিন অন্তঃসত্ত্বা হলে রুই মাছের ল্যাজা দিয়ে তাকে পরমান্ন খাওয়ানো হয়। এমনকি মিষ্টির ছাঁচেও মাছের ছাপ। মাছ আছে আলপনাতেও। বাংলা প্রবাদে মাছ যে মেয়েদেরও হার মানিয়েছে, তার পাথুরে প্রমাণ দিয়েছিলেন ড. সুশীলকুমার দে, তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' বইতে। বাংলার প্রচলিত ছড়াতেও পাই, 'মাছ কাটলে মুড়ো দেব/ ধান ভানলে কুড়ো দেব।'

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধদের প্রভাবে বাংলায় মাছ খাওয়া বা প্রাণীহত্যা কিছুদিন থমকে ছিল। কিন্তু বাঙালিকে বেশিদিন ভেগান রাখবে এমন সাধ্য কার? ব্রাহ্মণরা নিদান দিলেন আমিষ খাওয়া দোষের না। শুধু দিন আর বার-তিথি মেনে কয়েকদিন না খাওয়াই ভালো। বৃহদ্ধর্মপুরাণে রুই, পুঁটি, শোল সহ আঁশযুক্ত মাছ খেতে বলা আছে।

বাংলা সাহিত্যে একেবারে শুরুর দিন থেকে মাছের রমরমা। চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে সংকলিত অপভ্রংশ-অবহট্ট কবিতাসংকলন 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'-এ আছে—

ওগগর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গায়িক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।
মোইণি মচ্ছা

নালিচ গচ্ছা।

দিজ্জই কন্তা

খাই পুনবন্তা।।

মানে যে নারী স্বামীকে কলাপাতায় গাওয়া ঘি, গরম ভাত, মৌরলা মাছ আর নালিতা শাক পরিবেশন করেন তাঁর স্বামী পুণ্যবান (এটা তখনকার কথা। আজকের স্বামীরা পুণ্যবান হবার চক্করে এসব করাতে যাবেন না আবার!)(উৎস সুকুমার সেন)। নৈষধ কাব্যে নল আর দময়ন্তীর বিয়ের মেনুতে নানারকম মাছের কথা আছে। মঙ্গলকাব্যে তো মাছ রান্না রীতিমতো রেসিপি মেনে বলা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার মাছ রান্না নিয়ে লেখা আছে—

বড় বড় কৈ মৎস্য ঘন ঘন আঞ্জি

জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি।।

বেত আগ বালিয়া চুঁচুড়া মৎস্য দিয়া।

সুকৃত ব্যঞ্জন রান্ধে আদা বাটা দিয়া।

ধর্মকেতুর বউ নিদয়া অরুচি দূর করতে কুসুম বড়ি দিয়ে মাছের চচ্চড়ি খেতে চান। খুল্লনা 'কই ভাজে গন্ডা দশ/ মরিচাদি দিয়া আদারসে' বা 'রোহিত মৎস্যের ঝোল/ মানকড়ি মরিচে ভূষিত।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন বাংলায় শেষদিকে বৌদ্ধরাও নাকি হিন্দুদের দেখাদেখি মাছ রান্নায় প্রবৃত্ত হন। মাছের তেলের বড়া, ছ্যাঁচড়া নাকি তাঁরাও তৃপ্তি করেই খেতেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অবশ্য এ ব্যাপারে সেরা। সেখানে আঠেরো রকম মাছ রান্নার বিস্তারিত পদ্ধতি ধাপে ধাপে লেখা আছে। এর পরের আমলের কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি তো তোপসে মাছ নিয়ে এতটাই অবসেসড ছিলেন যে একটা গোটা কবিতা লিখে ফেলেছিলেন তোপসে নিয়ে—

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায়।

গালভরা গোঁফ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥

মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।

মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥

পাখি নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।

সুমধুর মিষ্ট রস সব-অঙ্গে মাখা॥

একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।

আর কিছু মুখে নাহি ভালো লাগে তার॥

গলদা চিংড়ি নিয়েও কবির একটা খাসা কবিতা আছে। চিংড়ি নাকি মাছ না। জলের পোকা। ইংরাজিতে ব্রিটিশরা যাকে বলেন প্রন, মার্কিনরা তাঁকেই শ্রিম্প নামে ডাকেন। এ ছাড়াও আছে বড়ো বড়ো লবস্টার। বাংলায় অবশ্য পান্তা দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝালচচ্চড়ি খাওয়ার রেওয়াজ অনেকদিনের। রামকানাইয়ের বড়ো ভাইয়ের শেষ অবস্থায় তাঁর স্ত্রী এই মেনুটাই খচ্ছিলেন, মনে করে দেখুন। গোপাল ভাঁড় সেই কিপটে পিসিকে জব্দ করতে লাউয়ের ঘণ্টে কেমন চিংড়ি ভাজা ফেলে দিয়েছিলেন, সে গল্প তো সবার জানা। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত তিন জাতের চিংড়ির চাষ হয়। বাগদা, গলদা ও চাপড়া। আন্তর্জাতিক বাজারে বাগদা-চাপড়ার কদর সবচেয়ে বেশি। বিদেশের চাহিদা মেটাতে গিয়ে রাজ্যে চিংড়ি উৎপাদনও দিন দিন বেড়েছে। এখন রপ্তানি মার খাওয়ায় সেই উৎপাদন 'বাড়তি' হয়ে যাচ্ছে, ফলে ইদানীং খুচরো বাজারেও বাগদা-চাপড়ার 'ঢল' নেমেছে। বাঙালির অতীব প্রিয় খাদ্য চিংড়ির মালাইকারি। এই মালাইকারির 'মালাই' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে এই নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ মালাইকারিতে মালাই থাকে না। এ ব্যাপারে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেছিলেন — "...মালাই আসলে ফরাসি বালাহ থেকে এসেছে, যার অর্থ ঘন দুধ, ক্ষীর বা সর... কিন্তু চিংড়ির মালাইকারিতে মালাই তো থাকেই না। আসল কারণ অন্য। মালয় প্রদেশ থেকে আসা নারিকেল সমৃদ্ধ দক্ষিণী এই রান্নার প্রথম নাম ছিল 'মালয় কারি', যা ধীরে ধীরে মালাইকারি নাম নিয়েছে।" অনেকে আর-এক ধাপ এগিয়ে বলেন এই কারি নাকি কারিপাতা থেকে এসেছে। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে সনকার রান্নাঘরে উঁকি মারলে দেখা যায়—

'ভিতরে মরিচ-গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সূতা।
তৈলে পাক করি রান্ধে চিংড়ির মাথা।'

আবার দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গলেও পাই 'বড় বড় ইঁচা মৎস করিল তলিত।' চণ্ডীমঙ্গলের খুলনা চিংড়ির বড়া বা অন্নদামঙ্গলের পদ্মমুখী 'চিঙ্গরির ঝোল' রান্না করছেন বলেও দেখতে পাই। বাঙালির কবিতায় চিংড়ি সেভাবে না দেখা গেলেও কালীঘাটের পটে চিংড়ি হাতে বাঙালি আর চিংড়ি মুখে বিড়াল তপস্বী চিংড়িকে অমর করেছে।

চিংড়ি হাতে বাবু। পূর্নেন্দু পত্রী

তবে বাঙালি এত কায়দায় না গিয়ে ভাত আর মাছের ঝোল পেলে আর কিছু চায় না। ফরাসি রান্নায় যেমন অমলেট বানানো এক কেতা, এখানে তেমনি কিছুদিন আগেও মেয়ে দেখতে গেলে সম্ভাব্য শ্বাশুড়িমাতার কমন প্রশ্নই ছিল মাছের ঝোল কীভাবে রাঁধতে হবে? বিধানচন্দ্র রায় নাকি বলতেন রোজ একবাটি মাছের ঝোল আর ভাত কেউ খেলে তার আর কোনও চিন্তা নেই। 'চোখের বালি'তে বিহারী তার মাসিমা রাজলক্ষ্মীর রাঁধা মাছের ঝোলের কত যে গুণগান করেছে, তা বই না পড়লে বোঝা যায় না। ইলিশ নিয়ে বাঙালির বাড়াবাড়ি চিরকাল ছিল, আজও আছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ইলশে গুঁড়ি' কবিতা লিখেছেন, বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,

রাত্রি শেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে

জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসে মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এল বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

যতীন্দ্রমোহন দত্তের লেখা 'কালবোস মাছ' নামের প্রবন্ধে আছে, বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ গ্রামে কালী বসু নামে এক মেছো ভদ্রলোক বাস করতেন। তাঁর চার-পাঁচটা দিঘি ছিল, আর সেই দিঘিতে প্রচুর মাছ চাষ হত। শাজাহান বাদশার সময় এক মুসলমান রাজকর্মচারীর থেকে খবর পেয়ে তিনি গোদাবরীর তীর থেকে নতুন একধরনের মাছের ডিম নিয়ে এসে নিজের দিঘিতে ছাড়েন। সেই মাছ বড়ো হলে 'যে চাহিত তাহাকেই বিলাইতেন।' এই মাছ কালী বসুর মাছ বা কালবোস মাছ নামে খ্যাত হয়।
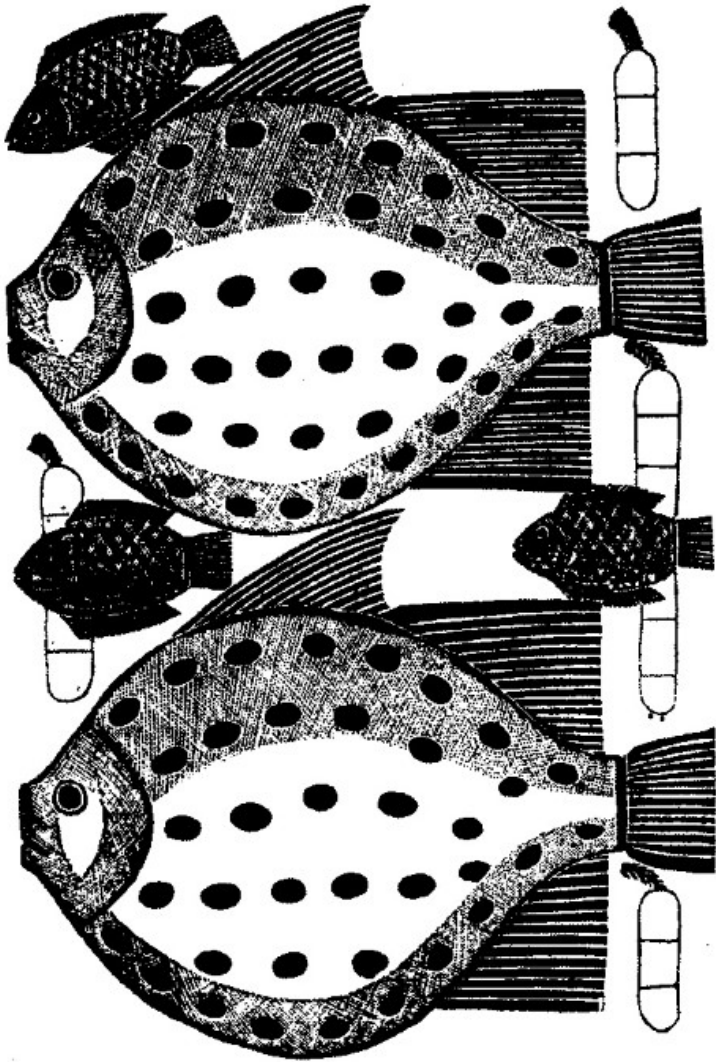
পুরনো কাঠখোদাইতে মাছ

সব লেখা রবি ঠাকুরকে দিয়ে শেষ না করলে শুদ্ধ হয় না। তাই এই আলোচনার শেষটাও তাঁকে দিয়েই করি। তিনি যে ছোটোবেলায় ‘মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে’ লিখে মাছের গুণগান শুরু করেছিলেন, তা জীবনের শেষ অবধি বিদ্যমান ছিল। মাছ না ভালোবাসলে কে শুধু ছন্দ বোঝাতে লেখেন ‘পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে’!

জানি অতি অল্প হইল। কিন্তু এই বিষয়ে এখানেই ইতি টানি।

বোম্বের হাঁসফাঁস

শুঁটকি হিসেবে যত মাছ বিখ্যাত, তাদের একেবারে সামনের সারিতে থাকবে লটে মাছ। বাঙালরা যাকে আদর করে ডাকেন লইট্যা। উরচেস্টার সস মাখিয়ে এই শুঁটকি খাওয়া এখন পশ্চিমে এক অনন্য ডেলিকেসি। এখানেও তো ঝুরো থেকে চপ, টাটকা থেকে বাসি সবরকম শুঁটকি আমাদের প্রিয়। ইংরাজিতে এই মাছের নাম বোম্বে ডাক। কিন্তু এমন অদ্ভুত নাম কেন? এ নিয়ে নানা কথা প্রচলিত। কেউ বলেন এই মাছ ভারতের পশ্চিমঘাটে পাওয়া যেত। সেখানে এর নাম বোম্বিল। বোম্বে নামটাও নাকি এই বোম্বিলেরই দান। হতে পারে। তবে ডাক কেন? হাঁসের সঙ্গে এর কীসের মিল?

ইদানীং অবশ্য একটা জবরদস্ত কারণ পাওয়া গেছে। এই ডাক হাঁসের ডাক না। বোম্বে থেকে মেল ট্রেনে চেপে সারা ভারতে এই শুঁটকি মাছ রপ্তানি করা হত। বোম্বের মেল ট্রেনকে বলা হত বোম্বে ডাক (ডাকঘর অর্থে)। আর এই মাছের এমন সুবাস, যে সেই ট্রেনে আসা সব চিঠি, কাগজ, পত্রিকায় এই মাছের সৌরভ লেগে থাকত। ধীরে ধীরে সেই ট্রেনের নামেই এই মাছের নাম হয়ে গেল বোম্বে ডাক।

মারিওর আঁকা মাছের বাজার

১৯৯৭ সালে শুধু ব্রিটেনে প্রতি বছর বারো টন লটে শুঁটকি রপ্তানি হত। এমন সময় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আইন করে শুঁটকি রপ্তানি দিলেন বন্ধ করে। এ থেকে নাকি রোগ ছড়াতে পারে। ব্রিটেনে হাহাকার। শুরু হয়ে গেল 'সেভ বোম্বে ডাক' ক্যাম্পেন। মোমবাতি মিছিল হয়েছিল কি না জানি না অবশ্য। চাপে পড়ে কমিশন ছাড় দিলেন আর ব্রিটিশরাও শুঁটকি খেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

রেড হেরিং-এর আসল কথা

গোয়েন্দা গল্পের পাঠকদের নতুন করে বলার কিছু নেই, যারা জানেন না, বলি, রেড হেরিং মানে ভুল ক্লু দিয়ে গোয়েন্দা বা পুলিশ (এবং পাঠককেও) ভুল পথে চালিত করা। কিন্তু ইংরাজি শব্দবন্ধে এমন মেছো শব্দ এল কীভাবে? অষ্টাদশ আর উনিশ শতকে গোটা ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি ধরা হত হেরিং মাছ। সেই মাছ সংরক্ষণের জন্য মাছকে নুন মাখিয়ে ধোঁয়া দিয়ে রাখা হত, যাতে বেশ কয়েক হপ্তা পরেও তা খাওয়ার উপযোগী থাকে। এই ধোঁয়ার ফলে মাছে গাঢ় বাদামি-লাল একটা রং দেখা যেত আর মাছ দিয়ে তীব্র একটা গন্ধ বার হত যাতে অন্য গন্ধ আর নাকে আসত না।

১৮০০ সালের মাঝামাঝি গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে শিয়াল শিকারের মোচ্ছব লাগে। দলে দলে শিকারিরা তেজিয়ান সব কুকুর নিয়ে ফক্স হান্টিং করতে যেত। শৃগালপ্রেমী কিছু মানুষ আগেভাগেই বড়ো বড়ো হেরিং-এর টুকরো নিয়ে বনের নানা জায়গায় লুকিয়ে রাখত, ফলে কুকুররা শিয়ালের গন্ধ না পেয়ে সেই লাল হেরিং-এর দিকেই ছুট লাগাত। কত শিয়ালের প্রাণ যে এভাবে বেঁচেছে তার ইয়ত্তা নেই। ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে আইন করে শিয়াল শিকার বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু শব্দটা রয়ে গেল।

শুশি মানে কি কাঁচা মাছ?

ইদানীং কলকাতাতেও বেশ কিছু জায়গায় শুশি পাওয়া যাচ্ছে। আর অনেকেকেই বলতে শুনছি তাঁরা কাঁচা মাছ খেতে পারবেন না, তাই শুশি তাঁদের নাপসন্দ। সবিনয়ে জানাই শুশি মানে কাঁচা মাছ না, সেটাকে বলে সাসিমি। জাপানি এই রান্নায় একেবারে সদ্য কাটা মাছের ফালি দেওয়া হয়। সাসি মানে ফুটো করা আর মি মানে মাংস। শুরুতে মাছের মাথায় একটা লোহার কাঁটা বিঁধিয়ে মারা হত, সেই থেকেই এই নাম। জাপানে লাইভ সাসিমি রেস্তোরাঁও আছে, যেখানে আপনি আঙুল দিয়ে ভেসে বেড়ানো মাছকে দেখিয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা

কেটে হাজির করবে। সেই মাছে সাদা মুলো, ওয়াসাবি পেস্ট আর সয়া সস মিশিয়ে দিব্যি খান জাপানের মানুষ।

শুশি অবশ্য কাঁচা না, গেঁজানো মাছ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মাছকে সংরক্ষণের পদ্ধতি ছিল ভাতের মধ্যে রেখে দেওয়া। মাছ কেটেকুটে, নুন দিয়ে, পরিষ্কার করে, কাঁটা ছাড়িয়ে চটচটে ভাতের মধ্যে রেখে দেওয়া হত। শুশি মানে টক। খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেকদিন রেখে দেওয়ার পর সেই মাছে একটা টক টক স্বাদ আসতই। প্রথমদিকে খাবার সময় উপরের ভাতটা ফেলে দেওয়া হত। চতুর্দশ শতক থেকে জাপানিরা সেই ভাতটাও ফেলত না। ভাত মেশানো এই মাছ সেসি-শুশি নামে বিখ্যাত হয়ে যায়।

কিন্তু সেসি শুশির চেয়ে নিগিরি শুশি এখন অনেক বেশি চলে। ইয়োহি হানায়া নামে এক মুদির ছেলে ১৮১৮ সালে টোকিওতে গিয়ে একটা ফাস্টফুডের দোকান খোলেন। প্রচলিত সেসি শুশির ভাতকে চেপে আঙুলের মাপের রোলের আকার দেন তিনি (নিগিরি মানে চেপে দেওয়া)। তারপর প্রতি রোলের উপরে সাজিয়ে দেন এক টুকরো গেঁজানো, টক মাছ। এভাবে শুশি খাওয়া অনেক সহজ। একবারে মুখে পুরে নেওয়া যায়। খবর গোটা জাপানে ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যায় এই নিগিরি শুশি বেচেই নাকি হানায়ার ব্যবসা ফুলেফেঁপে ওঠে।

মাংসের তিন রকম

বাঙালির মাংস খাওয়া

ঝাল ঝাল গরগরে খাসির মাংস ছাড়া এখনও বাঙালির ছুটির দুপুর অসম্পূর্ণ। আর খাসির মাংস হলে সঙ্গে মেটে মাস্ট । ‘আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না’ গানেও মান্না দে গেয়েছেন, ‘মাংসটা ঝাল হবে মেটে হবে আশিটা।’ তবে আমাদের মাংস রান্নার রীতি মূলত মোগলাই অথবা চিনা কায়দায়। ইদানীং অবশ্য জাপানি বা ফরাসি কায়দার মাংসও বাঙালির পাতে শোভা পাচ্ছে।

ভাবদেশ ভট্ট-র একটা রচনায় পাওয়া গেছে, শুকনো মাংস খাওয়া কোনও কালেই হিন্দুদের (বাঙালি) ধর্মীয় রীতি নয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হিন্দুদের মধ্যে কিন্তু পাঁঠার মাংসের চল তেমন ছিল না। বরং অপবিত্র রেওয়াজ বলে ধরা হত। বাঙালিরাই প্রথম পাঁঠার মাংসের স্বাদ এ দেশকে চিনিয়েছে। সেসময় তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির হিন্দু ধরা হয়েছিল ধর্মের নিরিখে। কারণ, যে সংস্কারপন্থী হিন্দুরা এই বাঙালি হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণি বলতেন, তাঁরাই বলেছেন, সবচেয়ে কঠিন হল স্বাদেন্দ্রিয়কে জয় করা। শ্রীহর্ষের রচিত ‘নিষাদ চরিত’ মহাকাব্যে বারো শতকের বাঙালির খাদ্যরীতির বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই কাব্যে নল আর দময়ন্তীর বিয়ের অনুষ্ঠানে পাঁঠার সুস্বাদু ঝোলের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন, ফুল্লরা কালকেতুর জন্য বিভিন্ন পদের সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার মাংস রান্না করতেন। এই ইতিহাসকে সামনে রেখে সুকুমার সেনও তৎকালীন বাঙালির খাদ্যরীতির বিশদ গবেষণা ও বর্ণনা করেন। যদিও সেখানে পাঁঠার মাংসের ঝোল -এর পূর্ণ সম্মতি নেই। বরং কাবাব-এর প্রচলন ছিল, তার সঙ্গে তিনি সহমত। ১৫ শতকের পর থেকেই খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতির দলিল পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙালির খাদ্যপ্রীতির ঐতিহাসিক দলিল। মনসামঙ্গল কাব্যে উল্লেখ আছে, বাঙালিরা পাঁঠার মাংস আর সুরা পান করতেন। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য-এ বেহুলার বিয়ের অনুষ্ঠানে বারো রকম মাছ এবং ন-রকমভাবে পাঁঠার মাংস রান্নার বর্ণনা পাওয়া গেছে। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল-এ অকপট বলা আছে, রাজারা, এমনকি সাধুরাও পাঁঠার মাংস উপভোগ করতেন।

ঈশ্বর গুপ্ত পাঁঠার মাংসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সত্যি বলতে এই সময় থেকেই ‘নাগরিক বাঙালি’ তৈরি হতে শুরু করে। ‘ব্যঞ্জন রত্নাকর’ নামক এক অভিনব রান্নার বইয়ের প্রকাশনা

সেই সময় হয়। বর্ধমানের রাজা মহতাবচাঁদের আদেশে এই বইতে পাঁঠার মাংস রান্নার যেসব খুঁটিনাটি পাওয়া গিয়েছে, তা শাহজাহানের প্রধান রাঁধুনি নিয়ামৎ খান দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এই বইতে আঠেরো রকম কাবাব আর উনিশ রকম কালিয়ার উল্লেখ আছে। বর্ধমানের রাজারা প্রায় দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এইগুলি উপভোগ করতেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মাংসের ঝোলে আলু ব্যবহার করা হত না। শুধু তাই নয়, ঝোলে নুনও ব্যাবহার করা হত না। মনে করা হত, নুন ব্যবহার করলে রান্না অশুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে মাংস কোনও শুভ সামাজিক অনুষ্ঠানে স্থান পেত না। ১৬৫০-এর পর থেকে মুঘল এবং ইউরোপিয়ান দ্বারা বাঙালিরা খুবই প্রভাবিত হয়। অষ্টাদশ শতকে 'ভদ্রলোক বাঙালি'-র সৃষ্টি হয়। যাঁরা মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন এবং আধুনিক বাঙালির সৃষ্টি এই সময় থেকেই। পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে মাংস রান্না সেই সময় থেকে শুরু হয়। নানারকম মশলার মিশ্রণ ঘটে মাংসের ঝোলে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বামীজি চিঠিতে পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, তাঁকে পাঁঠার মাংস এবং গোমাংস দুই-ই খেতে হয়েছে। তাতে সমসাময়িক গোঁড়া হিন্দুরা রে রে করে ওঠেন। সন্ন্যাসীর পাতে আমিষ! স্বামীজির খুব কড়া ভঙ্গিমায় বলেন, "All liking for fish and meat disappears when pure sattva is highly developed." পাঁঠার মাংস খাওয়ার সমর্থনের মধ্যে দিয়ে খাদ্যরসিক বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করা না গেলেও, সাহসী এবং মুক্ত বিবেকানন্দ প্রতীয়মান। বাঙালি হিসেবে আর-একজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তিনি সত্যজিৎ রায়। রাশিয়ায় থাকাকালীন তিনি সকালে চার কাপ চা আর প্রায় এক পাউন্ড পাঁঠার মাংস 'সাম্পা' দিয়ে খেতেন। বাঙালি হিসেবে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সময় ঠাকুরবাড়িতে 'পাঁঠার বাংলা' নামক এক পদের উল্লেখ আছে। ১৯৪১ সালে, কবিগুরু মৃত্যুর ঠিক দুই বছর আগে কালিম্পং থেকে জোড়াসাঁকোতে আসেন ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর নিয়ে। এই বিশেষ পাঁঠার মাংস তাঁর খাদ্যতালিকায় ছিল। এই মেনু বাঙালির খাদ্যতালিকায় অবলুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "Do not blame the food because you have no appetite." তাঁর খুব প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ছিল কাবাব। তা ছাড়াও তিনি খুব পছন্দ করতেন আনারস দিয়ে তৈরি রোস্টেড পাঁঠার মাংস। নানান রান্নার ক্ষেত্রেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঠাকুরবাড়ির হেঁশেল ঘটিয়েছিল। পূর্ণিমা ঠাকুর 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' বইতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তবে বেশ কয়েকশো বছর আগে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নামও যখন কেউ শোনেনি, তখন হরিণের মাংস পাল্লা দিত পাঁঠার মাংসের সঙ্গে। গরু, খাসি এবং হরিণের মাংস খাওয়ার চল

ছিল মধ্যযুগ থেকেই। হরিণের মাংস খুব সুস্বাদু। চর্যাপদেও লেখা ছিল ‘আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।’ প্রাচীন সাহিত্যে তার বর্ণনা পাচ্ছি তো বটেই, বছর পঞ্চাশ আগেও সে খুব বিরল ছিল না, এমন নমুনাও মিলছে। ‘ধনিয়া সলুপা বাটি দারচিনি যত মৃগমাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত’ (দ্বিজ বংশীদাস)। ‘কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝালঝোল রসা কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সামসা’ (ভারতচন্দ্র)। ‘বাবা মহা খুশি। ডাল আর শুকনো আলু আর নিজের হাতে মারা হরিণের মাংস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছিল।’ (খেরোর খাতা/ লীলা মজুমদার)। ‘নোনা নৈশ বাতাসের চল্লিশ মাইল দূরে সুন্দরবন— এই জায়গাটা যেন সেই বাঘের জঙ্গলের ঘুমন্ত কিনারা। এইখানে একদিন হরিণের মাংস খেয়েছিলাম— চর্বির চিহ্নহীন টগবগে দৌড়বাজ লাল মাংস। ‘ (অক্ষয় মালবেরি, মণীন্দ্র গুপ্ত)।

মাংস নিয়ে লীলা মজুমদার তাঁর খেরোর খাতা-য় দারুণ এক কাহিনি বলেছেন, “খেতে ভালোবাসতেন দুই বন্ধু, খাওয়াতেও। একবার যোগীন সরকার এক সের মাংস কিনেছিলেন। দুই বাড়িতেই গিন্নিরা রাঁধতেন। যোগীন সরকারের স্ত্রী মাংস কুটে, ধুয়ে, নুন-হলুদ মাখিয়ে ঢাকা দিয়ে একটু ভেতরের দিকে গেছেন। গিরীশ শর্মা সেই সুযোগে হাঁড়িসুদ্ধ কাঁচা মাংস তুলে এনে, গিন্নিকে বললেন, ‘এটা খুব ভালো করে রাঁধ তো দেখি।’

মেজদিদি চমৎকার রাঁধতেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে খুব ভালো করে মাংস রেঁধে, উনুনের পাশে ঢেকে রেখে, চান করতে গেলেন। অমনি যোগীন সরকার রান্না মাংসটি বাড়ি নিয়ে গেলেন। এর একটু বাদেই তাঁর বড় ছেলে গিরীশ শর্মাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল, ‘তোমরা বাড়িসুদ্ধ সকলে আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে খাবে। শুনলাম দুষ্কৃতকারীরা তোমাদের রান্নাঘরে হামলা দিয়েছে।’ তারপর মধুরেণ সমাপয়েৎ।’ বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের সেরা রান্নাকেন্দ্রিক উপন্যাসের বিখ্যাত হাজারি ঠাকুর অসাধারণ পাঁঠার মাংস রাঁধতে পারত। ‘হাজারি ঠাকুর মাংস রাঁধিবার একটি বিশেষ প্রণালী জানে, মাংসে একটুকু জল না দিয়া নেপালী ধরনের মাংস রান্নার কায়দা সে তাহাদের গ্রামের নেপাল-ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর নিকট অনেকদিন আগে শিখিয়াছিল।’ (আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

তবে সে হচ্ছে প্রেশার কুকারের আগের যুগ। প্রেশার কুকার যখন আসেনি, তখন হাঁড়ি বা কড়াতেই মাংস রাঁধা হত, আর অনেক সময় সুসিদ্ধ হবার জন্যে তাতে ফেলে দেওয়া হত পেঁপে। সাধনা মুখোপাধ্যায়ের রান্নার বইয়ে ‘রোববারের আলু পেঁপে দেওয়া মাংসের ঝোল’ নামে একটি পদ পাচ্ছি। পরে পাঁঠার মাংস রান্নার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেল প্রেশার

কুকার। হৃদয়বিদারক কাহিনিটি লিখেছিলেন তারাপদ রায়, তাঁর বিখ্যাত কলাম ‘কাণ্ডজ্ঞান’-এ। সেটা দিয়েই শেষ করি।

‘কুকারে রাতের মাংস রান্না হয়েছে। সুঘ্রাণে সমস্ত বাড়ি ভরে গেছে। আমরা সবাই খেতে বসেছি, শুধু ভাত আর মাংস খাওয়া হবে। পাতে ভাত দিয়ে আমার স্ত্রী মাংস দিতে যাবে, কিন্তু কিছুতেই প্রেশার কুকার আর খুলতে পারেন না। আমি, বিজন দুজনে তাঁকে সাহায্য করতে গেলাম কিন্তু কী করে যে প্রেশার কুকারের ঢাকনার প্যাঁচ এমনভাবে আটকে গেছে কিছুতেই কিছু বোঝা যাচ্ছে না।’ তো প্রথমে ডাকা হল পাড়ার এক পিসিমাকে। তিনি এলাকায় সর্বপ্রথম এই যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাই। তিনি ব্যর্থ হওয়ায় বিজন চলে গেলেন ট্যাক্সি করে কালীঘাট থেকে নাকতলা। রাত এগারোটা নাগাদ এক প্রেশার কুকার খোলায় বিশেষজ্ঞকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে এলেন। ‘তিনি রান্নাঘরে ঢুকে প্রেশার কুকারটার চারপাশে ঘুরতে লাগলেন, তারপর একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে চক্ষু নিবদ্ধ করে কুকারটা কোলে তুলে নিলেন। এরপর শুরু হল হ্যান্ডেলকে ক্লকওয়াইজ আর পাত্রকে অ্যান্টিক্লকওয়াইজ ঘোরানোর পালা। এইরকম চলতে চলতে একসময় প্রেশার কুকারের হাতল তারাপদবাবুর হাত থেকে ছিটকে ভদ্রলোকের থুতনিতে লাগল। তিনি অতর্কিতে আহত হয়ে কুকারটি ফেলে দিলেন, সেটা পড়ল তাঁরই পায়ের ওপর।’

কাহিনি শেষ হয় এইভাবে— ‘সেদিন রাতে আমরা নুন-তেল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম এবং সেও রাত দেড়টায়।’

অভিশপ্ত ডায়না স্টেক

স্টেক শব্দটি পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের শব্দ স্টিক (steik), মধ্য ইংরেজি উপভাষায় স্টিকনা (stickna) অথবা পুরাতন নর্স শব্দ স্টিকজা (steikja) থেকে উৎপন্ন অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান মতে “রোস্টিং বা গ্রিলিং বা ফ্রাইংয়ের জন্য একটি পুরু কাটা মাংস, কখনও কখনও পাই বা পুডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়; বিশেষ করে পশুর হাড়ের অংশ থেকে কাটা হয়।” পঞ্চদশ শতকের দিকে ‘স্টিকিস’ শব্দটি প্রথম রান্নার বইয়ে দেখা যায় এবং যেখানে গোরুর মাংস বা হরিণের মাংস উভয়েরই স্টেক হিসেবে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডায়না ছিলেন রোমানদের সতীত্বের দেবী, চাঁদেরও। শিকারের দেবী হিসেবেও এঁকে মানতেন রোমানরা। আর তাই তাঁর নামেই মাংসের স্টেকের সবচেয়ে বিখ্যাত পদটি উৎসর্গ

করা হয়েছিল। রোমানরা ফ্রান্স দখল করলে (সেই সিজারের আমলে) তাঁদের হাত ধরে ডায়না স্টেক ফ্রান্সে আসে। মিষ্টি মিষ্টি স্টেকের সঙ্গে ঝাল ঝাল সস মেশানো এই খাবারকে ফরাসিরা আ লা ডায়না নাম দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে যুদ্ধরত সৈন্যদের হাত ধরে আমেরিকায় ডায়না স্টেকের প্রবেশ ঘটে। হরিণের মাংসের বদলে এখানে গোমাংস দিয়েই কাজ চালানো হত। ১৯৫০ থেকে ৬০-এর দশকে আমেরিকার সব বড়ো বড়ো হোটেলেই তাঁদের নিজস্ব ডায়না স্টেক পাওয়া যেত, আর প্রত্যেকেই দাবি করতেন এর মেনু তাঁদের নিজস্ব আবিষ্কার। ব্রাজিলের কোপাকাবানা প্যালেস হোটেল আবার এক ধাপ এগিয়ে ডিনার টেবিলেই ডায়না স্টেক বানাত। প্রথমে মাংসের টুকরোকে হাতুড়ি মেরে মেরে পাতলা চ্যাপটা বানানো হত। তারপর খদ্দেরের সামনেই গ্যাস বার্নারে মাখন দিয়ে ভাজা ভাজা করে গোটা প্যানটা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হত। সেই স্টেক শুধু চেখে দেখার না, চোখে দেখারও বটে।

ডায়নাকে নিয়ে এক রোমান পুরাণের গল্প বলে শেষ করা যাক। কাহিনি বড়োই মর্মান্তিক যদিও। একদিন অ্যাকটিওন নামে এক শিকারি একদল কুকুর নিয়ে শিকার করতে করতে জঙ্গলের মাঝে এক সরোবরে উলঙ্গ অবস্থায় ডায়নাকে স্নান করতে দেখে ফেলেন। রেগে গিয়ে ডায়না অভিশাপ দেন, ফলে তিনি একটি সুন্দর চিত্রল হরিণে পরিণত হন। এদিকে তাঁর শিকারি কুকুররা মালিককে খুঁজতে এসে হরিণকে দেখে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খায়। মানে সত্যি কথা বলতে গেলে পৃথিবীর প্রথম ডায়না স্টেক ছিলেন অ্যাকটিওন নিজে।

প্রথম কে এফ সি রেস্তরাঁ

কেএফসি আর এক অসামান্য বৃদ্ধ

একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। ইদানীং আমি আর আমার মেয়ে শপিং মলে গেলেই ভারী ভাবনায় পড়ি ফুড কোর্টে গেলে। কী খাব? কোথায় খাব? অনেক ভাবনা, আলোচনার পর, প্রতিবার আমরা কেএফসি-তেই ঢুকি। সে যাই হোক, কেএফসি-র প্রতিষ্ঠার গল্প এমন একজনের কাহিনি, যার জীবন শুরু হয়েছিল অবসরের পরেই। হারল্যান্ড স্যান্ডারস। ৬৫ বছর বয়সে তাঁর জীবনের মোড় পালটে যায় এক অদ্ভুত নাটকীয় ঘটনায়।

১৮৯০ সালে জন্ম আমেরিকার ইন্ডিয়ানা স্টেটে। আর বাড়িটা ছিল ইন্ডিয়ানার হেনরি ভ্যালি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। মাত্র ছয় বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর সংসারের সব চাপ তাঁর কাঁধে উঠে আসে। যখন তাঁর মা বাইরে কাজ করতে যেতেন, স্যান্ডারসকে তাঁর ছোটো ভাই আর বোনকে দেখেশুনে রাখতে হত। মাত্র সাত বছর বয়সেই বেশ ভালো রান্না শিখে গিয়েছিলেন তিনি। ১২ বছর বয়সে তাঁর মা নতুন বিয়ে করলে সৎবাবার আশ্রয়ে খুব বেশিদিন কাটাতে পারেননি। পরবর্তীতে একটা ফার্ম হাউজে কাজ নিয়ে চলে আসেন অনেকটা দূরে। পড়াশোনাও খুব বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারলেন না। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর প্রতিকূল পথচলা। অনেক চড়াই উতরাই পাড় করে চলে তাঁর জীবন। কখনও খেতমজুর, ট্রেনের ফায়ারম্যান, কখনও বা বিমা কোম্পানির সেলসম্যান, গাড়ির টায়ার বিক্রেতা, ফিলিং স্টেশনের কর্মচারী এবং সর্বশেষে একজন রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী।

১৯৩০ সালের দিকে স্যান্ডারস কেন্টাকিতে একটি পেট্রোল স্টেশনের পাশে বিভিন্ন ধরনের খাবার বিক্রি করতে লাগলেন। নিজেই রান্না করে বিভিন্ন সাউথ আমেরিকান খাবার পরিবেশন করতেন। ধীরে ধীরে খাবারের খ্যাতি আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে জায়গাটিকে পুরো রেস্টুরেন্টে রূপ দেন। ১৯৩৯ সালের দিকে তাঁর সিগনেচার রান্না 'ভাজা চিকেন' নতুনভাবে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি নিজেই একটি এমন প্রেশার কুকার তৈরি করে নেন যা ছিল প্রচলিতগুলোর চেয়ে আলাদা। কিন্তু এই প্রেশার কুকারে ফ্রাইড চিকেনের টেক্সচার বা মচমচে ভাবটা খুব ভালোভাবেই আসে। এর পরের দশ বছর বেশ ভালোভাবেই কাটে স্যান্ডারসের। ১৯৫০ সালে কেন্টাকির গভর্নর তাঁকে 'কর্নেল' উপাধি দেন।

কে এফ সি- র বিজ্ঞাপন

১৯৫২ সালের দিকে তাঁর এই ব্যবসা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন স্যান্ডারস। তাঁর এক ব্যবসায়িক বন্ধু পিট হারমেনের সাথে চুক্তি করেন যে তাঁর তৈরি 'Kentucky Fried Chicken'-এর প্রতিটি মূল্যের সাথে রয়্যালটি হিসেবে চার সেন্ট করে পাবেন। এই চুক্তির

ব্যাপক সাফল্যের পর সেন্ডারস আরও কিছু রেস্টুরেন্টের সাথে অনুরূপ চুক্তি করেন। সবকিছু বেশ ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ সরকারি জায়গা অধিগ্রহণের বেড়াজালে পড়ে বিশাল ক্ষতিতে বিক্রয় করতে বাধ্য হন তাঁর রেস্টুরেন্ট। হাতে পড়ে থাকে শুধুমাত্র ১০৫ ডলারের সিকিউরিটি চেকের অর্থ। কিন্তু স্যান্ডারস হার মেনে নেওয়ার পাত্র নন। তাঁর চার বছর আগে ফেলে আসা ব্যবসায়িক চিন্তাকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। গাড়ি ভর্তি করে নিলেন প্রেশার কুকার, ময়দা, মুরগি, তাঁর নিজের তৈরি রেসিপির অন্যান্য উপকরণ আর ঘুরতে লাগলেন রেস্টুরেন্ট থেকে রেস্টুরেন্ট। উদ্দেশ্য একটাই, যদি ভালো লেগে যায় তাঁর রেসিপি, তাহলেই চুক্তিবদ্ধ হবেন। কেউ শুনেই হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল, কেউ বলেছিল পাগল, আবার কেউ রেসিপি পছন্দ করেও কোনও প্রকার চুক্তি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু থেমে থাকেননি। বদ্ধপরিকর চেষ্টা একসময় সফলতায় রূপ নিল। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তাঁর চেষ্টায় প্রায় ৬০০টি রেস্টুরেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পেরেছিলেন। সেই বছরই অক্টোবর মাসের দিকে 'জেক সি মেসি' নামে একজন ধনী মানুষের কাছ থেকে তাঁর রেসিপির রয়্যালটির অধিকার কিনে নেওয়ার আবেদন পান।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর জগৎভোলানো রেসিপির স্বত্ব দুই মিলিয়ন ডলারে বিক্রয় করেন তিনি। চুক্তিপত্র অনুযায়ী Kentucky Fried Chicken কোম্পানি হিসেবে পুরো বিশ্বে নিজস্ব রেস্টুরেন্ট খুলবে এবং রেসিপির ব্যাপারে কোনও প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। স্যান্ডারস সারাজীবনের বেতন হিসেবে ৪০,০০০ ডলার পাবেন, অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হবেন এবং কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে কোম্পানির প্রচারে অংশগ্রহণ করবেন।

১৯৮০ সালের তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্যান্ডারস ছুটে বেড়িয়েছেন মাইলের পর মাইল তাঁর হাতে গড়া রেসিপির কদর আর মান দেখার জন্য। কখনও গুণাগুণের ব্যাপারে সমঝোতা করেননি। সবসময় চেয়েছেন নিজের তৈরি রেসিপি নিয়ে মানুষের মনে বেঁচে থাকতে। তাঁর চাওয়া যে সফলভাবে পাওয়াতে পরিণত হয়েছে, সময়ই তার প্রমাণ।

সস, কেচাপ এবং..

ফরাসি রান্নায় সস

SAUCE, n. The one infallible sign of civilization and enlightenment. A people with no sauces has one thousand vices; a people with one sauce has only nine hundred and ninety-nine. For every sauce invented and accepted a vice is renounced and forgiven.

অ্যামব্রোস বিয়ার্সের লেখা শয়তানের অভিধানে সসের এই দারুণ সংজ্ঞা রয়েছে। উৎস হিসেবে স্যালাডের মতো সসের মানেও নোনতা। ল্যাটিন সালসাস থেকে প্রথম অংশটা বাদ পড়ে সস এসেছে। ফ্রিজ আসার আগে বহুদিন মাছ বা মাংস রেখে দিলে তা দিয়ে বিচ্ছিরি গন্ধ বার হত। রান্নাতেও সেই গন্ধ চাপা দেওয়া মুশকিল ছিল। ভারতীয়দের ছিল মশলার সম্ভার, তারা ম্যানেজ করে নিত। বেচারা ইউরোপীয় শেফদের তাই খাবারের কটু গন্ধ ঢাকতে সস ছাড়া চলত না। রোমানরা ম্যাকারেল, টুনা, ইল ইত্যাদি মাছের নাড়িভুঁড়ি নোনাজলে গেঁজিয়ে তীব্র গন্ধের গারুম নামের এক সস বানাত। সেই মিশ্রণের উপরের অংশটা পেতেন অভিজাতরা, আর নিচের থকথকে অংশ রেখে দেওয়া হত মধ্যবিত্ত বা গরিবদের বিক্রি করার জন্য। গারুম শুধু মাত্র রান্নাতেই কাজে লাগত না। ইতিহাসে পাথুরে প্রমাণ আছে, গারুমকে চিকিৎসকরা আলাসার, পেট খারাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয়, এমনকি কুকুর কামড়ের অব্যর্থ ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করত।

চতুর্দশ শতকে ইউরোপে নুনের কারখানা (কাঠখোদাই)

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সসও ইউরোপীয় রান্নার এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হল। তবে ফরাসি রান্নায় সসের যা গুরুত্ব তেমনটা আর অন্য কোথাও নেই। ফরাসি রেস্তোরাঁতে সসিয়ের নামে

একজন আলাদা শেফ থাকেন, যাঁর কাজই হল নানারকম সস বানানো। ফরাসি রান্নায় সসের এই বাড়বাড়ন্তের পিছনে রয়েছেন ফরাসি রানি ক্যাথরিন ডি মেদিচি। ১৫৪৭ সালে রানি হয়েই তিনি স্বদেশ ফ্লোরেন্স থেকে সেরা সস-বানিয়েদের নিয়ে আসেন আর ফরাসি রান্নার খোলনলচে বদলে দেন। সসে ডিম, দুধ কিংবা অরিগানো, থাইমের মতো ভেষজের ব্যবহার ইতালীয়রাই ফরাসিদের শেখান। কিন্তু গুরুমারা বিদ্যা যাকে বলে। কয়েক বছরের মধ্যে ফরাসিরা নিত্যনতুন সসের রেসিপি বানিয়ে ইতালীয়দের চেয়ে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেন। পাঁচটি মূল ধরন তৈরি হল সসের, যাদের বলা হয় মাদার সস। এদের বিভিন্ন অদলবদলে আরও হাজার হাজার সস বানানো যায়। সংক্ষেপে এদের ধরনটা বলি—

১। বেসামেল সস— সাদা রঙের এই সস ফরাসি সম্রাটের প্রধান স্টুয়ার্ট মারকুই লুই দে বেসামেলের নামে। বানাতে লাগে মাখন, ক্রিম, ফোটানো দুধ আর ময়দা।

২। হল্যান্ডেজ সস— মাখনের মতো দেখতে আর মাখন আর ডিমের কুসুম দিয়ে তৈরি এই সসের আসল নাম ছিল ইন্সাইনি সস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে মাখন উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে মাখন আনা হত প্রতিবেশী হল্যান্ড থেকে। অতএব...

৩। এস্পানিওল সস— আগে নাম ছিল ব্রাউন সস। বানানো হত বিফ স্টক, ভেষজ, তরিতরকারি ইত্যাদি দিয়ে। পরে ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুইয়ের বিয়ে স্পেনের রানির সঙ্গে হলে স্পেনের কুকরা এই সসে টমেটো মিশিয়ে তার চরিত্রনাশ করে। ফরাসিরা তাই একে এস্পানিওল সস বলে।

৪। ভেলুতে সস— থকথকে গাঢ় সাদা এই সসে চিকেন স্টক, মাছের জুস, ডিম, ক্রিম, মাখন, ভেষজ, মানে যা যা দেওয়া যায় আর কি। ভেলুতে মানে ফরাসি ভাষায় ভেলভেটের মতো।

৫। টমেটো সস— আমাদের চিরপরিচিত। তবে ফরাসিরা এতে পেঁয়াজ, রসুন, মাংসের স্টক, তেজপাতা, লংকা, মাখন, ময়দা, শুয়োরের পেটের দিকের মাংস দিয়ে থাকে। আর হ্যাঁ, টমেটোও দেয়।

১৬৫ সালে প্রকাশিত হয় রান্নার জগতের বাইবেল ‘Le Cuisinier francois’, যাতে মহান শেফ ফ্রাসোয়াঁ পিয়ের ভার্নে নানারকম সসের বিস্তারিত রেসিপি দিয়েছেন। তবে এই সসগুলো মূলত অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাসি বিপ্লবের পর সাধারণ মানুষের খাওয়াতেও পরিবর্তন এল। রাস্তার ধারে ধারে বহু রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠল, যারা নিয়মিত ওট কুইজিন (অভিজাত খানা) বানাতেন। এঁদের অনেকেই ছিলেন রাজপরিবারের রাঁধুনি। এঁদের মাধ্যমেই

ফরাসি খানার বিশ্বজয় শুরু।

মোহোনিজ থুড়ি মেয়োনিজ রহস্য

বাজারে দুরকম মেয়োনিজ পাওয়া যায়। ডিম দেওয়া আর ডিম ছাড়া। কিন্তু এই ডিম ছাড়া মেয়োনিজকে কীভাবে মেয়োনিজ বলা চলে তা আমার অন্তত মাথায় ঢোকে না। মেয়োনিজ কথাটা এসেইছে ফরাসি ময়ো থেকে, যার মানে ডিমের কুসুম। ঘরে সহজেই বানানো যায়। ডিমের কুসুম, অলিভ অয়েল, লেবুর রস বা ভিনিগার নিয়ে খানিক ব্লেন্ডারে নাড়াচাড়া করলেই টাটকা মেয়োনিজ তৈরি।

তবে মেয়োনিজের নাম নিয়ে প্রচুর তর্ক আছে আর আছে মজার মজার গল্প। মেয়োনের ডিউক চার্লস দি লোরেন নাকি এই সসের এত ভক্ত ছিলেন যে ১৫৮৯ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে আরকোয়ার যুদ্ধে এই সস মাখানো মুরগির ঠ্যাং খেতে ব্যস্ত থাকায় তিনি যুদ্ধটাই হেরে যান। ইংরাজরা চিমটি কাটতে ভোলেন না। তাঁরা এই সসের নাম রাখেন মেয়োনিজ। আয়ারল্যান্ডে অবশ্য আর-এক গল্প চলে। সেখানকার এক জেনারেল ম্যাকমোহন নাকি এই সস প্রথম বানান। তাঁর নামেই সসের নাম রাখা হয় ম্যাকমোহনিজ আর সেটাই লোকমুখে মেয়োনিজ হয়ে গেছে। ম্যাকটা কোথায় গেল জানি না, বোধহয় ম্যাকডোনাল্ডসে বার্গার খেতে গেছে। তবে মেয়োনিজের নাম নিয়ে সেরা গল্পটা ব্রিটিশদের নিয়ে। সেটা বলতেই হবে।

পঞ্চাশের দশকে মেয়োনিজের বিজ্ঞাপন

মিনোর্কা দ্বীপকে বহুবার বহু মানুষ অধিকার করেছে। হ্যানিব্যালের নিজের ভাই মাগো এই দ্বীপ দখল করে মোহন বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন, সেও যিশুর জন্মের আগের কথা। ১৭৫৬ সালে ব্রিটিশরা এই দ্বীপ অধিকার করে। দ্বীপের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন সেনাপতি জন ব্যাং আর তাঁর তেরোটি রণতরী। ফরাসিরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদের সেনাপতি রিসেলিউ (এই ভদ্রলোক ন্যুড ডিনার পার্টি দিতেন) প্রায় ১৫০০০ সৈন্য নিয়ে দ্বীপ আক্রমণ করে ব্রিটিশদের ৩০০০ সৈন্যকে ঘিরে ফেলেই বললেন, 'চলো ডিনার করা যাক।' এদিকে মি. ব্যাং পালালেন জিব্রাল্টারে। তাঁর বিচার হল আর বিচারে প্রাণদণ্ড হল কর্তব্যে গাফিলতির জন্য। ১৯ এপ্রিল রিসেলিউ মোহন দখল করে নিয়মিত ডিনার পার্টি দিতে লাগলেন। একদিন তাঁর হেড খানসামা দেখলেন ভাঁড়ারে ক্রিম নেই। এদিকে জেনারেল বলেছেন বেসামেল সস বানাতে। না বানালে কী হবে খুব ভালো জানতেন সেই ভদ্রলোক। ভয়ে ভয়ে হাতের কাছে যা ছিল, ডিম, অলিভ তেল আর ভিনিগার দিয়েই সস বানালেন তিনি। জেনারেল খুশ। শুধু খুশ না, ফ্রান্সে ফিরে যাবার সময় তিনি এর রেসিপিও নিয়ে গেলেন, আর মোহন বন্দরকে মনে রেখে তিনি এর নাম দিলেন মোহনিজ। তারপর? কোথা থেকে কী হইয়া গেল, মোহনিজ মেয়োনিজে পরিণত হইল।

নুন আর গোলমরিচ

শুরুতেই বলে রাখি, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা শব্দটা এখন খারাপ অর্থে দেখা হলেও আসলে তা ভালোর জন্য। যুদ্ধে বা অন্য কোনও কারণে কোনও সৈন্যর আঘাত লাগলে তাঁর বন্ধুরা সেই আঘাতে প্রাথমিকভাবে নুন ডলে দিত। তাতে জ্বালা বহুগুণ বেড়ে গেলেও ঘা সারত তাড়াতাড়ি। নুনের অভ্যাস মানুষের প্রাচীনতম অভ্যাসের একটা। হাজার হাজার বছর আগে থেকে মানুষ খাবারে নুনের ব্যবহার শুরু করে। তবে তখনকার এই নুন আজকের যুগের সাগরের জল পরিশুদ্ধ প্রক্রিয়াজাত নুন নয়। তখন নুন সংগ্রহ করা হত খনি থেকে। সেই সময়ের লোকেরা নিজস্ব উপায়ে খনি থেকে নুন উত্তোলনের প্রক্রিয়া শিখে নিয়েছিল। চিনের সানশি প্রদেশের ইয়নচুনে এরকম এক খনির কথা জানা যায়। এটাই এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচাইতে প্রাচীন খনি, যেখান থেকে মানুষ মাটি খুঁড়ে নুন বের করতে পারত। বর্তমানে পোল্যান্ড, তুরস্ক, বলিভিয়া সহ আরও কিছু দেশে এখনও নুনের খনির দেখা মেলে। অস্ট্রিয়ার একটি এলাকার নাম সালজবুর্গ, যার মানে হল নুনের শহর। এই এলাকাটির সতেরো

কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে একটি নুনের খনি। হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন মিশরীয়রা নুনকে পবিত্র বলে মনে করত। তাই তারা কবরে নুন রাখত। মৃতদেহ নুন দিয়ে মাখালে তা টিকে থাকে অনেকদিন। তাই তারা মৃত মানুষের কবর দেবার সময় নুন রেখে দিত। নুনের অন্য ধরনের ব্যবহারও তখন থেকে চালু হয়ে আসছে। নুন মাখিয়ে খাবার সংরক্ষণ করার উপায় বের করেছিলেন মিশরীয়রাই। মিশরীয়রা মাছে নুন মাখিয়ে বিক্রি করত ফিনিশিয়দের কাছে। নুনের নানান ধরনের ব্যবহারের ফলে নুনের ব্যবসা অনেক জমজমাট হয়ে ওঠে। নুন বিক্রির জন্য আফ্রিকায় একটি আলাদা রাস্তা তৈরি হয়েছিল। সেই রাস্তা আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে টুয়ারেগ নামের এক জাতি বছরে প্রায় ১৫০০০ টন নুন নিয়ে যেত।

নুনের ইতিহাস কিন্তু শুধু খাওয়ায় নুনের ব্যবহার বা নুন নিয়ে বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রাচীন রোমে সৈন্যদের বেতন দেওয়া হত এই নুন দিয়ে। ইংরেজিতে 'সোলজার' মানে হল সৈন্য আর সেলারি মানে বেতন। এই দুটি শব্দ এসেছে 'সল্ট' থেকে। সেখান থেকেই শব্দটা রয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। 'কার নুন খাও' বা 'যার নুন খাই, তার গুণ গাই'-এর মধ্যেও রয়ে গেছে প্রাচীন নুন খাওয়ার তুলনাটি। তেমনি আবার 'নিমকহারামি' বলা হয় বিশ্বস্ততা হারালে বা আনুগত্যের খেলাপ করলে। অনেক ধর্মে নুন খুব পবিত্র ব্যাপার। জাপানের শিন্টোরায় যে-কোনো মানুষ বা স্থানকে পরিশুদ্ধ করতে নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক সেইজন্য সুমো কুস্তিগিরদের উপর নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

নুন যে শুধু মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে এনেছে তা কিন্তু নয়। অনেক যুদ্ধও কিন্তু এই নুনের কারণে হয়েছিল। ইতালির ভেনিস শহরের সাথে জেনোয়া নামের আর-একটি শহরের লড়াই ঘটেছিল শুধুমাত্র নুনকে কেন্দ্র করে। এই নুন নিয়ে আরও একটি মজার ঘটনা আছে। ১৮০০ সালের দিকে ইংল্যান্ডের এক জায়গায় নুন পাওয়া যায়। আর এই নুন সরবরাহ করতে গিয়েই লিভারপুল নামে এক বিশাল বন্দর গড়ে ওঠে।

১৩৪২ সালের প্রবাসী পত্রিকায় জীতেন্দ্রকুমার নাগ বাংলার লবণ শিল্প নিয়ে লিখেছেন, 'ভিক্টোরিয়ার যুগের বহু বিদেশী গ্রন্থ হইতেও আমাদের দেশের তদানীন্তন লবণ-শিল্পের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায় । মুসলমান-আমলে বহু দিন হইতে নিম্নবঙ্গে, বিশেষতঃ হিজলী প্রদেশে, বিস্তৃত ভাবে লবণ প্রস্তুত হইত। সমুদ্রতীরবাসীদের মধ্যে ইহা একটি কুটিরশিল্প হিসাবে সেদিনও পর্যাপ্ত বাঁচিয়া ছিল । মেদিনীপুর ও সুন্দরবন ছিল লবণ ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা । তাহা ছাড়া ব্যাপক ভাবে বণিক-সম্প্রদায় এই প্রদেশে লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকিতেন। খালাড়ি

হইতে অতি সহজে লবণ লইয়া যাইবার জন্য বদরওলাচরের সম্মুখ ভাগ হইতে সাঁকরাইলের নিকটবর্তী সরস্বতী নদী পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র খাল কাটা হইয়াছিল । লবণবাণিজ্যের অস্তিত্বে এই খালকে তখনকার লোকে বলিত নিমকির থলি । হিজলীতে যে-সমস্ত স্থানে লবণ-কারবার ছিল সেই স্থানকে নিমক্-মহাল বলা হইত। বাংলার শাসনকর্তা সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে এই নিমক্মহালের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবাবী আমলে হিজলীর কারবার পরিচালনা করিতেন নবাব-সরকারের অধীন কয়েক জন জমিদার । এই লবণ ছিল নবাব-সরকারের অন্যতম প্রধান আয়ের বস্তু, কারণ লবণের উপর শুল্ক বসান হইয়াছিল, যদিও অধুনা ইংরেজ-শাসকের লবণশুল্কের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। যাহা হউক, বাংলার এই ইতিহাস-বিখ্যাত ব্যবসায়ে হিজলী প্রদেশে কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, মুলতানী, ভাটির প্রভৃতি প্রাদেশিক সওদাগরগণ এখান হইতে লবণ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন।' গোলমরিচের ইতিহাসও বেশ পুরোনো। দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে তার জন্ম। কিন্তু সেই অতীত থেকেই ঝাল বলতে মানুষ গোলমরিচ ছাড়া অন্য কিছু বুঝতেন না। বেশ কিছু পরে লবঙ্গ আসে। লংকা তো সেদিনের ছোকরা। ১২১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মমি হওয়া মিশরীয় সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিস-এর নাকে গোলমরিচ গোঁজা ছিল। রাজা মারা গিয়েও প্রিয় এই মশলাকে ভুলতে পারেননি। আর সেই যুগে ভারত আর মিশরের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগ ছিল, এটাও গোলমরিচের এই ক্লু ছাড়া জানা যেত না। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমানরা তাদের সমস্ত আমদানিকে ৮৬ পাতায় লিপিবদ্ধ করেছিল— যার মধ্যে গোলমরিচও ছিল। কিন্ত মূলত ওষুধ বানাতে ব্যবহার করা সেদিনের সেই গোলমরিচ ছিল সাংঘাতিক দামি— একসময় ইউরোপে ১২ আউন্স গোলমরিচের দাম ছিল ৫০ পাউন্ড। গথরা যখন ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোম নগরী ঘিরে ফ্যালে, শান্তিস্থাপনের জন্য বিভিন্ন দাবিদাওয়ার মধ্যে ছিল তিন হাজার পাউন্ড ভারতীয় গোলমরিচ! ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে শ্যামের রাজা পনেরো হাজার পাউন্ড মূল্যের গোলমরিচ আর চন্দনকাঠ উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন চিনে, দু-বছর পরে তিনি পাঠালেন তার দশগুণ মূল্যের মালপত্র।

রানি প্রথম এলিজাবেথের আমলে শীতকালে ইংল্যান্ডের সাহেবদের খাবার বলতে ছিল শীত আসার আগে থেকে নুন মাখিয়ে রেখে দেওয়া মাংস আর শুঁটকি মাছ। আর তা খেতে হত কোনও মশলা ছাড়া— কারণ মশলা ছিল দুষ্প্রাপ্য আর নুন দুর্মূল্য। ওই দুর্গন্ধওয়ালা খাবার গলাধঃকরণ এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাহেবদের কাছে— বেঁচে থাকার তাগিদে দমবন্ধ করে সাহেবরা তা-ই খেয়েছে বছরের পর বছর। কিছুদিন পর্তুগিজদের কাছ থেকে মশলা কিনেছিল, কিন্তু মওকা বুঝে তারা মশলার দাম বাড়িয়ে দেয়। ওলন্দাজদের কাছে

মশলা কিনতে গিয়ে আরও ঝামেলা। ১৫৯৯ সালে তারা ইংল্যান্ডে গোলমরিচ বিক্রি করল পাউন্ড প্রতি তিন শিলিং দামে, আর ক-মাসের মধ্যেই তা বাড়িয়ে করে দিল আট শিলিং! অগত্যা জন্ম হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। ১৬০১ সালে ওঁরাও জাহাজ ভাসালেন ভারতের দিকে, আড়াই বছর পর ফেরত এলেন দশ লক্ষ পাউন্ড গোলমরিচ নিয়ে! আর লাভের অংশ? ১৬২০ সালে আড়াই লক্ষ পাউন্ড গোলমরিচ কিনেছিলেন পাউন্ড প্রতি আড়াই পেনি দরে। বিক্রি করেছেন এক শিলিং আট পেনি দরে! এক বার মনে করিয়ে দিই এখানে ১২ পেনি=১ শিলিং আর ২০ শিলিং=১ পাউন্ড ছিল সেই জমানার হিসেব। অর্থাৎ পরিষ্কার আট গুণ বেশি দামে! পর্তুগিজরা আর ওলন্দাজরা যতই জাহাজ ভর্তি করে গোলমরিচ ভারত বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলো থেকে ভাস্কো দা গামা-র আবিষ্কৃত পথ দিয়ে ইউরোপে পাঠাক আর টাকা কামাক, ইউরোপে গোলমরিচ তার অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। শুধু ইউরোপে নয়, চিন দেশেও কিন্তু গোলমরিচ পাওয়া যায় ভাস্কো দা গামা-র ভারতীয় গোলমরিচের দর্শন আর ডাকাতির বহু দিন আগে থেকেই। মার্কো পোলোর লেখায় পাওয়া যায় কুবলাই খান তাঁর কিন্সে শহরের জন্য দৈনিক ৯৫৮৯ পাউন্ড গোলমরিচ জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর তৃতীয় শতাব্দীর চিনা পুঁথিতে ‘হুজিজাও’ বলে গোলমরিচের উল্লেখ করা হয়েছে— যার মানে বিদেশি মরিচ।

এখানেই গোলমরিচের গল্প শেষ করা যেত, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ দত্তের দুর্গাপুজো নিয়ে একটা লেখা পেয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না, “নবমীর বলিদানের আমোদ আরও অদ্ভুত। কেবল মহিষ মেষ ছাগ কুষ্মাণ্ড ও আখ বলি নহে, তাহার পর আমোদ করিয়া গোধিকা, কপোত, মাগুরমাছ, লেবু, সুপারি এমনকি গোলমরিচ অবধি বলিদান হইত। বলিদান শেষ হইলেই শুরু হইত নৃত্য। সেই রক্তপ্লাবিত প্রাঙ্গণে মোষের মুণ্ড, আখ, লেবু, নারিকেল লইয়া কাড়াকাড়ি আর রক্তে গড়াগড়ি দেওয়া হইত।” গোলমরিচ বলিদান? ভাবা যায়!!

টমেটো কেচাপের অজানা কথা

সসের আগে কেচাপের উৎপত্তি। আর শুরুতে এর সঙ্গে টমেটোর দূরদূরান্তের কোনও সম্পর্ক ছিল না। একসময় কিন্তু টমেটোকে ভাবা হত বিষফল। খুব বেশি দিন আগে নয়, ২০০ বছর আগেও রান্নার বইতে টমেটো সসকে বলা হয়েছে ‘নোংরা, পচা আর দুর্গন্ধযুক্ত’ একটি তরল। আমেরিকাতে প্রথম টমেটো সস জনপ্রিয় হলেও বিষয়টির সূত্রপাত এশিয়ায়। চিনা নাবিকরা ‘কি-চুপ’ নামের একটি বিশেষ সস বানাতেন। সামুদ্রিক মাছের নাড়িভুঁড়ি ভালো করে পরিষ্কার

করে নুন দিয়ে মাখিয়ে জারে ভরে রেখে দিতেন চিনারা। গরমে ২০ দিন, বর্ষায় ৫০ দিন আর শীতকালে ১০০ দিন জারে ভরে রাখলেই তৈরি হয়ে যেত সস। বিষয়টি প্রথম লক্ষ করেন ইংরেজরাই। এই পদ্ধতির আদলে দেশে ফিরে অনেক রকমের সস বানায় ইংরেজরা। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মাছ আর মাশরুমের ওপরেই চলছিল সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কোনও কোনও ব্রিটিশ রাঁধুনি সসের উপকরণ হিসাবে টমেটো ব্যবহার করলেও তা জনপ্রিয় হয়নিও একটুও। প্রথম কেচাপের রেসিপি লেখেন এলিজা স্মিথ নামে এক ভদ্রমহিলা তাঁর 'কমপ্লিট হাউসওয়াইফ' বইতে। মজার ব্যাপার, সেই রেসিপিতে আরচিভো, স্যালো, ভিনিগার, সাদা মদ, আদা, নাটমেগ, গোলমরিচ, নুন, লেবুর খোসা সব থাকলেও টমেটোর কোনও উল্লেখ ছিল না। টমেটো কেচাপের রেসিপি প্রথম পাই ১৮০১ সালে স্যান্ডি অ্যাডিসন নামে এক মার্কিন শেফের রেসিপি বইতে।

১৮২০ সালে কর্নেল রবার্ট জনসন টমেটোর জন্য যা করলেন, তাতে চিরকাল তাঁর কাছে টমেটোর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। নিউজার্সিতে একটি আদালতকক্ষের সামনে প্রকাশ্যে এক ঝুড়ি টমেটো খেয়ে প্রমাণ করেন টমেটো বিষফল নয়। মাত্র দশ বছরের মধ্যেই আমেরিকাতে জনপ্রিয় হয় টমেটো। আসে অন্য বিপত্তি। অনেকেই টমেটোর ট্যাবলেট বানিয়ে ওষুধ হিসেবে বিক্রি করা শুরু করেন। তাঁদের দাবি ছিল এই ট্যাবলেট খেলে সেরে যাবে ডায়েরিয়া, বদহজম সহ আরও নানান অসুখ। কেউ কেউ আবার 'টনিক' হিসেবেও বেচতে শুরু করেন টমেটোর সস। এইভাবে নানা খানা-খন্দ পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীতে জনপ্রিয় হয় টমেটো সস।

All Set for a Hungry Man
...in stews, gravies, casseroles, salad dressings ...dozens of dishes...Heinz Tomato Ketchup adds the rich spicy flavor that gets your man!
Here's a Stew with Personality
Recipe Cube 2 lbs. round steak. Saute in ¼ cup fat. Stir in 2 Tbs. flour. Add 3 cups water, 1 Tbs. salt, 2 tsp. Heinz White Vinegar, ½ cup Heinz Tomato Ketchup. Simmer 30 minutes. Add 3 cut carrots. Simmer 15 minutes. Add 4 diced potatoes and 1 sliced onion. Then cook till thoroughly tender.
H.J. HEINZ CO.
This Hash Makes a Hit
Recipe Chop contents one 12-oz. can corned beef. Brown in skillet. Combine 1 Tbs. Heinz Prepared Brown Mustard, ¾ cup Heinz Tomato Ketchup, 3 slightly beaten eggs. Add to corned beef. Cook, stirring slightly until the eggs are done.
HEINZ TOMATO KETCHUP
57
The Best Pal A Good Meal Ever Had
HEINZ KETCHUP
Made from the world's finest tomatoes, rare spices and fine vinegar

হেইঞ্জের কেচাপ

সেই সময় সস পাওয়া যেত শুধুই টমেটো ফলনের মরশুমে। বছরের বাকি সময় তা সরবরাহ করার জন্য নানান অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য মেশানো হত টমেটো সসে। ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভস, ফরম্যালিন, বোরিক অ্যাসিড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড মেশানোর জন্য টমেটো সস হয়ে উঠত বিষাক্ত। কেউ কেউ গাঢ় লাল করার জন্য কয়লার টার-ও মেশাতেন। তাই সারাবছর খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও টমেটো সস খাওয়ার যোগ্য ছিল শুধু শীতের মরশুমেই। ১৮৭০ সালে আসরে নামেন হেনরি হেইঞ্জ। কারখানার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য তাঁর সুনাম ছিল আমেরিকায়। তাঁর নজরে আসে সারাবছর টমেটো সস ব্যবহারে সীমাবদ্ধতার বিষয়টি। নিজের পরিচ্ছন্নতার ধারাবাহিকতা সামনে আনতেই টমেটো সসের বোতলকে স্বচ্ছ রাখার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ১৯০৪ সালে প্রিজারভেটিভস ছাড়াই টমেটো সস তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাঁর গবেষকেরা। বাকিটা ইতিহাস। হেইঞ্জের সাফল্যের পিছনে ছিল দারুণ এক বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন। এর আগে সস তৈরি হত ঘরেই। বানাতেন মহিলারা। হেইঞ্জের টার্গেট গ্রুপ হন তাঁরাই। বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইনে লেখা ছিল, 'Blessed relief for Mother and the other women in the household.' ভালো বিজ্ঞাপন কী না করতে পারে! দু-বছরের মধ্যেই ৫০ লক্ষ বোতল বিক্রি করেন হেইঞ্জ। আরও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আসে কেচাপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কেচাপে ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড থাকলেও টমেটো সসে তা থাকে না। আবার টমেটো সসকে গরম করে রান্নায় ব্যবহার করা গেলেও কেচাপ ব্যবহার করা হয় ঠান্ডা অবস্থাতেই।

শেষে একটা তথ্য দিয়ে যাই, ব্রিটেনে সবচেয়ে জনপ্রিয় H.P. Sauce এখন প্রায় ওঁদের জাতীয় সস। বাদামি রঙের এই সসের আবিষ্কার ১৮৯৬ সালে ফ্রেডরিক গার্টন নামে নটিংহ্যামের এক মুদির হাতে। তিনি একবার কানাঘুষোয় শুনলেন এই সস নাকি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্যান্টিনেও সার্ভ হয়। আর যায় কোথায়? বোতলের উপরে হাউস অফ পার্লামেন্টের ছবি দিয়ে H.P. Sauce লিখে ব্রিটেনের জাতীয়তাবাদে সুড়সুড়ি দিয়ে লাখে লাখে সসের বোতল বিক্রি করে লাল হয়ে গেলেন।

লি আর পেরিনের সস

একেবারে অ্যাক্সিডেন্ট যাকে বলে, ঠিক সেইভাবে এই সসের আবিষ্কার। তাও বেশি দিন না, ১৮৩০ নাগাদ। উরচেস্টারশায়ারে লি অ্যান্ড পেরিনের এক দোকান ছিল। তাঁরা অন্য অনেক

জিনিসের সঙ্গে নানারকম সসও বানাতেন। একবার হয়েছে কী, এক খদ্দের তাঁদের চুনো মাছ, সয়া সস আর ভিনিগার দিয়ে সেই রোমান গারুমের মতো এক সস বানানোর অর্ডার দিয়েছিলেন। অনেকে বলেন এই খদ্দের ছিলেন স্বয়ং বাংলার গভর্নর লর্ড মার্কাস স্যান্ডিস। তিনি বাংলার আচারের রেসিপি মেনে অর্ডার দিয়েছিলেন। তাঁরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। এক পিপে সেই সস বানিয়েছেন। স্যান্ডিস এসে বললেন, 'এ কী যা-তা বানিয়েছ? নেব না।' ব্যস! পিপে তাঁদের গুদামে বেশ কয়েক বছর রয়ে গেল। যখন তাঁদের চৈতন্য হল, ভাবলেন ফেলে দেবেন। ফেলে দেবার আগে একটু চেখে দেখলেন। ভাগ্যিস! দেখলেন গেঁজে গিয়ে সেই সসে দারুণ এক স্বাদ হয়েছে, যেমনটি আর কোনও সসে নেই। ১৮৩৮ সালে রীতিমতো বোতলে ভরে তাঁরা এই সস বিক্রি করতে লাগলেন। লেবেলে নাম দিলেন 'Lee & Perrins Worcestershire Sauce'। লি আর পেরিনের ভাগ্য খুলে গেল শুধু এই সস বেচে। ১৮৫৫-তেই তাঁরা তিরিশ হাজার এই সসের বোতল বেচেন। ব্রিটেনে ততটা জনপ্রিয় না হলেও চিনা আর জাপানি রান্না উস্টার সস ছাড়া পানসে।

খাঁটি ভারতীয় রান্না

খিচুড়িবিলাস

শুঁটির খিচুড়ি করে খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর তার আস্বাদন।।
এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায়।
সে জন ভোজনে আর কিছুই না চায়।।

লিখেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। বর্ষাকাল এলেই বাঙালির নোলা খিচুড়ির জন্য সকসক করে উঠবেই। ঠিক এই জায়গায় আর-একটা কবিতা মনে পড়ে গেল। না দিলে কাব্যলক্ষ্মী পাপ দেবেন। বাঙালির বাদলদিনকে এত ভালোভাবে রবি ঠাকুরের পরে আর কেউ ফুটিয়ে তুলেছেন কি না জানি না, আর তাতেও খিচুড়ি এসেছে অনিবার্যভাবেই।

বাদরিয়া ঘেরি আয়ি চারহু ঔর কারি
দোদুল ঘরের মাঝে সঘন মশারি
দোদুল গঙ্গামধ্যে ইলিশের নাও
খিচুড়ি চাপাও বঁধু খিচুড়ি চাপাও
দোদুল কদম্বশাখে ঝুলা শ্যামরাই
বস্তির পিছনমাঠে কয়েক লখাই
কয়েক বিন্তির সাথে খেলা করে, গায়
এমন বাদলবাটে কে ঝুলিবি আয়
দোলে পথ শূন্য আড্ডা আন্ডাবাচ্ছা নিয়ে
রোয়াকে উঠেছে নেড়ি। ঝাঁপ ফেলে দিয়ে
দোকানি ঘরের পথে। দোলে নৌকাটিতে
কুমোরটুলির ঘাটে মা দুগ্গা মাটিতে
ওপরে নিভন্ত চুল্লি চিমনি সারি সারি

ঘেরি আয়ি বাদরিয়া চারহু ঔর কারি

(প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়)

কবিতা থেকে একটু বাস্তবে আসি। যতই নাচানাচি করি, খিচুড়ি কিন্তু বাঙালির একচেটিয়া না। গোটা এশিয়ায় এর প্রচলন ভালোই আছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে এ প্রিয় খাদ্যবস্তুটির প্রচলন সেই প্রাচীন যুগ থেকে। এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বেদে, ক্ষীরিকা নামে, যা হল চাল ও ডালের একটা সহজপক্ব খাদ্য। সংস্কৃতে খিচুড়ির আরও একটা নাম হল খিচ্ছা, যার অর্থ হল চাল আর ডাল দিয়ে বানানো খাবার। আবার প্রাচীন গ্রন্থগুলোয় এর উল্লেখ থাকে কখনও কৃসারান্ন নামে; অর্থাৎ চালের সঙ্গে মুগ ডাল, দই, আর তিল মিশিয়ে ঘিতে রান্না করা অন্ন। মহাভারতের গল্পে আমরা পাই যে এককণা অন্ন ভক্ষণ করে কৃষ্ণ উদ্গার করেছিলেন— যা দ্বারা ঋষি দুর্বাসার উদর পূর্ণ হয়ে যায় এবং দ্রৌপদী তাঁর ক্রোধ থেকে উদ্ধার পান, তা কিন্তু ছিল চাল আর ডালের মিশ্রিত অন্ন— অর্থাৎ খিচুড়ি। কৃষ্ণ-সুদামার উপাখ্যানে আমরা দেখি যে কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় সুদামা সঙ্গে নিয়েছিলেন দুটো হাঁড়ি, যার একটাতে ছিল খিচুড়ি (যেটা রাস্তায় বাঁদরে কেড়ে নেয়) আর অন্যটায় ছিল ভাজা ছোলা (যেটা কৃষ্ণ উপহারস্বরূপ পান তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে)। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী, ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতের উপমহাদেশে চাল ও ডাল (ছোলার ডাল, মটর ডাল, মটরশুঁটি ও মুসুর ডাল) একসঙ্গে খাওয়ার রীতি ছিল; আবার চাল আর ডাল আলাদা করে খাওয়ারও প্রচলন ছিল সেসময়। ২০১৫ সালে মহারাষ্ট্রের 'তের' গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় পাওয়া যায় দুটো হাঁড়িভর্তি পোড়া চালের সঙ্গে মুগ ডাল মেশানো খিচুড়ি, যা রান্না হয়েছিল প্রথম খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ সামনে হাজির ২০০০ বছরের পুরোনো খিচুড়ি, অবশ্য যিনি রান্না করেছিলেন, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তিনি সেটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩২১-২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) চাল-ডালের মিশ্রণে খিচুড়ি খাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় চাণক্যের লেখায়। সেখানে একটা বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে একদিন রাজা শিকার শেষে আশ্রয় নেন এক গরিবের বাড়িতে এবং সেখানে গৃহকর্ত্রী গরম খিচুড়ির থালা সামনে পরিবেশন করামাত্র বাড়ির ছোটো ছেলেটি তাতে তড়িঘড়ি আঙুল ডুবিয়ে আঙুলটি পুড়িয়ে ফ্যালে। আহারের বর্ণনায় চাণক্য লিখেছেন যে এক প্রস্থ চাল, সিকি প্রস্থ ডাল, ১/৬২ প্রস্থ নুন ও ১/১৬ প্রস্থ ঘি দিয়ে তৈরি অন্ন হল গৃহস্থ বাড়ির সবচেয়ে সুষম আহার। গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের লেখায়ও আমরা পাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর রাজবাড়ির

রান্নাঘরে চাল আর ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি রান্নার বর্ণনা। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্য দেশের পণ্ডিত ও পরিব্রাজক আলবিরুনির লেখায়ও আমরা ভারতে খিচুড়ির প্রচলনের উল্লেখ পাই। আবার চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি মরক্কোর পরিব্রাজক ইবন বতুতা তাঁর লেখায় বলেছেন, ভারতের অন্যতম প্রিয় সকালের জলখাবার হল খিচুড়ি; বিশেষ করে গরিবদের মধ্যে চাল আর মুগের ডাল ঘি দিয়ে রান্না করার খুব চল ছিল সেই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীর রুশ পরিব্রাজক নিকিতিনের লেখা পড়ে আমরা জানতে পারি যে দক্ষিণ ভারতেও সেসময় চাল-ডাল মিশিয়ে খিচুড়ি খাওয়ার প্রচলন ছিল। এর দুশো বছর বাদে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি পরিব্রাজক তাভেরনিয়ের জানিয়েছিলেন যে তখন ভারতে সন্ধ্যার খাবার হিসেবে খিচুড়ি (সবুজ মুসুরির ডাল দিয়ে রান্না করা) খাওয়ার রীতি প্রায় সব বাড়িতেই ছিল।

ধনাঢ্য মোগল সম্রাটরাও কিন্তু এ খিচুড়িকে অবহেলা করেননি। এ সামান্য খাদ্যবস্তুটি ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম। বিশেষত তিনি ভালোবাসতেন প্রচুর মশলা, পেস্তা আর কিশমিশ মেশানো গুজরাটি খিচুড়ি। জাহাঙ্গীর এতটাই ভালোবাসতেন খিচুড়ি খেতে যে তিনি এর নতুন নামকরণ করেন লাজেইজান, অর্থাৎ পরম উপাদেয়। তাঁর পিতা সম্রাট আকবরও খিচুড়ি খেতে ভালোবাসতেন। আওরঙ্গজেবের প্রিয় 'আলমগিরি খিচড়ি'-তে আবার চাল আর ডালের সঙ্গে মেশানো হত নানা ধরনের ডিম আর মাছ। মোগলদের সময় নানাধরনের খিচুড়ির চল শুরু হয়ে গিয়েছিল সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতেও। যেমন চালের বদলে অনেকসময়ই বাজরা ব্যবহার হত, আর ডালের বদলে মটরশুঁটি। মোগলদের রাজবাড়ির রান্নাঘরে নানা খিচুড়ির কথা বলেছেন ঐতিহাসিক আবুল ফজল এবং আইন-ই-আকবরীতে কিছু কিছু খিচুড়ির রন্ধনপ্রণালীও বর্ণনা করেছেন। গাছের মগডালে হাঁড়ি ঝুলিয়ে নিচে খড়কুটোয় আগুন ধরিয়ে আকবর বাদশাহকে জব্দ করার সেই গল্পে হাঁড়ির ভেতর তো খিচুড়িই ছিল! একই গল্প অবশ্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপাল ভাঁড়ের সংস্করণেও প্রচলিত। গল্পের মানুষেরা বদলে গেলেও হাঁড়ির খিচুড়ি কিন্তু বদলায়নি!

হায়দরাবাদ নিজামরাও পিছিয়ে থাকেননি। তাঁদের হেঁশেলেও খিচুড়ি দখল করে নিয়েছিল উচ্চস্থান। আবার উনিশ শতকে ভারতের এ অতিপ্রচলিত খাদ্যবস্তুটি ইংল্যান্ডে হাজির করেছিল ব্রিটিশরা। ডিম আর কড মাছ মিশিয়ে ইংল্যান্ডেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে খিচুড়ি, তবে প্রাতরাশ হিসেবে কেজেরি নাম নিয়ে।

ভারতের নানা প্রদেশে নানা ধরনের খিচুড়ি রান্না হয়; যেমন জম্মু ও কাশ্মীরের খিচুড়ি তৈরি হয় চাল, ডাল, গরম মশলা আর আচার দিয়ে। এ খিচুড়ি ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়

আরাধ্য দেবতাকে, 'খেতসিমহাভাস' উৎসবের সময়, যা ডিসেম্বরে পালন হয় আর খাওয়া হয় ওলকপির আচার দিয়ে। হিমাচলপ্রদেশের খিচুড়ির নাম হল বালাই— রান্না হয় চাল, ছোলা, ঘোল, ধনে, জিরা, আর মেথি দিয়ে। উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়ালি খিচুড়ি হয় চাল, কলাইয়ের ডাল, তিল, আর গরম মশলা দিয়ে। দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদের নিজামরা নিয়ে আসেন কিমার খিচুড়ি, যাতে থাকত চাল, ডাল, মাংসের কিমা আর সঙ্গে দেওয়া হত টক ঝোলের মতো 'খাট্টা।' মহীশূরের 'ওডেয়ার' রাজবংশ কর্নাটকে শুরু করে 'বিসিবেলে-ভাত', যাতে থাকে ভাত, ডাল, সবজি, এলাচ, লবঙ্গ, ধনে, জিরে, মেথি ও শুকনো নারকেলের টুকরো। তামিলনাড়ুতে তিন রকমের খিচুড়ি হয়: 'খাড়া পোঙ্গল', ঝাল দেওয়া 'মিলাগু পোঙ্গল' ও গুড় মেশানো মিষ্টি 'সাক্কারাই পোঙ্গল।' কেরালার খিচুড়িতে থাকে ভাত, মুগ ডাল, নারকেল আর বাদাম। পশ্চিম ভারতের দিকে দেখলে দেখা যাবে, গুজরাটের ঝাল খিচুড়িতে থাকে চাল আর ডালের সঙ্গে অনেক রকমের সবজি (রাম খিচুড়ি), যা খেতে হয় দইয়ের কারহি দিয়ে। গুজরাটে একসময় একটা হালকা খিচুড়ি পাওয়া যেত, যার নাম ছিল 'সোলা খিচুড়ি' আর তাতে থাকত কিমা আর ঘন ক্রিম। মহারাষ্ট্রের টক-টক খিচুড়িতে থাকে ভাত আর মটরশুঁটির সঙ্গে চিনাবাদাম, কাজুবাদাম আর নারকেলকোরা। রাজস্থানের খিচুড়ি অনেকটা গুজরাটি খিচুড়ির মতো— ঝাল সামান্য কম ও চালের বদলে থাকে বাজরা অথবা গম। আবার মকরসংক্রান্তির সময় গুজরাট আর রাজস্থান উভয়ের খিচুড়িতেই থাকে বিউলির ডাল। উত্তরপ্রদেশের খিচুড়ি রান্না হয় চাল ও কালো ছোলা দিয়ে আর তাতে থাকে আমলা ফল; এটা মকরসংক্রান্তির সময় ওখানকার প্রধান খাবার।

বাঙালিরও অন্যতম প্রিয় খাদ্য হল খিচুড়ি। সবচেয়ে সোজা বানানো, দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে শুধু একমুঠো চাল আর একমুঠো ডাল— সঙ্গে নুন, হলুদ, লংকা, ধনে, জিরে আর অল্প চিনি দিয়ে হাঁড়িতে বা প্রেশার কুকারে চাপালেই হয়ে যায় খিচুড়ি। বাঙালিদের অবশ্য শুধু খিচুড়িতে হয় না, তার সঙ্গে থাকে মাছভাজা (ইলিশ মাছ হলে তো আর কথাই নেই) বা ডিমভাজা। আর থাকে নানারকমের সবজি ভাজা, যেমন— বেগুন ভাজা, পটল ভাজা, আলু ভাজা কিংবা বেসন দিয়ে ভাজা বেগুন (বেগুনি), কুমড়ো (কুমড়ি) বা ফুলকপি (ফুলুরি)। বাংলার রান্নায় নানা ধরনের খিচুড়ি দেখা যায়— তিলের খিচুড়ি থেকে শুরু করে মুগের খিচুড়ি, মসুরের খিচুড়ি, মটর ডালের খিচুড়ি, ভাজা মুগের খিচুড়ি, অড়হর ডালের খিচুড়ি, কড়াইশুঁটির খিচুড়ি, পাঁচমিশালি খিচুড়ি, ভুনা খিচুড়ি, ছোলার ডালের খিচুড়ি, মাছের মাথা দেয়া খিচুড়ি, চিংড়ি দেয়া খিচুড়ি, মাংসের খিচুড়ি আর ক্রিম দেওয়া মিষ্টি খেজুরের

খিচুড়ি। বাঙালির খিচুড়িপ্রীতি মাথায় রেখে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী তাঁর বিখ্যাত রান্নার বইয়ে লিখেছিলেন, 'সৈন্যের গুণে যেমন সেনাপতির খ্যাতি বর্ধিত হয়, সেই রূপ আনুষঙ্গিক খাদ্যের গুণে প্রধান খাদ্য সমধিক রুচিকর হইয়া ওঠে।' খিচুড়ির এ আনুষঙ্গিক খাদ্যের মধ্যে তখনও প্রধান হল ইলিশ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে ইলিশ ভাজা। গলা খিচুড়ি আর ভুনা খিচুড়ি উভয়ই বাঙালির অন্যতম প্রিয়।

শেষে শুধু বলে রাখি খিচুড়ির সঙ্গে যে পাঁপড় ভাজা, তাকে ইংরাজিতে বলে পোপাডম। ১৯০৩ সালে ইংরাজি ভাষায় আসা এই শব্দটার মূলে কিন্তু আছে সংস্কৃত পর্পট, যার মানে চ্যাটালো থালার মতো। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন তামিল শব্দ পোরুপ্পু বা ডাল থেকে নাকি এই পোপাডম এসেছে। বিতর্ক চলুক, আমরা বরং টাং টুইস্টার খেলি, 'কাচ্চা পাঁপড়, পাক্কা পাঁপড়... কাচ্চা পাঁপড়, পাক্কা পাঁপড়... কাচ্চা পাঁপড়, পাক্কা পাঁপড়...'

ডালে ডালে

সিন্ধু সভ্যতায়ও নাগরিকরা ডাল খেতেন, সেই প্রমাণ মিলেছে। ফারমানায় বিস্তৃত হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে মটর ডাল, ছোলার ডাল, তুরের ডাল মিলেছে। ওই অংশটি

হরিয়ানার ঘাগ্গার উপত্যকায় অবস্থিত। তারপর ধীরে ধীরে প্রাচীন ভারতে বিত্তশালীরা বৈভব প্রদর্শনের জন্য ডাল খেতেন এবং খাওয়াতেন। তখন কিন্তু আজকের মতো ঘরে ঘরে রোজ ডাল খাওয়া হত না। সময়টা খ্রিস্টজন্মের ৩০৩ বছর আগে। ভারতে তখন শাসন করছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। নিজের বিয়েতে অতিথিদের জন্য খাবারের ঢালাও আয়োজন করেছিলেন। সেই ভোজের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঘুগনি। হ্যাঁ, আজও পূর্ব ভারতে দারুণ জনপ্রিয় সেই ঘুগনি। মধ্যযুগে আমদানি হল দমে রান্নার শৈলী। যাকে বলে দমপুখত। ঢিমে আঁচে রান্না করা সেই ডালের স্বাদে মজলেন মোঘল বাদশাহরাও। সব ডালের মধ্যে চানার ডাল ছিল তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। শোনা যায়, রোজ দু-বেলা চানা ডাল না পেলে রাঁধুনির গলা কাটতে যেতেন তাঁরা। আকবরের মহারানি যোধাবাই নাকি এমন ‘পাঁচমেল ডাল’ রাঁধতেন যে তার সুগন্ধ গোটা প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ত। শাহজাহানের আমলে সেই পাঁচমেল ডালে আরও কিছু উপকরণ যোগ হয়। নাম হয় শাহি পাঁচমেল ডাল। শাহজাহানের তৃতীয় ছেলে মোরাদ রান্না নিয়ে নিত্যনতুন পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন। এভাবেই মুগ ডালের অনবদ্য এক পদ রেঁধে ফেলেন তিনি, যা আজও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ঢিমে আঁচে বসিয়ে রান্না করেন মুগ ডাল। সঙ্গে মেশান পেঁয়াজ, আমচুর এবং কাঁচালংকা। তাঁর নামে ডালের নাম হয় মোরাদাবাদি ডাল।

এক এক অঞ্চলে এই ডাল ধীরে ধীরে নিজের ভোল পালটাতে থাকে। গুজরাটে এই ডাল বেটে নিত্যনতুন পদ তৈরি করা হতে থাকে। যেমন বড়া, পাকোড়া, খাণ্ডভি। বাংলায় আবার এই ডালে পড়ে ফোড়ন। কখনও পাঁচফোড়ন, কখনও কালো জিরে, কখনও রাঁধুনি। হায়দরাবাদিরা এই ডালের সঙ্গে মাংস মিশিয়ে বানিয়ে ফেলেছেন ডাল গোস্ত। ঐতিহাসিকদের মতে, বিভিন্ন যুগে সম্রাট-বাদশাহদের জিভকে তুষ্ট করতেই ডাল রান্নার পদ্ধতিতে হেরফের করা হয়েছে। তার জেরে বদলে গেছে স্বাদ। শোনা যায় আটাতে উটের দুধ আর ঘি মিশিয়ে ছোটো ছোটো মণ্ড তৈরি করতেন রাজস্থানের রাজপুত বাপ্পাদিত্যের সৈন্যরা। সারাদিন গরম বালিতে রেখে তাপ দেওয়া হত। সেগুলো শক্ত খটখটে হয়ে গেলে তাতে পাঁচমেল ডাল মিশিয়ে বা ঘি দিয়ে ডুবিয়ে খেত তারা। নাম ছিল ডাল বাটি। একবার এক রাঁধুনি অসাবধানে তাতে চিনির রস ফেলে দিলে তৈরি হয়ে গেল এখন বিশ্বখ্যাত ডাল বাটি চুরমা।

ছবি- পূর্ণেন্দু পত্রী

'খানাতল্লাশি' বইতে ডাল নিয়ে দারুণ এক গল্প আছে। সেটা বলেই শেষ করব। ওস্তাদ কারিগরেরা নাকি এই ডাল একশোরও বেশি স্বাদে রান্না করতে পারতেন। তাই ডালের নামী শেফদের দাম আর মেজাজ ছিল আকাশছোঁয়া। নবাব আসফউদ্দৌলা সেই সময় পাঁচশো টাকা মাসমাইনেতে এক ডালের রাঁধুনিকে নিয়োগ করেন! রাঁধুনি আবার শর্ত দিয়েছিল, নবাবের ডাল খাওয়ার ইচ্ছে হলে আগের দিন জানাতে হবে, আর ডাল তৈরি হয়েছে খবর পাওয়া মাত্র নবাব এসে দস্তরখানে বসবেন। একদিন আসফউদ্দৌলা ডাল খেতে চাইলেন, এবং পরের দিন শেফ গিয়ে যথাসময়ে খবর দিল— খানা তৈরি। নবাব তখন সভায় ভারী ব্যস্ত, তাই তিনবার খবর দেওয়াতেও এলেন না। অবশেষে যখন এলেন, সেই শেফ রান্না করা সমস্ত ডাল নিয়ে হুড়হুড় করে একটা শুকনো গাছের তলায় ঢেলে দিল, আর তক্ষুনি কাজে ইস্তফা দিয়ে

চলে গেল।

ইডলির ইতিকথা

তামিলনাড়ু না, আরব দেশে ইডলির জন্ম। মিশরে আরব বণিকরা যখন পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করলেন, তখনই ইডলি ঢুকে পড়ে নীল নদের দেশে। হজরত মহম্মদ বেঁচে থাকতেই সদ্য ইসলাম ধর্ম নেওয়া আরব বণিকরা মিশরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন—সেখান থেকেই এ দেশেও এসে পৌঁছোন। এই নব্য ইসলামধর্মী বণিকেরা খাবারের ব্যাপারে খুবই গোঁড়া ছিলেন। হালাল করা ছাড়া মাংস ছুঁতেনই না। তার ওপর এ দেশের খাবার তাঁদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। তাই ভেজ খাওয়া বেছে নিয়েছিলেন। দুইবেলা ভাতের মণ্ড বানাতেন, আর তা কিছুটা চ্যাপটা করে নারকেলের চাটনি দিয়ে খেয়ে পেট ভরাতেন। সেখান থেকেই ইডলির উৎপত্তি। তবে অনেকের মতে ইডলির জন্ম ইন্দোনেশিয়ায়। সপক্ষে প্রমাণ আছে। একমাত্র সেখানেই নাকি চালের গুঁড়ো গেঁজিয়ে রান্নার প্রচলন একেবারে শুরু থেকে ছিল। হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণকথায় লিখেছিলেন, ভারতীয়রা ভাপে সেদ্ধ করে রাঁধতে জানত না। এদিকে এখনও ইন্দোনেশিয়ায় সয়াবিন, বাদাম, মাছ গেঁজিয়ে তৈরি হয় জনপ্রিয় খাবারের নাম কেডলি। অতএব বুঝে নিন। পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখা থেকে জানতে পারলাম ‘ইডলির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৯২০ খ্রিস্টাব্দে কন্নড় ভাষায় শিবাকোটিআচার্যের লেখা ‘ভাদ্দারাদ্ধান’ পুথিতে। সেখানে আছে, কোনও মহিলার ঘরে ব্রহ্মচারী এলে ‘অষ্টাদশ দান-দ্রব্য’-এর যে নিয়ম ছিল, তাতে ইডলি-ও থাকত। দ্বিতীয় চাভুন্দার্য ১০২৫ সালে ইডলি তৈরির রেসিপিটা জানিয়েছিলেন। কলাইয়ের ডাল ঘোলে ভিজিয়ে মিহি করে বাটতে হবে। তাতে দইয়ের জল মিশিয়ে ধনে, জিরে, মরিচ আর হিং দিয়ে গোল গোল করে নিলেই ইডলি রেডি। ১১২৯ সালে লেখা সংস্কৃত পুথি ‘মানসোল্লাশ’-এ ইদ্দারিকা-র কথা আছে। বানানো হত কলাইয়ের ডালের ছোটো মণ্ডের সঙ্গে মরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর হিং মিশিয়ে। তামিল দেশে ইডলিকে প্রথম খুঁজে পাওয়া যায় অনেক পরে। আঠেরো শতকে লেখা ‘মাক্কাপুরাণম’-এ।’ সুতরাং উৎপত্তি যেখানেই হোক না কেন, ভারতীয়রা একে নিজেদের মতো করে খাঁটি ভারতীয় রান্না বানিয়ে ছেড়েছে।

মিষ্টিমুখ

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ

দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন তাঁর কবিতাকুসুমাঞ্জলি বইয়ের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন বিয়েতে কে কী চায়? তাতে বলা হচ্ছে, কন্যা চায় বরের রূপ, মাতা চান জামাইয়ের ধন, পিতা চান পাত্রের জ্ঞান, বান্ধবরা দেখেন পাত্রের কুল আর জনগণ মিষ্টি পেয়েই খুশি, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।

বাংলায় বৈষ্ণবরাই প্রথম মিষ্টান্ন আহারে বৈচিত্র্য আনেন। তাঁদের প্রায় সব খাবারই ছিল খুবই সাদামাটা ও স্বাদহীন। এইসব স্বাদহীন খাবারকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তালিকায় যোগ হয় নানা ধরনের মিষ্টি। ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি পিঠা ইষ্ট-সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিষা, তিন পাত্রে ঘনাবর্ত দুগ্ধ, দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি, দধি-সন্দেশ খেতেন শ্রীচৈতন্য। এ ছাড়াও লাড্ডু, চিনিফেনী, মিছরি, মনোহরা, মতিচুর, খাসামৃত, পুরী পুলি, রুটি, শামুলী নামে নানা মিষ্টি চলত। বৈষ্ণবদের পছন্দের মিষ্টিগুলি বেশিরভাগ দুধ ও দই মিশিয়েই তৈরি করা হত। সঙ্গে যোগ করা হত বিভিন্ন গন্ধদ্রব্যও। কথিত আছে, চৈতন্যদেব নাকি দইয়ের সঙ্গে সন্দেশ পেলে খুবই খুশি হতেন। শিষ্যরা নৈবেদ্য হিসাবে এই সন্দেশ উপহার দিলে তিনি যারপরনাই খুশি হতেন।

পায়সেরই কত বাহার— চালের পায়েস, ছানার পায়েস, চুষির পায়েস, চিঁড়ের পায়েস, সুজির পায়েস, কাউন চালের পায়েস, লুচির পায়েস, শীতে হত নাড়ু আর পিঠে। পিঠেরও কত নাম— কাঁঠালি, গেণ্ডুয়া, গুয়া পান, অমৃত মণ্ডল, চন্দ্রপুলি, চন্দ্রকান্তি, মনোহরা, মুগসামালি, আসকে পিঠে— কত কী! ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন মিষ্টি মতিচুরের লাড্ডু। বয়স প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশি। মধ্যযুগের সূচনা থেকেই বাংলার মানুষ মিষ্টির বৈচিত্র্য খুঁজতে বেশি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ক্রমে নানা মিষ্টি ঢুকে পড়ে বাঙালির খাদ্যতালিকায়। এবঙ্গ-ওবঙ্গের মিষ্টি নিয়ে লড়াইও বেশ মজাদার। কৃষ্ণনগরের সরভাজা, বর্ধমানের মিহিদানা-সীতাভোগ, শক্তিগড়ের ল্যাংচা শুধু জগৎবিখ্যাতই নয়, জগৎজয়ীও। কম যায় না ক্ষীরপাইয়ের বাবরসা, বীরভূমের মোরব্বা, মালদহের রসকদম, জলপাইগুড়ির চাঁছি-দই, জয়নগরের মোয়াও। মিষ্টির স্বাদ ও বৈচিত্র্যে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ)-ও পিছিয়ে নেই। টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, কুমিল্লার রসমালাই, বিক্রমপুর ও রসগোল্লা, বগুড়া

ও গৌরনদীর দই, যশোরের খেজুর গুড়ের সন্দেশ, শাহজাদপুরের রাঘবসাই, পানতোয়া, মুক্তাগাছার মন্ডা, খুলনা ও মুন্সীগঞ্জের অমৃতি, কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি, নওগাঁর প্যাঁড়া সন্দেশ, ময়মনসিংহের অমৃতি, যশোরের জামতলার মিষ্টি, যশোরের নলেনগুড়ের প্যাঁড়া সন্দেশ, যশোরের খেজুররসের ভিজা পিঠা, মাদারিপুরের রসগোল্লা, রাজশাহির তিলের খাজা, সিরাজদীখানের পাতক্ষীরা, রাজবাড়ীর শংকরের ক্ষীরের চমচম, নওগাঁর রসমালাই, পাবনার প্যারাডাইসের প্যাঁড়া সন্দেশ, পাবনার শ্যামলের দই, সিরাজগঞ্জের পানতোয়া, কুষ্টিয়ায় মহিষের দুধের দই, মেহেরপুরের সাবিত্রী, কুষ্টিয়ার তিলে খাজা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী, মানিকপুর-চকরিয়ার মহিষের দই, ইকবালের সন্দেশ, বোম্বাইয়াওয়ালার ক্ষীর, মহাস্থানের কটকটি, গাইবান্ধার রসমঞ্জুরি, কুষ্টিয়ার স্পেশাল চমচম, ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউর পূর্ণিমার জিলাপি, গুলশানের সমরখন্দের রেশমি জিলাপি, দেওয়ানগঞ্জ-জামালপুরের রসগোল্লা, মহেশখালীর মোষের দই, রাজশাহির রসকদম, চাঁপাই-নবাবগঞ্জের চমচম, প্যাঁড়া সন্দেশ, কিশোরগঞ্জের তালরসের পিঠা খাদ্যরসিকদের জিভে জল ঝরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুপরিচিত নাম। সঙ্গে রয়েছে বগৌড়ার দই। একবার স্বাদ নিলে অমৃতের স্বাদ বোঝা যায়। প্রচণ্ড গরমে এক ভাঁড় বগৌড়ার দই নতুন করে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশের আর-একটি নামকরা মিষ্টি— প্রাণহরা (দই ও মোয়া মেশানো হালকা সন্দেশ)। এর জনপ্রিয়তাও আকাশচুম্বী। পোড়াবাড়ির চমচমের বয়স নয় নয় করে ১৫০ বছর ছাড়িয়েছে। এই বিশেষ মিষ্টিটির আধুনিক সংস্করণ করেন উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার রাজা রাম গৌড়। পরে এর আরও উন্নত রূপ বের করেন তাঁর নাতি মতিলাল গৌড়।

With the Best Compliments

of

Messrs. Dwarikanath Ghosh & Sons

LIMITED

Premier Manufacturers

of

INDIAN SWEETMEATS

Head Office :—
140/1, Cornwallis Street
Phone No. B. B. 1340

Branches :
All over Calcutta

[xviii]
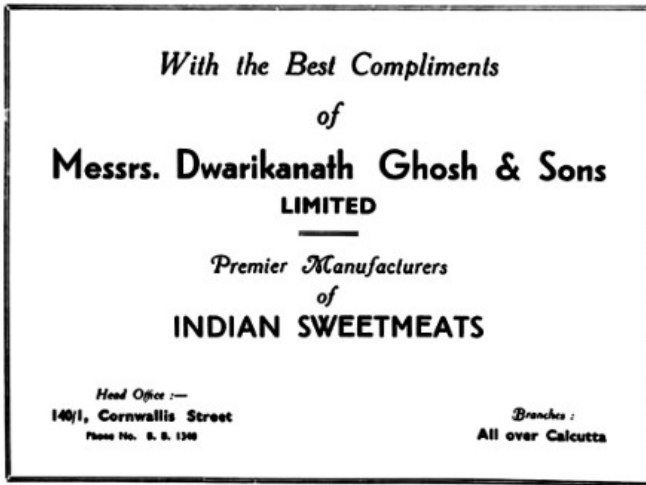
দ্বারিকের বিজ্ঞাপন

আধুনিক সন্দেশ-রসগোল্লার বয়স মাত্র দুই-আড়াইশো বছর। বাঙালিরা ছানা তৈরি করতে শিখেছে পর্তুগিজদের থেকে। তাদের কাছ থেকে বাঙালি ময়রারা ছানা ও পনির তৈরির কৌশল শেখে। উপমহাদেশে ছানা তৈরির শিক্ষাবিস্তার অনেক পরের ঘটনা। প্রথম দিকে ছানা ও ছানার মিষ্টি একরকম পরিত্যাজ্যই ছিল ধর্মীয় কারণে। বৈদিক যুগে দুধ ও দুধ থেকে তৈরি ঘি, দধি, মাখন ইত্যাদি ছিল দেবখাদ্য। বিশেষ করে ননি ও মাখন অত্যন্ত প্রিয় ছিল শ্রীকৃষ্ণের। এজন্য দুধ থেকে রূপান্তরিত ওইসব খাদ্য শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু ছানা তৈরি হয় দুধ বিকৃত করে, এজন্য মনুর বিধান মতে, ছানা ছিল অখাদ্য। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন অমরসিংহ 'অমরকোষ' নামে একটি অভিধান রচনা করেছিলেন। সেখানে (ব্রহ্মবর্গ: ২/৫৬) বলা হয়েছে, উষ্ণ দুধে দধি যোগ করলে তাকে 'আমিক্ষা' বলে। তখন আরও দুটি নাম ছিল। গরম দুধে দই দিলে দুধটা কেটে যে সাদা অংশ তৈরি হয়, তার নাম 'দধিকুর্চিকা।' নষ্ট দুধ অপবিত্র, নষ্ট হওয়া জিনিস খেতে নেই বা ভগবানকেও দিতে নেই। দুধকে ছিন্ন করা হয় বলে ছিন্ন থেকে ছেনা বা ছানা হয়েছে। ছানা নামকরণ নিয়ে আর-একটি দেশীয় মত রয়েছে, গরম দুধে দধি সংযোগে যখন জল এবং সাদা সারাংশ আলাদা হয়ে যায়, তখন সাদা সুতির কাপড়ের হালকা টুকরোতে 'ছেনে' জল থেকে সাদা পিণ্ডাকার বস্তুটিকে জলহীন করে বলে এর নাম হয় 'ছেনা' বা 'ছানা।' এ সম্পর্কে

সুকুমার সেন তাঁর ‘কলিকাতার কাহিনী’ বইয়ে লিখেছেন, “ক্ষীর-মাখন-ঘি-দই— এগুলো কাঁচা দুধের স্বাভাবিক পরিণাম, কৃত্রিম অথবা স্বাভাবিক। কিন্তু কোনোটিই দুধের বিকৃতি নয়। ‘ছানা’ কিন্তু ফোটানো দুধের কৃত্রিম বিকৃতি। বাঙালি অন্য দ্রব্য সংযোগ করে দুধ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, যাতে সারবস্তু ও জলীয় অংশ পৃথক হয়ে যায়। এভাবে দুধ ছিন্নভিন্ন করা হয় বলেই এর নাম হয়েছিল বাংলায় ‘ছেনা’, এখন বলা হয় ‘ছানা’। সংস্কৃত ভাষায় ছানার কোনোরকম উল্লেখ নেই। অন্য ভাষাতেও ছিল না। আগে অজ্ঞাত ছিল বলেই শাস্ত্রসম্মত দেবপূজায় ছানা দেওয়ার বিধান নেই।”

বাংলার মিষ্টিকে দুভাগে ভাগ করেছেন সুকুমার সেন। প্রথম ভাগে আছে একক উপাদানে তৈরি মিষ্টি। এ ধরনের মিষ্টিতে গুড় বা চিনির সাথে আর কিছু মিশ্রিত থাকে না। যেমন : গুড় বা চিনির নাড়ু ও চাকতি, পাটালি, বাতাসা, খাজা, ছাঁচ ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধরনের মিষ্টিকে আরও দুরকমে ভাগ করা চলে। গুড় বা চিনির সাথে দুগ্ধজাত কোনও উপকরণ ছাড়া অন্য দ্রব্য সহযোগে তৈরিকৃত মিষ্টান্ন। যেমন— নারকেল, তিল এসবের নাড়ু, চিঁড়া, মুড়ি, খই-এর মোয়া ইত্যাদি। দুগ্ধজাত দ্রব্যযোগে তৈরি নানান ধরনের মিষ্টি রসিক ও মিষ্টিপ্রিয় বাঙালির সুপরিচিত। চিনির সাথে ছানার সংযোগে তৈরি হয় সন্দেশ ও মন্ডা। আবার এই ছানা রসে মাখিয়ে তৈরি হয় রসগোল্লা, দুধে ডোবালে রসমালাই। বেসনের ছোটো ছোটো দানা ঘিয়ে ভেজে তৈরি হয় বুন্দিয়া, যা দেখতে ছোটো বিন্দুর মতো। কড়া পাকে প্রস্তুতকৃত বুন্দিয়াই মতিচুর, লাড্ডুর কাঁচামাল।

এই অধ্যায়ে আমাদের অতি চেনা কিছু দেশি আর বিদেশি মিষ্টির গল্প বলব।

সন্দেশকথা

সন্দেশ ছানা আবিষ্কারের আগেও ছিল। আগের দিনে সন্দেশ তৈরি করা হত বেসন, নারকেল ও মুগের ডালের সঙ্গে চিনির সংযোগে। এ ছাড়া শুধু চিনি দিয়ে তৈরি একধরনের চাকতিকেও অনেকসময় সন্দেশ বলা হত। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’ বইয়ে বাঙালির মিষ্টিজাতীয় যে খাদ্যের বিবরণ দিয়েছেন, তাতে সংগত কারণেই ছানার কোনও মিষ্টির উল্লেখ নেই। দুধ থেকে তৈরি মিষ্টির মধ্যে আছে দই, পায়েস ও ক্ষীরের কথা। সন্দেশের উল্লেখ আছে, তবে সেই সন্দেশ ছানার নয়। তিনি বলেছেন, ‘কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রে আত্মীয়-বান্ধবদের চিপিটক বা চিঁড়া এবং নারিকেলের প্রস্তুত নানা প্রকারের সন্দেশ পরিতৃপ্ত করিতে হইত এবং সমস্ত রাত বিনিদ্র কাটিত পাশা খেলায়।’ চিনির সঙ্গে ছানার রসায়নে আধুনিক

সন্দেশ ও রসগোল্লার উদ্ভাবন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে।

এই আধুনিক সন্দেশ রসগোল্লার আবিষ্কর্তা হুগলির হালুইকররা। পরে তারা কলকাতায় এসে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একে জগদ্বিখ্যাত করে তোলেন। প্রথম দিকে ছানার সন্দেশকে বলা হত 'ফিকে সন্দেশ'। কারণ, এ সন্দেশে আগের দিনের সন্দেশের চেয়ে মিষ্টি কম। শাস্ত্রসম্মত নয় বলে ছানার সন্দেশ অনেকে খেতে চাইত না। কলকাতার ময়রাদের সৃষ্টিতে মুগ্ধ শংকর তাঁর 'বাঙালির খাওয়াদাওয়া' বইয়ে কড়াপাক, নরমপাক, কাঁচাগোল্লা, চন্দন সন্দেশ সহ হাজার রকম সন্দেশের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'এঁরা আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মতো পাইকিরি হারে মিষ্টি শাস্ত্রে নোবেল জয়ী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।' তিনি জানিয়েছেন, সন্দেশ এত বৈচিত্র্যময় যে শীতকালের সন্দেশ আর গ্রীষ্মের সন্দেশে তো পার্থক্য আছেই, এমনকি সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরের সন্দেশও নাকি একরকম নয়। সন্দেশের ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্য প্রবন্ধ লিখেছেন হরিপদ ভৌমিক মশাই। তাঁর থেকেই হাত পেতে জানতে পারলাম, প্রাচীন বাংলায় সংবাদ অর্থে 'সন্দেশ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা) সংবাদ অর্থে 'সন্দেশ'–এর ব্যবহার এভাবে এসেছে।

'শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল।।'

একই সময়ে একই গ্রন্থে (আদিলীলা) মিষ্টান্ন অর্থে সন্দেশ–এর ব্যবহার দেখা যায় :

'আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা।।'

১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে কবি মুকুন্দ মিশ্র 'বাশুলীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন। 'কনকার কন্যাজন্মে উৎসব'–এ চিনির সন্দেশের উল্লেখ রয়েছে :

'খিরপুলি দেই রামা করিয়া বিশেষ।
দধি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ।।'

এই সময়ে ক্ষীরের সন্দেশও প্রচলিত ছিল :

'পাট ভোট নেত লয় ময়মল্ল গন্ডা।
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরন্ডা।।'

প্রাচীন বাংলায় চালের গুঁড়ো, বেসন প্রভৃতি দিয়ে মিষ্টি তৈরি করত। ব্রাহ্মণবাড়ির শুদ্ধ অন্ন ছাড়া অব্রাহ্মণের হাতে তৈরি চালের গুঁড়ো মেশানো মিষ্টিকে অন্নযুক্ত মিষ্টি বলে গণ্য করা

হত। তাই উচ্চবর্ণের মানুষ সেই মিষ্টি নিজেরাও খেতেন না, ভগবানের পুজোতেও দিতেন না। হরিপদবাবু সন্দেশ বা খবরের সঙ্গে মিষ্টান্ন নামের সাযুজ্যর এক সুন্দর কারণ নির্দেশ করেছেন। "মধ্যযুগে বঙ্গদেশে বিবাহ অনুষ্ঠান পাকা করা হত পান-সুপারি দিয়ে। সমাজে যিনি প্রথম পান-সুপারি পেতেন তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের সময়েও এমন প্রথা ছিল— 'পান সুপারি বিনে তোমার ছাড়া নাই।' কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেশের অন্যান্য শুভ সংবাদ দিতে চিঠি পাঠানো হত— 'লিখন করিয়া পাঁতি আনাইল বন্ধু জ্ঞাতি/ দেশে দেশে পাঠাল বার্তন।' পরবর্তীকালে পান-সুপারির জায়গায় সন্দেশ নিজগুণে জায়গা পেয়ে গেল। স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন— 'আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি... দেশী তুলোট কাগজে শুভ কার্যের চিঠি লাল কালি দিয়ে লেখা হইত এবং কাগজখানি চারদিকে লাল সুতা বেঁধে কিছু মিষ্টির সহিত নাপিতের হাতে যাইত।' এত মানুষ থাকতে শুভকাজের চিঠি নাপিতের হাত দিয়ে পাঠানো হত কেন? প্রাচীন বাংলায় লৌকিক-সাংবাদিকের সম্মান পেত নাপিতরা। দশ গ্রাম ঘুরে এরা কাজ করত, চুল কাটতে কাটতে নাপিতের মুখ থেকে শুনে নিত নানান কথা। এক গ্রামের সংবাদ এদের মুখ দিয়েই পৌঁছে যেত অন্য গ্রামে। বিয়ের শুভ সন্দেশ (সংবাদ) চিঠির সঙ্গে শুকনো মিষ্টি 'সন্দেশ' তাদের হাত দিয়েই পাঠিয়ে দেওয়া হত। এই সংবাদ সূত্রেই শুকনো ছানার মিষ্টিটি নাম পায় 'সন্দেশ'।"

এই মিষ্টি সন্দেশটি যেত থালায় করে। দেখা যেত রাস্তাতেই থালার সন্দেশ কিছুটা কমে যেত, তাই থালার জায়গায় এল হাঁড়ি। এ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন— "পাছে নাপিত হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেয়ে ফেলে এই জন্য হাঁড়ির মুখে সরাটা উল্টে দিয়ে ময়দা গুলিয়া চারিদিকে লাগাইয়া দেওয়া হইত। তাহাকে ওলপ [কুলুপ] দেওয়া বলে। 'এই জন্যে মেয়েরা পরস্পর ঠাট্টা করিত। 'ওলো, তুই যে মুখে ওলপ [কুলুপ] দিয়েছিস, তোর মুখে রা নাই।'" সন্দেশে বিখ্যাত ছিলেন ভোলা ময়রা (১৭৭৫-১৮৫১), ভীম নাগ আর গিরিশ চন্দ্র দে। রসগোল্লায় নবীন ময়রা। মনোহরা, প্রাণহরা, দেলখোস দরবেশ, মধুক্ষরা, আবার খাবো, অবাক নামের মিষ্টিরা শেষ পাতে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে কতবার। গোট পাড়ার ঝুরো সন্দেশ, খাগড়ার মণ্ডা, বর্ধমানের সীতাভোগ, মুড়োগাছার ছানার জিলিপি আজ মিথে পরিণত।

যমদত্তর ডায়ারী খ্যাত যতীন্দ্রমোহন দত্ত সন্দেশ নিয়ে একখানা গোটা সন্দর্ভ রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখছেন, 'যে যে প্রকারের সন্দেশ খাইয়াছি তাহার নাম দিতেছি, আপনারা যদি খাইয়া থাকেন তো বুঝিতে পারিবেন কি জিনিষ বাঙালি হারাইল। ১)

পানিহাটীর গুঁপো, ২) সোদপুরের রামচাকি, ৩) রানাঘাট শান্তিপুরের কাঁচাগোল্লা, ৪) পোড়াদহর সরের নাড়ু, ৫) জনাইয়ের মনোহরা, ৬) এঁড়েদার ভুতো ময়রার আমসন্দেশ, ৭) চন্দননগরের তালশাঁস, ৮) শিমুলিয়ার জলভরা তালশাঁস, ৯) মদন দত্তের কপাট ভাঙা কড়াপাক, ১০) সিমলার কড়াপাক, ১১) জোড়াসাঁকোর বাতাবি সন্দেশ, ১২) আবার খাবো, ১৩) অবাক, ১৪) গোলাপ ফুল, ১৫) কাঁচা আমের গন্ধযুক্ত আম সন্দেশ, ১৬) মনোরঞ্জন, ১৭) কস্তুরি, ১৮) ডিম সন্দেশ, ১৯) কাঁটা ডিম, ২০) বিস্কুট সন্দেশ, ২১) চপ সন্দেশ, ২২) আতা, ২৩) বরফি, ২৪) চকোলেট সন্দেশ, ২৫) ক্ষীরের সন্দেশ, ২৬) আইস-ক্রিম সন্দেশ।'

সূর্য মোদকের জলভরা সন্দেশের গল্প সবাই জানেন। তবু একবার বলেই দি। তখন ১৮১৮ সাল। বাংলায় তখন ইংরেজ শাসন চালু হলেও আনাচেকানাচে দু-চারটে জমিদারি তখনও টিকে আছে বহাল তবিয়তে। আয় যেমনই হোক, আদবকায়দায়, ঠাটেবাটে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা পুরোপুরি বর্তমান। এমনই এক জমিদার ছিলেন ভদ্রেশ্বরের তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। বাড়ির মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পরে মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি জামাই নিয়ে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে। তখন আবার জামাইঠকানো বা বউঠকানো বহু প্রথা চালু ছিল। এখন সেগুলো বোকা বোকা মনে হলেও তখন এইসব প্রথা রমরম করে চলত। সে যাই হোক, জামাইকে ঠকাতে হবে। কী করা যায়? ঠকানোও হল আবার জামাই বাবাজীবন রাগও করতে পারলেন না, এমন কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

অনেক ভেবে তেলিনীপাড়ার জমিদারবাড়িতে তলব হল এলাকার নামকরা ময়রা সূর্যকুমার মোদকের। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল এমন একটা মিষ্টি বানাতে হবে যা দিয়ে জামাই ঠকানো যাবে অথচ তাঁর মানসম্মান যেন কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়। বহু ভাবনাচিন্তা করার পর মোদক মহাশয় একটা বিশাল আকারের মিষ্টি বানালেন, যার ভেতরে জল ভরা থাকে, অথচ বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনও উপায়ই নেই। সেই মিষ্টি দেওয়া হল জামাইয়ের পাতে। মিষ্টিতে মাতোয়ারা জামাই সেই মিষ্টি হাতে নিয়ে দিলেন বিশাল এক কামড়। আর যেই না কামড়ানো, মিষ্টির ভেতরের লুকোনো জল বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল জামাইয়ের সাধের গরদের পাঞ্জাবি। জামাই অপ্রস্তুত। হো হো করে হেসে উঠলেন শালা-শালিদের দল। ঘোমটার আড়ালে হাসিতে ভরে উঠল শাশুড়িদের মুখ আর জমিদারবাবু গোঁফে দিলেন তা। জন্ম হল জলভরার।

ধর্মচর্চার পীঠস্থান হওয়ার জন্য গুপ্তিপাড়াকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলা হত। ক্রমে 'গুপ্ত বৃন্দাবন পল্লী', তার থেকে 'গুপ্ত পল্লী' এবং পরিশেষে গুপ্তিপাড়া নাম হয়। কথিত আছে যে

গুপ্তিপাড়াতেই সন্দেশের জন্ম। এখানেই প্রথম তৈরি হয় সন্দেশের মিশ্রণ, যা মাখা সন্দেশ নামে পরিচিত। পরে সেই মাখা সন্দেশকেই আকার দিয়ে তৈরি হয় গুপো সন্দেশ। এই সন্দেশ জনপ্রিয় হলে তা 'গুপ্তিপাড়ার সন্দেশ' বা সংক্ষেপে 'গুপো সন্দেশ' বলে পরিচিতি লাভ করে। অপর মতে অবশ্য সন্দেশটি খাওয়ার সময় গোঁফে লেগে যায় বলে তার নাম হয়েছে গুঁফো সন্দেশ।

সন্দেশ নিয়ে গোটা একটা বই হয়ে যায়। অত বাড়াবাড়ি না করে দুটো কথা বলে আলোচনা থামাই। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন বাজারে সন্দেশের আকাল পড়েছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুনের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি : 'দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠাজানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রানী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসি তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল,... আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাজার দূরে থাকুক, পানিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমত জনরব যে ৫০০ মোন সন্দেশ হয়... বাঙ্গালি লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া... বিদায় হইয়াছে।' ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার খরচের একটি ফর্দ পাওয়া যায়, ওই ফর্দ অনুসারে ওই দুর্গাপুজোয় মোট খরচ হয়েছিল ৮০ টাকা ১৪ আনা ২ পাই পয়সা। এর মধ্যে প্রতিমার দাম ৫ টাকা, এক মন ঘি কেনা হয়েছিল ৫ টাকা, ৪ মন ময়দা ২ টাকা ৬ আনা। ক্ষীর কেনা হয় ৫ টাকার, সন্দেশ ৭ টাকার। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় নীলমণি মিত্র স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ মিত্রের বাড়িতে যে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে এক মন খাসা সন্দেশ কেনা হয়েছিল ১৫ টাকা দিয়ে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এক মন সন্দেশ ১৬ থেকে ২০ টাকার মধ্যে বিক্রি হত বলে রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন। সাধে কি আর যম দত্ত বলেছিলেন, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন হইতেছে সন্দেশ। শ্রাদ্ধ বাড়িতে কেহ পিণ্ডদানের আগে কিছু খাইতেন না ইহাই ছিল নিয়ম... কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ডাব ও সন্দেশ খাইতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের সঙ্গে আটটা করিয়া কাঁচাগোল্লা, না [দিতে] পারিলে ছানা ও চিনি দেওয়া হইত, মেয়ের বাড়ির খবর আনিতে লোক যাইবে— এক থালা সন্দেশ খোঞ্চেপোষ ঢাকা দিয়া লোক যাইত। তত্ত্বর কথা বাদই দিলাম। বিবাহে সন্দেশ না হইলে প্রায় বিবাহ হইত না। আমার নাতি হইয়াছে, পাড়ায় পাঁচ বাড়িতে সন্দেশ বিলি করা হইল। নাতির অন্নপ্রাশনের ত কথাই নাই। তোমার নাতির ভাতে সন্দেশ খাইব— এটি একটি আদরের আবদার। ছেলে

পাশ করিয়াছে সন্দেশ খাওয়াও...।’

রসগোল্লা

রসগোল্লা! বাঙালি এমন নস্টালজিক এই গোলাকার মিষ্টিটি নিয়ে, যার তুলনা আর কোথাও পাবেন না। মুশকিল হল, কোথায় প্রথম এই বস্তুটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তা নিয়ে যথেষ্টই বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন রসগোল্লার প্রথম আবির্ভাব কলকাতায় নয়, ওড়িশাতে। মধ্যযুগে কোনও এক সময় পুরীতেই নাকি রসগোল্লার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। কটকের কাছে সালেপুরের রসগোল্লার যশ এখনও ঈর্ষণীয়। ভুবনেশ্বরের পহলার রসগোল্লাও নামকরা। তবে সেরা রসগোল্লার কারিগরেরা বেশিরভাগই যে এই শহর কলকাতারই, সে বিষয়ে ঐকমত্য দেখা দেয়নি। সালেপুরে বিকলানন্দ কর নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম রসগোল্লা তৈরির কৌশল বের করেন। স্থানীয় দেবদেবীদের নৈবেদ্য প্রস্তুত করতেই এই খাদ্যবস্তুটির আবির্ভাব ঘটে। বাংলার তৎকালীন অবস্থাপন্ন লোকেরা বাড়িতে ওড়িয়া রাঁধুনি রাখতেন। তাঁরাই প্রথম বাড়ির মালিক-মালকিনদের তুষ্ট করতে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করা শুরু করেন।

১৮৬৮ সাল নাগাদ বাগবাজারের নবীনচন্দ্র দাস রসগোল্লাকে বিশেষ স্বাদযুক্ত করে বাজারজাত করলেন। যদিও নবীন দাস প্রথমে রসগোল্লা নয়, বানিয়েছিলেন সন্দেশ। তারপর এই শুকনো মিষ্টির জায়গায় আনলেন রসালো মনভরানো রসগোল্লা। তবে ঘটনা হল প্রথমে বাঙালি নবীন দাসের রসগোল্লাকে ভালোমতো নেয়নি। বেশি সময় ধরে ফোটানো হত বলে দেবতারা নাকি তা পছন্দ করবেন না এমনটাই মনে করতেন তাঁরা। কথিত আছে, একদিন ভগবানদাস বগলা নামে জনৈক ব্যবসায়ী গ্রীষ্মের দুপুরে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাগবাজারের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে প্রচণ্ড গরমে খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে ব্যবসায়ীর পুত্র। এমন সময় তিনি নবীন দাসের দোকান দেখতে পেলেন। দেখেই ছেলেকে নিয়ে দোকানের সামনে এসে থামলেন। বগলার ছেলেটি তখন এতই তৃষ্ণার্ত যে চলার শক্তিটুকুও তার ছিল না। বাধ্য হয়ে বগলা দোকানদারের কাছে এক গ্লাস জল চাইলেন। দোকানির দয়া হল। তিনি ছেলেটিকে জলের সঙ্গে একখানা রসগোল্লাও খেতে দিলেন। মিষ্টির স্বাদ পেয়ে ভগবানদাস বগলার ছেলে দারুণ তৃপ্ত হল, তার চোখে মুখে ফুটে উঠল আনন্দের ঝিলিক। ছেলের খুশি দেখে বাবাও খেয়ে ফেললেন একখানা রসগোল্লা। তারপর আরও একটা। রসগোল্লার অপূর্ব স্বাদে মুগ্ধ হয়ে পিতা-পুত্র মিলে পেটভরে খেলেন মিষ্টি। বগলা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য

বিপুল পরিমাণ মিষ্টির অর্ডারও দিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি নবীন দাসকে। দেখতে দেখতে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গেল তাঁর রসগোল্লার খ্যাতি। 'বাগবাজারের নবীন দাস'-ও হয়ে উঠলেন 'রসগোল্লার কলম্বাস।' প্রথমে মাটির ভাঁড়ে রসগোল্লা দেওয়ার রীতি ছিল। ফলে রসগোল্লা বাইরে পাঠানো ছিল সমস্যার। ছিল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ও। এই সমস্যার সমাধানও মিলল নবীন দাসের ছেলে কে সি দাসের হাত ধরে। তিনি রসগোল্লাকে কৌটোজাত করে শুধু অন্য রাজ্যগুলিতেই নয়, বিদেশেও পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হলেন।

কে শি দাসের রসগোল্লার বিজ্ঞাপন

হরিপদ ভৌমিক অবশ্য বাংলার রসগোল্লা নিয়ে সোচ্চার। তিনি বলছেন, “ওড়িশা থেকে যে দাবি করা হয়েছে তাতে রসগোল্লার জন্ম পুরীতে। কোন সময়ে এই রসগোল্লার আবিষ্কার তা নিয়ে ওখানকার গবেষকগণ এক-একজন এক-এক রকম সময় নির্ধারণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন রসগোল্লার জন্ম সময় সঠিক ভাবে জানা যায় না। কেউ বলেছেন ৩০০ বছর, কেউ ৬০০ বছর, কেউ ৭০০ বছর, আবার একজন দাবি করেছেন ১১ শতক অর্থাৎ ৯০০ বছর। আসলে কেউই জানেন না কোন সময়ে রসগোল্লার জন্ম। এই না জানার কারণ আসলে পুরীতে ছানার রসগোল্লার জন্মই হয়নি। পুরীর দাবি অনুযায়ী রসগোল্লাটির নাম ‘ছানার ক্ষীরমোহন রসগোল্লা’। এই রসগোল্লাটি যে অপবিত্র ছানায় তৈরি হয়নি, পরের ‘ক্ষীর’ শব্দটি থেকে পরিষ্কার। ছানাকে কখনোই ক্ষীর বলা হয়নি বা এখনও হয় না। প্রথম রসগোল্লা লক্ষ্মীদেবীকে খাওয়ানো হয়েছিল। যদি তাই হয়ে থাকে, তা হলে প্রথম যে দেবতাকে নিবেদন করা হয়, তাঁর নামানুযায়ী নামকরণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু এই মিষ্টির ক্ষেত্রে তা হয়নি। নাম ‘ক্ষীরমোহন’, এই মোহন শব্দে মদনমোহনরূপী শ্রীকৃষ্ণ মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের নামের মিষ্টি প্রথম লক্ষ্মীদেবীকে নিবেদিত হল কোন তথ্যের ভিত্তিতে তা বোঝা গেল না। আর মিষ্টিটি যে ছানার রসগোল্লা তার তথ্য কোথায়। উনিশ শতকের আগে ছানার রসগোল্লার নাম কোথাও পাওয়া যায় না। তবে ক্ষীর দিয়ে গোল্লা করে রসে নিষিক্ত করে ‘ক্ষীরগোলা’ নামে ক্ষীরের একটি মিষ্টান্ন তৈরি হত ১৮৩১ সালে ছানা ‘পাকরাজেশ্বর’ গ্রন্থে দেখা যায়। এই ক্ষীরগোলককে যদি গোল্লা শব্দ যোগ করে ক্ষীরগোল্লা বা ক্ষীরের রসগোল্লা বলে কেউ দাবি করেন তা হলে তো তা ছানার রসগোল্লা হবে না, হবে ক্ষীরের রসগোল্লা।”

জিলিপি

বাঙালির রথযাত্রায় যে মিষ্টি একেবারে হিট, সে হল জিলিপি। রসগোল্লা যদি বাঙালির ঘরের খাওয়া হয়, তবে মেলার মিষ্টিতে জিলিপিকে হারানো মুশকিল। সোনালি আড়াই প্যাঁচ, মুচমুচে স্বাদ, প্রতি কামড়ে ভিতর থেকে বেড়িয়ে আসা চিনির শিরা... দু আঙুলে ধরে টপ করে মুখে ঢোকানোর আনন্দই আলাদা। শিঙাড়ার সঙ্গে একেবারে মানিকজোড় এই জিলিপি... তবে দাঁড়ান মশাই, রসগোল্লার মতো এই মিষ্টিকে আমাদের বলে দাবি করলে মুশকিল আছে। জিলিপির সর্বাধিক পুরোনো লিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় মুহম্মদ বিন হাসান আল-বোগদাদীর লিখিত ১৩শ শতাব্দীর রান্নার বইতে, যদিও মিশরের ইহুদিরা এর আগেই খাবারটি আবিষ্কার

করতে সক্ষম হয়েছিল। ইরানে এই মিষ্টান্ন জেলেবিয়া নামে পরিচিত, যা সাধারণত রমজান মাসে গরিব-মিশকিনদের মাঝে বিতরণ করা হয়। মধ্যযুগে পারসি ভাষাভাষী তুর্কিরা খাবারটিকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। বাংলাদেশে রমজান মাসে ইফতারিতে এটি একটি জনপ্রিয় খাবার। শুধু মধ্য এশিয়া না, প্রায় গোটা এশিয়াই জিলিপির রস চেটে চেটে খেয়ে চলেছে বহুদিন ধরে। ইরানে এর নাম জালাবিয়া, মালদ্বীপে জিলিপি, তিউনিসিয়া, লিবিয়া এবং আলজেরিয়াতে জিলিবিয়া এবং নেপালে একে বলা হয় জেলি। ভারতে ঠিক কবে জিলিপি এসেছে বলা মুশকিল। তবে তা প্রথম এসেছিল পশ্চিম দিক থেকে। তাই ভারতেরও পশ্চিম, মানে রাজস্থানে জিলিপি নম্বর ওয়ান ডেসার্ট। জানা যায়, মুঘল যুগে বাদশাদের খাদ্যতালিকায় জিলিপির প্রবেশ ঘটে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে। এই মিষ্টি জাহাঙ্গীরের এত প্রিয় ছিল যে, তিনি এই মিষ্টির সঙ্গে নিজের নাম জুড়ে দিতে দ্বিধা করেননি। তিনি নাম রেখেছিলেন 'জাহাঙ্গিরা।'

১৫শ শতকের ভারতে জিলিপিকে 'কুণ্ডলিকা' বলা হত। ওই আড়াই প্যাঁচের জন্যই বোধহয়। ইলাহাবাদ বা ত্রিবেণীতে বসে পেট ভরে জিলিপি খেলে নাকি পুনর্জন্ম হয় না। বেচারা বুদ্ধদেব এই খবর জানতেন না। জানলে শিয়োর তাঁর তিনটে পিটকের বদলে এই শর্টকাটটা নিতে বলতেন। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ "গুন্যগুনবধিনী"-তে জিলাপি প্রস্তুত করার জন্য যে উপাদানের তালিকা পাওয়া যায়, তার সাথে আধুনিক জিলাপি রন্ধন প্রক্রিয়ার যথেষ্ট মিল রয়েছে। পয়ার ছন্দে লেখা এই বইতে জিলিপির ফুল রেসিপি দেওয়া আছে। কিছুদিন আগে অবশ্য ১৪৫০ সালে জৈন সাধু জিনসুরের লেখা "প্রিয়ঙ্কর রূপরেখা"-তে জিলিপির উল্লেখ পাওয়া গেছে। সপ্তদশ শতকে রানি দীপাবাই-এর সভাকবি রঘুনাথের দক্ষিণ ভারতের খাবার নিয়ে প্রামাণ্য কুকবুক "ভোজনকুতূহল"-এও জিলিপি সগৌরবে উপস্থিত।

সলভিনস এর আঁকা পুরোনো কলকাতার হালুইকর

এবার আসি আসল প্রশ্নে। রথের মেলার সঙ্গে জিলিপির কী সম্পর্ক। ঘটনা হল জগন্নাথদেবকে তো ছানার মিষ্টি দেওয়া যায় না, আমরা জানি। যারা জানি না, তাঁদের বলি দুধ কেটে বা ছিন্ন করে ছানা তৈরি হয়, ফলে দুধের গুণ নষ্ট হয়, এমন কিছু একটা কনসেপ্ট কাজ করত। পুরীতে তাই জগন্নাথ গজা খান, আর ছানা খেলেও সেটা পুড়িয়ে ছানাপোড়া বানিয়ে খান। বাংলায় তাই জগন্নাথের মেলায় রসগোল্লা প্রথমেই বাদ। যা রইল, তা তপ্ত

কটাহে ভাজা ভাজা হওয়া পবিত্র জিলিপি। বাংলার ময়রারা আবার এক কাঠি উপরে। তাঁরা ময়দার বদলে ডাল ব্যবহার করে বানিয়েছেন জিলিপির ভায়রা ভাই অমৃতি। অমৃতি বা অমৃত্তি বা আমিত্তি কিছুটা জিলিপির মতো দেখতে খাবার, তবে এর রং সাধারণত লাল বা কমলা হয় এবং এটা খেতেও জিলিপির থেকে আলাদা হয়। এটি তৈরি হয় অড়হর ডাল ভিজিয়ে বেটে সেটি ভেজে। কোথাও কোথাও একে আমিত্তি পিঠা হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। দ্বারিকের জিলিপির গল্প দিয়ে শেষ করি। সিউড়ির ১০৫ বছর ধরে দাতা সাহেবের পাথরচাপড়ি মেলায় আসছে তাঁতিপাড়ার দে পরিবার। তাঁরা জিলিপি তৈরিতে বিখ্যাত। যে দাতাবাবার নামে এই মেলা হয়, দে পরিবারের পূর্বপুরুষ অমৃতলালের জিলাপি খেয়ে দাতাবাবার খুব ভালো লেগেছিল। সেই তাঁর আমন্ত্রণে মেলায় যাওয়া। প্রথম জিলিপি দাতাবাবাকে তুলে দিয়ে তারপরে মেলায় বেচাকেনা করতেন। বর্তমানে সেই রীতি চলছে। আগে দাতাবাবার মাজারে জিলিপি উৎসর্গ করা হয়, তারপরে দোকান শুরু। এলাকার ইতিহাস বলছে সেসময়ে কড়িধ্যা থেকে একটি মনোহারি ও নটকনা সামগ্রীর দোকান আসত। সময়ের কালে সেসব বিলীন হয়ে গিয়েছে। শুধু জিলাপির টানে এখনও আসে দ্বারিকনাথের দোকান। মেলায় আসার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি চলে। তাঁতিপাড়ায় এখনও ঢেঁকি আছে। একমাস আগে থেকে তাতেই বিউলির ডাল, আতপ চালের গুঁড়ো তৈরি করতে হয়। কারণ বন্ধুত্বের সঙ্গে জিলাপির মানকেও মলিন হতে দেয়নি চতুর্থ প্রজন্মের দে পরিবার।

জিলিপি বোধহয় একমাত্র মিষ্টি, যা দিয়ে মানুষের চরিত্র বর্ণনা করা হয়। "জানিস তো ওঁর মনে জিলিপির প্যাঁচ", মানে মানুষটি সুবিধার নন মোটেই। জিলাপির প্যাঁচ বললেই কেমন যেন কূটচালের ব্যাপারটি ভেসে আসে। মোটামুটি আড়াই প্যাঁচের হলেও বাস্তবে পাঁচ পেঁচে, কখনও ছয় পেঁচে জিলাপি তৈরি করা কিন্তু সহজ কথা নয়। আর ২০ পেঁচের শাহি জিলাপির কথা শুনে তো অনেকের জিবে জল চলে আসে। পুরোনো ঢাকার কারিগরদের হাতের প্যাঁচে জিলিপি তৈরি দেখার ব্যাপার। শুধু দেখারই নয়, শাহি জিলিপি পুরোনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যেও পড়ে। শাহি জিলিপি সচরাচর দেখতে পাওয়া জিলিপির চেয়ে আকারে অনেক বড়ো। বিশাল আকৃতির এ জিলিপি দেখতেও আকর্ষণীয়। ঢাকার বাজারে তিন ধরনের জিলিপি আছে। বোম্বে জিলিপি, শাহি জিলিপি ও রেশমি জিলাপি। সবচেয়ে ছোটো জিলিপি হয় আড়াই প্যাঁচের। আর বড়ো জিলিপি ২০ পেঁচের, একে বলা হয় শাহি জিলাপি। এই জিলিপির প্রতিটির ওজন এক কেজি থেকে চার কেজি পর্যন্ত হয়। একটা একজন খেতে পারে না। পারলেও রাতে অন্য কিছু আর খেতে হয় না।

লেডিকেনি আর পান্তুয়া

চার্লস ক্যানিং ও তাঁর তরুণী স্ত্রী শার্লট ১৮৫৬ সালে পা রাখলেন ভারতের মাটিতে। ভারতে জনপ্রিয় গভর্নর জেনারেল হয়ে উঠতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু তার ঠিক পরের বছরেই শুরু হল সিপাহি বিদ্রোহ। তার আগেই অবশ্য শার্লটের অনুপ্রেরণায় চার্লস ক্যানিং শুরু করেছেন ভারতীয় অধিবাসীদের ওপর গবেষণামূলক কাজ। সিপাহি বিদ্রোহের সময় তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা পরের বছরেই তাঁকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ভাইসরয় হিসাবে অধিষ্ঠিত করে।

লেডি ক্যানিং

ততদিনে চার্লস ক্যানিংয়ের মতোই শার্লটও পরিচিত হয়ে গেছেন লেডি ক্যানিং নামে। এখনকার সেলিব্রিটিদের মতোই তখনও লর্ড অ্যান্ড লেডি ক্যানিংয়ের বিবাহিত জীবন নিয়েও আলোচনা কম হত না। বিশেষ করে লেডি ক্যানিং হয়ে উঠলেন জনপ্রিয় এক চরিত্র। হাজার হোক, ভাইসরয়ের স্ত্রী বলে কথা। তারপর তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর সহানুভূতিশীল। অসাধারণ রূপবতী এবং দক্ষ চিত্রশিল্পী। ফুল ও গাছের প্রতি ছিল ভালোবাসা। ব্যারাকপুরের বাড়িতে তাঁর নিজের হাতে লালিত বাগান ছিল দেখবার মতো। লর্ড ক্যানিং যদিও ভারতীয়দের কাছে কিছুটা নিন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু লেডি ক্যানিং হয়ে উঠেছিলেন খুব জনপ্রিয় এক চরিত্র।

ক্যানিংয়ের শাসনদক্ষতা ইংল্যান্ডেও সাড়া ফেলে দিল। ভালোই কাটছিল সব, কিন্তু সুখের দিন বেশি দিন টিকল না। ১৮৬১ সালে দার্জিলিং যেতে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে লেডি ক্যানিং মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। ব্যারাকপুরে তাঁকে সমাহিত করা হল। পরে সেই সমাধি সরিয়ে আনা হয় কলকাতার সেন্ট জন'স চার্চে। তারপর লর্ড ক্যানিংও ফিরে গেলেন স্বভূমিতে। লেডি ক্যানিংয়ের মৃত্যুর পর কলকাতায় বেশ কিছুদিন চর্চা হল তাঁর নামের। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে কলকাতার বিখ্যাত ময়রা ভীম চন্দ্র নাগ বানিয়ে ফেললেন এক নতুন মিষ্টি, নাম দিলেন 'লেডি ক্যানিং'। 'বাঙ্গালা' যেমন ইংরেজদের মুখে মুখে বেঙ্গলি হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনিই নতুন মিষ্টি 'লেডি ক্যানিং' চলতি কথায় হয়ে উঠল 'লেডিকেনি'। এইভাবে ভারতের প্রথম ভাইসরয়-পত্নীর নাম থেকে গেল বাংলার মিষ্টির মধ্যে। প্রায় সব সরকারি অনুষ্ঠানে একবাক্যে জায়গা পেতে লাগল লেডিকেনি। এমনকি সেকালের ভোজবাড়িতেও একসাথে উচ্চারিত ও পরিবেশিত হল 'রসগোল্লা-লেডিকেনি'। কেউ কেউ বলেন লেডি ক্যানিংয়ের ভারতে আগমনের উদ্দেশে ভীম নাগ এই মিষ্টি বানিয়েছিলেন। কেউ বলেন লেডি ক্যানিংয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে লর্ড চার্লস ক্যানিং-ই অর্ডার দিয়ে ভাজা রসের মিষ্টি বানিয়েছিলেন। তবে লেডি ক্যানিংয়ের নাম যে এই মিষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেকথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

লেডিকেনির মতো আর-একটা মিষ্টি বাংলায় অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয় ছিল। পান্তুয়া। শুদ্ধ বাংলায় 'পানিতোয়া'। প্রথমে এই পান্তুয়া ঘরে বানানো হত এবং উপকরণ ছিল রাঙালু। কিন্তু পান্তুয়ার সঙ্গে লেডিকেনির তফাত ছিল। দুটোই ছানা আর খোয়াক্ষীর মিশিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু লেডিকেনিতে ছানার ভাগ থাকে বেশি, আর পান্তুয়াতে খোয়াক্ষীর বেশি।

কলকাতার বাইরে রানাঘাটের লেডিকেনি বিখ্যাত। কিন্তু এখন সেই আসল লেডিকেনি

অনেক মিষ্টির দোকানেই আর পাওয়া যায় না। তার জায়গা নিয়েছে গোলাপজাম। আর আসা মাত্রই নিরীহ গোবেচারা গোলগাল লেডিকেনিকে একেবারে দেশছাড়া করে ছেড়েছে। তাই এখন রেস্টুরেন্টে, বাফেট মেনুতে কিংবা অভিজাত গেট-টুগেদারে গুলাবজামুনের রমরমা। আসল লেডিকেনি শুকনো মিষ্টি নয়, বরং রসগোল্লার মতোই রসে ডোবানো। তবে গুলাবজামুনের মতো ঘন হলদেটে রস নয়, বরং রসগোল্লার মতো পাতলা আর কম মিষ্টির রসে ডোবানো। লেডিকেনির ভেতরে একটা গহ্বর থাকে, যাতে থাকে কিছুটা রস আর একটা এলাচ। এই এলাচ হল লেডিকেনির আসল পরিচয়। তবে এখন উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার হাতে গোনা কয়েকটা দোকান ছাড়া আর কোথাওই আদি-অকৃত্রিম লেডিকেনি পাওয়া যায় না।

ক্রেপ সুজেত

ক্রেপ শুনলেই ব্যান্ডেজ মনে হয়। আসলে ফরাসি শব্দ ক্রেপ এসেছে ল্যাটিন ক্রিস্পাস থেকে, মানে কোঁচকানো, বা কুঁকড়ে যাওয়া। মধ্যযুগে ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমের ব্রিটানিতে বাজরার ময়দায় মিষ্টি আর সাইডার মাখিয়ে তৈরি হত এই সুখাদ্য। পিনাকী ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, “ফরাসি দেশের ক্রেপ প্রীতি এতটাই প্রবাদপ্রতিম যে ২ ফেব্রুয়ারির ছুটি ‘লা শান্দেলিয়ঁ’-র অপর নাম হল ‘জ্যর দ্য ক্রেপ’। সে দিন ওই দেশে সারা দিন ধরে প্রচুর পরিমাণে ক্রেপ খাওয়া হয়। ওই দেশের মানুষের এক সংস্কার হল ডান হাতের মুঠোয় একটা কয়েন রেখে বাঁ হাতে ক্রেপ রান্না করতে করতে ক্রেপটাকে শূন্যে ‘টস’ করা। যদি সেই ‘টস’ করা ক্রেপ আবার চাটুর ওপর এসে পড়ে, মনে করা হয় বাকি বছরটা পরিবারের কোনও অভাব থাকবে না।” সব ক্রেপের মধ্যে সেরা হল ক্রেপ সুজেত। কিন্তু এই ক্রেপের আবিষ্কার একেবারেই দুর্ঘটনা। ১৮৯৫ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস হাজির হয়েছেন মন্টি কার্লোর কাফে দে প্যারিসে। সঙ্গে তাঁর রক্ষিতা আর পারিষদবর্গ। সেদিন সেই ক্যাফেতে চৌদ্দ বছরের অঁরি সার্পেন্টেয়ার নামে এক ওয়েটারকে দায়িত্ব দেওয়া হল শেষপাতের মিষ্টিমুখের। এমন সময় হল এক কাণ্ড! কী কাণ্ড? ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী ‘লাইফ আ লা অঁরি’-তেই দেখে নেওয়া যাক—

“আমি প্যানকেকের চাটুটার পাশেই ছিলাম, এমন সময় মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় গোটা চাটুতে আগুন ধরে গেল। ভাবলাম গেল গোটা রান্নাটা! এদিকে রাজপুত্র আর তাঁর বন্ধুরা অস্থির হয়ে পড়েছেন। কী করি? আবার নতুন করে বানাব? একটু চেখে দেখলাম। দারুণ লাগল। মিষ্টির এমনতর স্বাদ আগে কোনোদিন পাইনি। বুঝলাম এই আচমকা জ্বলে গিয়েই

মিশ্রণের উপাদানগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে একত্র হয়ে এই স্বাদের জন্ম দিয়েছে। যা থাকে কপালে ভেবে রাজপুত্রের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি একটা কাঁটা দিয়ে কেকটা আর সিরাপটাকে ম্যানেজ করতে একখানা চামচ নিলেন। যখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই অদ্ভুত স্বাদের মিষ্টির নাম কী, বললাম ক্রেপ অউ প্রিন্স। রাজকুমার ছদ্মরাগ দেখিয়ে বললেন, সামনে এক মহিলা আছেন দেখতে পাচ্ছ না? মহিলাও উঠে দাঁড়িয়ে বাও করলেন। রাজকুমার তারপর আমায় খুব নরম ভাবে বললেন, 'তুমি কি এই ক্রেপের নাম ক্রেপ অউ প্রিন্স থেকে বদলে ক্রেপ সুজেত রাখবে?'" পরদিন রাজকুমার তাঁকে একটা রত্নখচিত আংটি, পানামা হ্যাট আর লাঠি উপহার দিয়ে গেলেন। জন্ম নিল ক্রেপ সুজেত।

আইসক্রিম

কীভাবে জানি না, গত পাঁচ-সাত বছরে ভোজবাড়ির ডেজার্ট হিসেবে আইসক্রিম অপরিহার্য হয়ে গেছে। বাঙালি মিষ্টিতে আইসক্রিম সন্দেশ ঢুকে একে বাঙালি বানিয়ে দিয়েছে একেবারে। ঠিক কবে, কীভাবে এর শুরু হল জানা নেই। তবে ওই যে, গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায়, ৬২ খ্রিস্টাব্দে। রোমের রাজা নিরো রাজ্যের বাবুর্চির কাছে নতুন মুখরোচক কিছু খেতে চাইলেন। বাবুর্চি তখন রাজার এক কর্মচারীকে পাঠালেন অ্যাপেনাইন পাহাড় থেকে কিছু বরফ নিয়ে আসতে। বরফের সাথে বাদাম আর মধু মিশিয়ে রাজাকে পরিবেশন করলেন। রাজা কিছুটা ভয়ে ভয়ে মুখে দিলেন এক চামচ। মুখে দিতেই কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। সাথিরা সকলেই ভয়ে ভয়ে রাজার পানে চেয়ে রইলেন। রাজা চোখ খুলেই এক পরম তৃপ্তির মুখ করে বললেন, 'ওহে, কোথা পেলে এমন মজাদার জিনিস?' ব্যস! সেই প্রথম আইসক্রিম বানানো হল। তবে অনেকে বলেন আইসক্রিমের ধারণা আরও প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের বাজারে বরফকুচির সাথে মধু আর ফল মিশ্রিত একধরনের খাবার পাওয়া যেত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস আইসক্রিম খাওয়াকে বেশ উৎসাহিত করেছিলেন আর কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন, 'আইসক্রিম জীবনে প্রাণের সঞ্চার করে আর বেঁচে থাকার উদ্দামতা জোগায়।' আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট ফুলের মধুতে বরফ দিয়ে খেতে ভালোবাসতেন। এদিকে বাইবেলের রেফারেন্সে রয়েছে, রাজা সোলেমান ফসল কাটার মৌসুমে বরফ পানীয় খেতে ভালোবাসতেন। ধারণা করা হয় আইসক্রিম রেসিপির সূত্র এগুলোই।

রোম থেকে এই ঠান্ডা রঙিন মিষ্টি বরফের জাদু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বরফকুচির সাথে ফলের রস, মধু বা সিরাপ দিয়ে তৈরি হতে লাগল ভিন্ন স্বাদের 'অমৃত।' যখন এই এলাহি জিনিস বাগদাদের খলিফাদের কাছে এসে পৌঁছোল তখন এই জাদুর রং বেড়ে গেল আরও কয়েকগুণ। বরফের সাথে তারা বাদামকুচি, পেস্তা, বিভিন্ন ধরনের ফলের ব্যবহার শুরু করল। খলিফরাই প্রথম আইসক্রিমে চিনি মেশানো শুরু করে। এখানকার আরব বণিকদের মাধ্যমেই আইসক্রিমের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয়। চিনেও ব্যাপক প্রসার পায় এই আইসক্রিম। তারা এর মধ্যে ব্যাপকভাবে ফলের রস ব্যবহার শুরু করল। চিনের তাং শাসন আমলে (খ্রিস্টাব্দ ৬১৮-৯০৭) বরফের একরকম ডিশ রাজকন্যারা মজা করে খেতেন। তাং রাজার নাকি ৯৪ জন বরফ-বাহক কাজ করতেন। সেই ডিশ গরম দুধ, ময়দা এবং কর্পূর দিয়ে তৈরি হত। এরপর ওই মিক্সচার একটা ধাতব টিউবে ভরে মাটির নিচে রেখে দেওয়া হত। অনেক পরে ভারতে কুলফি এভাবে তৈরি হত।

তবে অনেক আবার বলেন, আরবের মুসলমানরাই সর্বপ্রথম আইসক্রিমের প্রধান উপাদান হিসেবে দুধকে ব্যবহার করেন। তাঁরা আইসক্রিমকে মিষ্টি করতে ফলের চেয়ে বেশি চিনি ব্যবহার করেন। ১০ম শতাব্দীর দিকে আরবের প্রধান শহরগুলোতে, যেমন বাগদাদ, দামেস্ক এবং কায়রোয় আইসক্রিম ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁরা বাণিজ্যিক আইসক্রিমগুলো তৈরি করতেন বরফ, ক্রিম, বাদাম, দুধ, গোলাপজল, শুকনো ফল ইত্যাদি দ্বারা। Maguelonne Toussaint তাঁর 'A History of Food' গ্রন্থে লিখেছেন, সম্ভবত চিনাদের শরবত ও আইসক্রিম তৈরির একটি যন্ত্র তৈরির কৃতিত্ব রয়েছে। তাঁরা ভরাট কন্টেনারে সিরাপের সাথে বরফ ও যব ক্ষারের মিশ্রণ ঢালত। যাতে নুনের মতোই জলের স্ফুটনাঙ্ক শূন্যের কোটায় নেমে যায়। ১২৬০ সালের দিকে ভারতের দিল্লিতে নাকি আইসক্রিমের প্রচলন শুরু হয়। তখন ভারতের মুঘল শাসকরা আইসক্রিম খেতেন এবং এটিকে পছন্দ করতেন। তাঁরা হিন্দুকুশ পর্বত থেকে ঘোড়ায় করে বরফ আনয়ন করতেন। সেই বরফ দিয়ে তাঁদের ও অতিথিদের জন্য বিশেষ শরবত তৈরি করা হত। ভারতীয় উপমহাদেশে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে তা দিয়ে নানা মুখরোচক খাবার তৈরি করা হত এবং বর্তমানেও হয়। মোঘল আমলে পেস্তা বাদাম ও জাফরান মিশিয়ে কুলফির দারুণ চল ছিল। তখন কুলফি ধাতব কোনে ভরে প্যাকেটজাত করেও বিক্রি হত। কুলফি বানানোর প্রক্রিয়া 'আইন-ই-আকবরী'তেও পাওয়া যায়। রাজকীয় রসুই ঘরের জনপ্রিয় খাবার হওয়ায় একে বইয়ে স্থান দেন। প্রচলিত অর্থে যাকে কুলফি বলা হয় তাকে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে সুগন্ধীযুক্ত করা হয়। যে পাত্রে জ্বাল দেওয়া হয় তার নিচে যেন লেগে না যায়, সেজন্যে দুধ ক্রমাগত নাড়া হয়। যখন দুধ ঘন হয়ে

পরিমাণে অনেক কমে আসে, তখন এতে এলাচ, জাফরান এবং পেস্তা বাদাম মিশিয়ে ঠান্ডা করতে দেওয়া হয়। সেই সময় মাটি-কাদার তৈরি পাত্রে রেখে এগুলো ঠান্ডা করা হত।

এদিকে মার্কো পোলো (যাঁর নাম এই বইতে বহুবার করা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে) দেশভ্রমণ করতে করতে এসে পৌঁছোলেন চিন দেশে। সেখানে মনভোলানো এই অমৃত খেয়ে মার্কো পোলোর চোখ ছানাবড়া। শিখে নিলেন রেসিপি। এরপর যখন আবার ইতালিতে ফিরে আসেন সাথে নিয়ে আসেন দিগ্বিজয়ী এই রেসিপি। নেপলসের স্পেনীয় ভাইসরয় আন্তোনিও লাতিনি (১৬৪২-১৬৯২) শরবতের একটি রেসিপি লিখে রেখেছিলেন। তিনি দুধ দিয়ে যে শরবত বানিয়েছিলেন, ইতিহাসে একেই প্রথম অফিশিয়াল আইসক্রিম বলে ধরে নেওয়া যায়। ইতালিয়ানরাই প্রথম আইসক্রিম তৈরিতে দুধের ব্যবহার করার কথা ভাবেন। ১৫৩৩ সালে ইতালির রাজকন্যা ক্যাথরিন ফ্রান্সের রাজা আঁরিকে বিয়ে করে যাচ্ছিলেন শ্বশুরবাড়ি। বায়না ধরলেন সাথে নিতে হবে তাঁর প্রিয় রাঁধুনি রগেরিকে, যার আয়ত্তে ছিল হরেক রকম আইসক্রিমের সিক্রেট রেসিপি। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা সম্মতি দিলেন রাঁধুনিকে সাথে করে নিয়ে যেতে। আর সেই থেকেই ফ্রান্সে আইসক্রিমের অনুপ্রবেশ। এই সেই ক্যাথরিন অফ মেদিচি, যিনি ফরাসি সসেরও জননী। ইংল্যান্ডেও আইসক্রিম নিয়ে মাতামাতি কম নয়। ১৭ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের টেবিলে রোজই দেখা যেত ক্রিম আইস নামক একটি খাবার। এই খাবার খেয়ে রাজা এতটাই আত্মহারা হয়েছিলেন যে তার প্রস্তুতকারক ডি মার্কোকে সারাজীবন হেসেখেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, বিনিময়ে রেসিপির ব্যাপারে কাউকে না জানাতে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কো সেই কথা রাখেনি। পরবর্তীতে তাঁর এই রেসিপি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভিক্টোরিয়ান যুগে আমেরিকা এবং নরওয়ে থেকে ইংল্যান্ডে আইসক্রিম আমদানি করা হতো। আমদানির ফলে এর দাম ছিল অনেক চড়া। তবে ১৬৬০ সালের আগে আইসক্রিম সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য ছিল না। এরপর প্যারিসের প্রথম ক্যাফে 'ক্যাফে প্রকোপ' দুধ, ক্রিম, মাখন ও ডিমের সংমিশ্রণে একটি রেসিপি উপস্থাপন করে। ১৮ শতকে এসে আমেরিকার হাত ধরে আইসক্রিমের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। দুধ, ক্রিম, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, র‍্যাস্পবেরি, চকোলেট, ম্যাংগো, এমন নতুন নতুন ফ্লেভার মিশিয়ে আধুনিক আইসক্রিম তৈরি করা শুরু হয়। আমেরিকায় আইসক্রিমের প্রথম সংস্করণ আসে ১৭৪৪ সালে। নিউইয়র্কে আইসক্রিমের প্রথম বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ১৭৭৭ সালের ১২ মে। তখন কনফেকশনার ফিলিপ লানজি ঘোষণা দেন, এটি প্রায় সবদিন শহরে পাওয়া যাবে। নিউইয়র্কের চ্যাথাম স্ট্রিটের এক ব্যবসায়ী হিসাব করেছিলেন,

প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ১৭৯০ সালের গ্রীষ্মে আইসক্রিমের পেছনে প্রায় দুশো ডলার খরচ করেছেন। আঠারোশো শতক পর্যন্ত আইসক্রিম ছিল অভিজাত শ্রেণির প্রিয় ডেজার্ট। ওই শতকের আশেপাশে উৎপাদিত আইসক্রিম শিগগির একটি শিল্প হয়ে ওঠে। প্রযুক্তির উন্নয়নের পর অন্যান্য আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রির মতো আইসক্রিম ইন্ডাস্ট্রিতেও উৎপাদন উর্ধ্বগতিতে চলতে থাকে।

আইসক্রিমের রেসিপি বই আকারে প্রথম বের হয় ১৭৬৮ সালে। নাম 'The Art of Making Frozen Desserts'। ২৪০ পৃষ্ঠার বইটিতে শুধু আইসক্রিমের রেসিপিই ছিল না, এখানে প্রতিটা আইসক্রিমের ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও ছিল। ১৭৭৪ সালে নিউইয়র্কের সংবাদপত্রে জনাব ফিলিপো লেঞ্জি জানাচ্ছেন যে তিনি সবেমাত্র লন্ডন থেকে পৌঁছেছেন এবং বিক্রি করবেন জ্যাম, জেলি, পেস্ট্রি আর আইসক্রিম। এটাই সম্ভবত ইতিহাসের প্রথম আইসক্রিমের বিজ্ঞাপন।
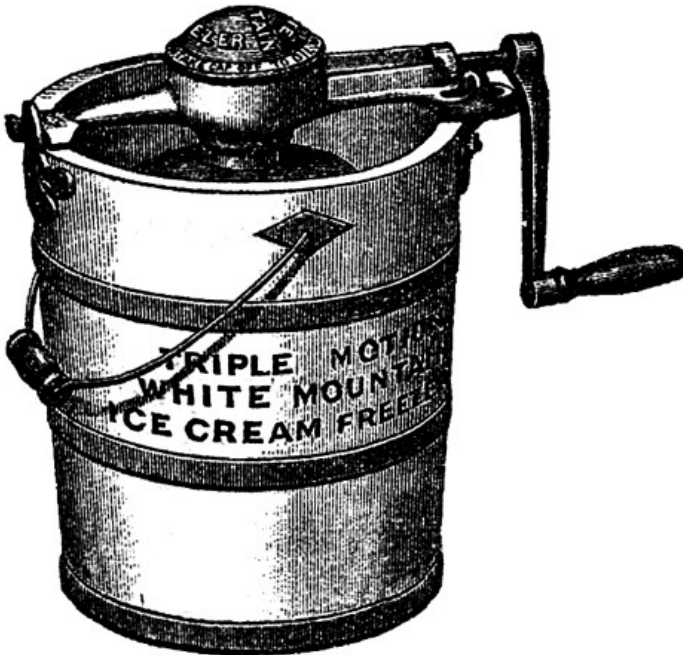
হাতে আইসক্রিম তৈরির যন্ত্র

১৮৪৩ সালে ন্যান্সি এম. জনসন (১৭৯৫-১৮৯০) আবিষ্কার করেন হ্যান্ড-আইসক্রিম তৈরির যন্ত্র। ওই যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে বসে সহজেই আইসক্রিম তৈরি করা যেত। ন্যান্সি ১৮৪৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যন্ত্রটি পেটেন্ট করেন। ১৮৫০ সালে কার্লো গাতি (১৮১৭-১৮৭৮) পেনি আইস বিক্রি শুরু করেন। গাতি আইসক্রিমের গাড়িকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যায় আইসক্রিম। প্রথম বিপুল পরিমাণে আইসক্রিম তৈরি করেন ১৮৫১ সালে মেরিল্যান্ডের জ্যাকব ফুসেল নিজের কারখানায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আইসক্রিমের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে চলে যায়। ১৯৪৫ সালে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নাবিকদের জন্য প্রথম ভাসমান আইসক্রিম পার্লার তৈরি হয়। যুদ্ধ শেষে দুগ্ধজাত পণ্যের রেশন প্রত্যাহার করা হয় ও আমেরিকানরা আইসক্রিম দিয়ে বিজয় উদযাপন করে। আইসক্রিম এত জনপ্রিয় হয়ে পড়ল যে ১৯৮৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোলান্ড রেগন পুরো জুলাই মাসকেই 'ন্যাশনাল আইসক্রিম মান্থ' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। পাশ্চাত্যের আইসক্রিম কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় মূলত ফ্লেভারের সংখ্যা নিয়ে। হাওয়ার্ড জনসন যদি তৈরি করে ২৮ রকম, তা হলে বাস্কিন রবিন্স তৈরি করবে ৩১ রকম। আর তাই খেয়াল করে দেখলে বাস্কিন রবিন্সের লোগোতে আজও BR-এর মধ্যে নীল রঙে লেখা ৩১ সংখ্যাটা চোখে পড়ে।

আইসক্রিমের নাম এলে সাথে যে নামটি মনের অজান্তেই চলে আসে সেটি হল 'কোন।' কোনের আবিষ্কারের পেছনেও আছে মজার ইতিহাস। ১৯০৪ সালে সেন্ট লুই-এর ওয়ার্ল্ড ফেয়ারে এক আইসক্রিমওয়ালা প্লেটে আইসক্রিম সার্ভ করে পেরে উঠছিলেন না। তখন তিনি ওয়াফল (এখন যাকে আমরা ওয়েফার বলি) বিক্রেতার কাছ থেকে ওয়াফলের কোনে আইসক্রিম ভর্তি করে আইসক্রিম বিলি করতে লাগলেন। আর এই যুগলবন্দি ক্রেতাদের মুখে এক অনবদ্য মুখরোচক খাবারের জন্ম দিল। আর সেই থেকেই রমরমিয়ে চলছে এই 'কোন আইসক্রিম।'

আর দুই রকমের আইসক্রিম দিয়ে অধ্যায় শেষ করব। প্রথম গল্প ফিলাডেলফিয়ার সোডার দোকানি রবার্ট গ্রিনের। ১৮৭৪ সালের এক প্রখর গরমের দিনে তাঁর সোডার দোকানে বরফ শেষ হয়ে যায়। এদিকে গরম সোডা খাবে কে? উপায় না দেখে চটজলদি ভদ্রলোক সোডার সঙ্গে আইসক্রিম মিশিয়ে আইসক্রিম সোডা বেচা শুরু করলেন। দেখতে দেখতে এই আইসক্রিম সোডা আমেরিকার জাতীয় ডেসার্টে পরিণত হল। গ্রিন এই আবিষ্কার নিয়ে এতটাই গর্বিত ছিলেন যে তাঁর কথামতো তাঁর সমাধিতে 'Originator of the Ice Cream Soda' খোদাই করা আছে।

এদিকে ১৮৮১ সালে উইসকনসিনের এড বার্নার খেয়াল করলেন আইসক্রিম সোডায় যে তরল চকোলেট দেওয়া হয় তা আইসক্রিমের উপরে দিলেও দারুণ খেতে লাগে। তিনি ফ্লোরা ডোরা বা চকলেট পিনি নামে এই আইসক্রিম বিক্রি করতে লাগলেন। এই রেসিপি জেনে ম্যানিটকের গির্জার ধারে জর্জ জিফি তাঁর দোকানে চকোলেট দেওয়া আইসক্রিম বিক্রি শুরু করেন। কিন্তু তাঁর ভিড় হত মূলত রবিবার, যেদিন সবাই গির্জায় আসতেন। জিফি তাই রবিবার ছাড়া এই স্পেশাল আইসক্রিম বানাতেন না। একদিন হয়েছে কী, এক ছোট্ট মেয়ে এসে তাঁর থেকে চকোলেট দেওয়া আইসক্রিম চাইছে। তিনি অনেক বোঝালেন, 'বাছা আজ তো রবিবার না, এই আইসক্রিম রবিবার ছাড়া পাওয়া যায় না।' সে মেয়েও নাছোড়। বারবার বলতে লাগল, 'আজকে আমার এই আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছে, তাই আজকে নিশ্চয়ই রবিবার।' বাধ্য হয়ে জিফি তাঁকে চকোলেট মাখানো ভ্যানিলা আইসক্রিম বানিয়ে দিলেন। কিন্তু মেয়েটার বলা 'This must be Sunday' কথাটা তাঁর মাথায় ঘুরতে লাগল। পরের রবিবার থেকেই তিনি এই আইসক্রিমের নাম দিলেন Sunday, যা ধীরে ধীরে লোকমুখে Sundae হয়ে গেল।

খায় যত পানীয়

অ্যাপারটিফ কাকে বলে?

এক কথায় এমন এক অ্যালকোহল যুক্ত তরল পানীয়, যা খিদে বাড়ায়। এই শব্দটা ফরাসি হলেও এর মূলে আছে ল্যাটিন অ্যাপেরের, যার মানে উন্মুক্ত করা। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে নতুন থিয়োরি আসে, সেই মতে মানুষের দেহ চারটি মূল হিউমার বা স্তম্ভে দাঁড়িয়ে। কবিরাজি অনুযায়ী যেমন বায়ু, পিত্ত আর কফ। এদের কোনও একটা বেড়ে বা কমে গেলেই শরীর খারাপ হতে বাধ্য। যদি রোগীর জ্বর হয় তো কিছু রক্ত মোক্ষণ করে দাও। যদি খিদে না পায় তাহলে তিতো কিছু খাইয়ে দাও, যাতে লিভারের পিত্তরস বেশি ক্ষরিত হয়ে খিদে বাড়িয়ে দেয়। ঠিক এই জায়গাতেই প্রথমে তিতো কিছু আয়ুর্বেদিক তরল থাকলেও ধীরে ধীরে ডুবোনেট, লিলেট বা ভারমুথের মতো তেতো মদ জায়গা করে নিল। অকারণ চিরতার জল খেয়ে খাওয়ার আগে কে মুড অফ করতে চায়? বরং খাবার আগে পানীয়র এই মৌতাত পানীয়লোভী ইউরোপীয়দের পানের একটা ডাক্তারি কারণ অন্তত দিল। ইউরোপ থেকে আমেরিকায় এই খাবার আগে মদ খাওয়ার সামাজিক নিয়ম আসতে খুব বেশিদিন লাগেনি। অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার ঘরে ঘরে অ্যাপারটিফ জাঁকিয়ে বসেছিল। জিন, টনিক, মার্টিনিরা আমেরিকার জাতীয় পানীয়ে পরিণত হয়। ইংরাজিতে ‘whetting your appetite’ নামে নতুন প্রবাদ চালু হয়ে যায়। এই whet মানে ধার দেওয়া বা তীক্ষ্ণ করা, আর তাই খিদেকে ধারালো করতে অ্যাপারটিফের জুড়ি নেই।

১৯৫০ সালে পাঞ্চ কার্টুন

জিন ও টনিক

জানি না কেন, কিশোর বয়সে শুনেছিলাম জিন নাকি ঘোড়া পান করে। আমি আজ অবধি একটাও মাতাল ঘোড়ার সাক্ষাৎ পাইনি, পেলে জিজ্ঞাসা করা যাবে তাদের এই জিন ভক্তির কারণ কী। অবশ্য পরে বুঝেছি গোটা ব্যাপারটা বিশুদ্ধ ফাজলামো। ঘোড়ার উপরে চড়ার মোটা কাপড়কে জিন বলে আর তাই খুব সহজেই এই ভিনদেশি পানীয়কে ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা হয়েছে মাত্র। যাই হোক, জিনের ইতিহাস কিন্তু বেশ ভয়ানক। আলাদিনের জিন কজনের প্রাণ নিয়েছে জানি না, তবে এই জিন অগুনতি মানুষের

মৃত্যুর জন্য দায়ী। এতটাই যে, এর আর-এক নাম Mother's ruin।

গোড়া থেকে বলা যাক। ব্রিটেনে জিন আসে হল্যান্ডের রাজা উইলিয়াম অফ অরেঞ্জের হাত ধরে। ১৬৮৯ সালে ইংল্যান্ডের সিংহাসন দখল করে তিনি ব্রিটিশদের গাজর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিন পানের অভ্যাসটাও ধরিয়ে দিয়ে যান। জিন শব্দটা এসেছে ডাচ জেনেভার থেকে, যার মানে জুনিপার গাছ। এই গাছের ফলের রস থেকেই তৈরি হত এই মদ। ইংল্যান্ডবাসীদের এই নতুন পানীয়র রং লাগতে বেশি সময় লাগেনি, বিশেষত যখন তারা দেখল এতে বিয়ারের চেয়ে অনেক কম খরচায় অনেক জাঁকালো নেশা করা যায়। সরকার যখন জিন তৈরির উপরে লাইসেন্স তুলে নেয়, তখন ব্রিটেনের অলিতে গলিতে হাজার হাজার জিনের দোকান (যাদের পোশাকি নাম ছিল জিন প্যালেস) গজিয়ে উঠল। ফল যা হবার তাই। বদলোক দেশে দেশে কালে কালে ছিল। তারা বুঝে গেল জুনিপারের ফলের বদলে তারপিন তেল মেশালে খরচ আরও কম আর লাভ চারগুণ। ফলাফল হল মারাত্মক। উইলিয়াম হোগার্থ তাঁর বিখ্যাত এনগ্রেভিং জিন লেন-এ ১৭১১ সালে এক করুণ ছবি এঁকেছেন। লন্ডনের রাস্তায় মানুষ অসুস্থ হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেউ কেউ মারা গেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, নেশার চোটে মায়ের কোল থেকে সন্তান পড়ে যাচ্ছে। সে এক নারকীয় দৃশ্য। ১৭৩০ নাগাদ ব্রিটেনেই জিনের উৎপাদন ছিল বিয়ারের প্রায় ছয়গুণ। ইংরেজ শ্রমিকরা জিন ছাড়া অন্য কিছু পান করতেন না, বা তাঁদের সাধ্য ছিল না। তাঁরা জিন পান করতেন আর অকালে মরতেন। হোগার্থের ছবি সরকারকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করে। ১৭৩৬ সালে জিন আইন পাশ হল, যাতে জিন বিক্রেতাদের উপর প্রচুর কর বসানো হয়। ফল হল উলটো। জিনের দাম গেল বেড়ে। ইংল্যান্ডের রাস্তায় জিনের জন্য দাঙ্গা বেধে গেল। ফলে ১৭৫১-তে দ্বিতীয় জিন আইন চালু হল, যাতে জিনের উৎপাদকরা শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানিদের মদ দেবেন, আর অন্য মদের মতো একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানেই জিন বিক্রি করা যাবে। এই আইনে কাজ হল। লন্ডনের ডিস্টিলাররা লন্ডন ড্রাই জিন নামে নতুন এক ধরনের জিনের রেসিপি বানান, যা ধীরে ধীরে ইংল্যান্ড থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

জিন লেন

আর এই জিনের সঙ্গে একেবারে মাস্ট যে টনিক, তা কিন্তু একেবারে ভারতীয় জিনিস। ষোড়শ শতকে আমেরিকার জেসুইট পাদরিরা খেয়াল করলেন যে, ওখানকার কোয়েচা রেড ইন্ডিয়ানরা সিঙ্কোনা নামে একটা গাছের ছালের তিতো রস খায়। সে রস খেলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ তো কমেই, এমনকি সেরেও যায়। তাঁদের হাত ধরে এই তিতো ছালের গাছ রোমে আসে। সেই সময় রোমে ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপ। একজন পোপ আর বেশ কিছু কার্ডিনাল মশার কামড়ে প্রাণ দিয়েছেন। সিঙ্কোনা গাছের ছালের রস খেয়ে বাকিরা অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। সেই থেকেই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকায় কেউ গেলেই তার কোঁচড়ে কিছু সিঙ্কোনা ছাল বেঁধে দেওয়া হত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবরা ভারতে এলে তাঁদেরকেও একইভাবে সিঙ্কোনার ছাল

দেওয়া হয়েছিল। প্রথম প্রথম নিয়ম মেনে তাঁরা জলে ভিজিয়ে খেতেন। তারপর সোডা ওয়াটারে। শেষে সেই সোডা ওয়াটারে জিন মিশিয়ে দেখলেন, আরে বাঃ, এ তো দারুণ অ্যাপারটিফ! খিদে বাড়ানো, ম্যালেরিয়াকে দূর হটানো, সব এক চুমুকে সম্ভব। এই নতুন তেতো তরলের নাম তাঁরা দিলেন টনিক, মানে রোগহারক। সূর্য ডুবতে না ডুবতে মশা ঘিরে ফেলত চারদিক আর সাহেব মেমসাহেবরা সানডাউনার নামে এই জিন আর টনিক মিশিয়ে পান করতেন। তারপরেই আসত রাতের খাওয়া। কেমন করে যেন ইংরেজদের কালচারে এই জিন আর টনিক ঢুকে গেল। আজও খাঁটি ব্রিটেনে সাহেবরা ডিনার পার্টির আগে জিন আর টনিক খান এটা না জেনেই যে এর আসল কারণ ছিল ভারতের মশককুল।

মার্টিনি-শেকেন নট স্টার্ড

'একটা ড্রাই মার্টিনি, বড়ো শ্যাম্পেনের গ্লাসে।'

'ঠিক আছে, মঁসিয়ে।'

'শোনো, তিনভাগ গর্ডন নেবে, এক ভাগ ভদকা আর অর্ধেক কিনা লিলেট। এবার ভালো করে ঝাঁকাবে, যতক্ষণ না বরফঠান্ডা হয়ে যায়, শেষে লম্বা সরু একটা লেবুর টুকরো দেবে। বুঝলে?'

'ক্যাসিনো রয়াল' উপন্যাসে জেমস বন্ড নিজেই নিজের প্রিয় পানীয়র রেসিপি দিয়েছেন, আর এখান থেকেই সেই আইকনিক লাইন 'শেকেন নট স্টার্ড'-এর জন্ম। মার্টিনির জন্মও কিন্তু খিদে বাড়ানোর জন্যই। ১৮৯৬ সালের এক বিজ্ঞাপনে দেখতে পাই, স্ত্রী স্বামীর হাতে পায়ে ধরছেন যাতে স্বামী ওষুধ হিসেবে মার্টিনি খান। কী থাকত এই মার্টিনিতে? থাকত জিন, ভারমুথ আর একটা অলিভের টুকরো। কীভাবে এই ককটেল এল বা এর নাম মার্টিনি হল কীভাবে, তা নিয়ে অনেকরকম গল্প প্রচলিত। মার্কিনরা বলেন ক্যালিফোর্নিয়ার মার্তিনেজ নামে এক ক্লান্ত পথিককে চাঙ্গা করতে এক নাম না-জানা বারম্যান এটা বানান। ব্রিটিশরা অবশ্য বলেন এই নাম এসেছে ১৮৮০ নাগাদ। ব্রিটেন সেনাবাহিনীতে মার্টিন হেনরি নামে এক রাইফেল দেওয়া হত, যা ঘোড়ার চেয়ে বেশি "কিক" দিত। এই মদের কিক সেইরকম, তাই এমন নাম। ইতালিয়ানদের কাহিনি আবার অন্য। তাঁরা খুঁজে বার করেছেন ১৮৬৩ নাগাদ মার্টিনি অ্যান্ড রোসি নামে এক বিক্রেতা এই ককটেল বানাতেন। তখন এর নাম ছিল মার্টিনি রসো ভারমুথ। নাম যে কারণেই হোক, প্রথম ছাপা আকারে এর রেসিপি প্রকাশ পায় ১৮৮৮ সালে। লেখক ছিলেন হ্যারি জনসন, এক মার্কিন।

আমেরিকায় মদ ব্যান হলে সবচেয়ে বেশি গোপনে বিক্রি হত এই মার্টিনিই। ভারমুথের তেতো ভাব আর জিনের কষা স্বাদ মার্কিন অভিজাত থেকে সাধারণ মানুষ সবাইকে তৃপ্ত করেছিল। লেখক লেখিকারা কোনও এক অজানা কারণে মার্টিনির ভক্ত হয়ে পড়েন। স্কট ফিটজেরাল্ড, ডরোথি পার্কার থেকে ইয়ান ফ্লেমিং... সবাই মার্টিনির আমেজে মজে যান। জেমস বন্ডের প্রিয় পানীয় কি আর এটা সাধে হয়েছে?

ব্লাডি মেরির ইতিহাস

ব্লাডি মেরির আসল নাম মেরি টিউডর। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি ও রানি ক্যাথেরিন অফ আরাগনের একমাত্র কন্যা মেরির জন্ম ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে যখন মেরি মাত্র ১৭ বছর বয়সি তরুণী, তখন তাঁর বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ঘটে। হেনরি ক্যাথেরিনকে একটি পুরাতন দুর্গে নির্বাসিত করেন। তখন থেকেই পিতা ও পিতার ধর্মের উপর আক্রোশ জন্মায় মেরির হৃদয়ে। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্পেনের রাজা ফিলিপ ক্যাথলিক ধর্মের প্রবর্তনে রাষ্ট্রে ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মেরি ফিলিপকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। আর কিছু না, নির্মম উপায়ে ইংল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম নির্মূল করাই ছিল এই বিয়ের উদ্দেশ্য। ফিলিপের সহযোগিতায় মেরি প্রোটেস্ট্যান্ট বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন করতে শুরু করেন। অমানবিক অত্যাচার থেকে উদ্ধার পেতে ইংল্যান্ডবাসী মেরির বিরুদ্ধে গিয়ে এলিজাবেথকে তাদের রানি হিসাবে পেতে চাইল। তাদের এই প্রতিবাদে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মেরি। ফিলিপ ইংল্যান্ডেও ইনকুইজিশন ব্যবস্থা চালু করতে উৎসাহিত করেন মেরিকে। ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রবর্তন করেন তিনি। আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন তিন শতাধিক প্রোটেস্ট্যান্টকে। তাঁর এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডে সমস্ত ইংল্যান্ডনিবাসী স্তব্ধ হয়ে যায়। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে একে 'Marian Persecutions' বলে অবহিত করা হয়।

মেরির এই রক্তপিয়াসী অমানবিক হত্যাযজ্ঞের ফলেই তিনি 'ব্লাডি মেরি' হিসাবে কুখ্যাত হয়ে ওঠেন। আইনত তখন প্রোটেস্ট্যান্টদের শিরশ্ছেদে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মানুসারীদের শাস্তি হিসাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলার নিয়ম। তাই ক্যাথলিক ধর্মবিরোধীদের ভেতর আতঙ্কের সৃষ্টি করতে ফিলিপ রানি মেরিকে প্রোটেস্ট্যান্টদের পুড়িয়ে হত্যার পরামর্শ দেন। ভদকা, টমেটো জুস, গোলমরিচের গুঁড়ো আর উরচেস্টার সস দেওয়া এই কড়া ককটেল তাই একদিকে হ্যাংওভার কাটাতে অব্যর্থ, অন্যদিকে টমেটোর লাল রং

বহন করে অত্যাচারী রানির রক্তাক্ত স্মৃতি।

মেরি পিকফোর্ড- যার নামে ব্লাডি মেরি

খুব ভালো হত, এখানেই যদি লেখাটা শেষ করা যেত। মুশকিল হল, মেরি টিউডরের সঙ্গে ব্লাডি মেরি ককটেলের এই গল্প শুনতে যতই ভালো লাগুক না কেন, এদের মধ্যে আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। ১৯২১ সাল অবধি এই ককটেলের নাম কেউ জানত না। ১৯৬৪ সালে নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনে ফার্দিনান্দ পেতি নামে এক ফরাসি শেফ দাবি করেন ১৯২১ সালে তিনিই প্রথম এই ভদকা আর টমেটো জুস মেশানো পানীয়টি আবিষ্কার করেন। সেন্ট রেজিস হোটেলের কিং কোল রুমে প্রথম দিন সার্ভ করা মাত্র কীভাবে এই পানীয় জনপ্রিয় হয় সে

কথাও তিনি জানিয়েছেন। পেতি মিথ্যে বলেননি। পরে সমকালীন আরও দুই-তিনজন পেতির কথার সমর্থন জানিয়েছিলেন। অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স আসে তখনই, যখন পেতি জানান রানি মেরির নাম অবধি তিনি জন্মে শোনেননি। তাহলে এমনধারা নাম কেন রাখলেন পেতি?

পেতির উত্তর ছিল, 'আজ্ঞে, নির্বাক যুগের সেরা অভিনেত্রী মেরি পিকফোর্ড আমার বড্ড পছন্দের ছিল কিনা...'

ডিয়ার বিয়ার

পানীয়র আলোচনা হবে আর তাতে বিয়ার থাকবে না সে কি হয়? বিয়ারই বোধহয় একমাত্র মদ, যা নিয়ে গোটা একটা বিদ্যা আছে। গ্রিক শব্দ zythos হল বিয়ার (আরও সঠিকভাবে বললে গেঁজানো) আর logos মানে জ্ঞান, অর্থাৎ কিনা বিয়ার সংক্রান্ত জ্ঞানই হল জাইথোলজি, মতান্তরে গ্যাঁজানোর জ্ঞান। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণে নজর দিলে দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর সবথেকে পুরোনো অ্যালকোহলিক পানীয় এই বিয়ারের প্রথম লিখিত ইতিহাস উদ্ধার হয় অধুনা ইরান থেকে, যা কিনা খ্রিস্টের জন্মের চার হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো। মজার ব্যাপার, সেই ইরানেই এখন অ্যালকোহলিক বিয়ারের কেনাবেচা আইনত নিষিদ্ধ। বিয়ার শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন বিবরে থেকে, মানে পান করা।

বিয়ার স্ট্রীট

প্রাচীন মিশরের গিজা শহরের বিখ্যাত পিরামিড তৈরির সময় শ্রমিকদের প্রতিদিন মাথাপিছু নাকি চার লিটার করে বিয়ার বরাদ্দ ছিল। আবার ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবির আমলে কিউনিফর্ম হরফে লেখা শিলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে, বিয়ারে জল মেশালে উনি রীতিমতো কোতল করার ফরমান জারি করেছেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোর নোবেল পুরস্কার পান আর সেই সম্মানে গর্বিত হয়ে সে দেশের বিয়ার কোম্পানি কার্লসবার্গ তাঁকে একটি বাড়ি উপহার দিয়ে বসে। কার্লসবার্গ বিয়ার ফ্যাক্টরির পাশে অবস্থিত বাড়িটির বৈশিষ্ট্য ছিল রান্নাঘরের কলে, কল খুললেই বিয়ারের ধারা বইবে চব্বিশ ঘণ্টা। খামির বা ইস্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন খাদ্যশস্য অথবা ফলমূল গেঁজিয়ে বা চোলাই করে তা থেকে তৈরি হয় বিয়ার। বিয়ার তৈরিতে ব্যবহার হয় মূলত যব বা বার্লি, তবে যবের সঙ্গে কখনও সখনও

ব্যবহার হয় চাল, গম, ভুট্টা, মায় কাসাভা অবধি। শর্করা দ্রবণে ইস্ট নিজের বংশবিস্তার করে এবং তার সঙ্গে তৈরি করে বিভিন্ন উৎসেচক, উৎসেচকের প্রভাবে বার্লির শর্করা গেঁজে উঠে তৈরি হয় অ্যালকোহল আর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। বিয়ারের গেলাসে যে ফেনা দেখা যায় তা এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বুদবুদ মাত্র।

অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশে বিয়ারের আগমন ঘটে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের হাত ধরে এবং আরও পাকাপাকিভাবে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভের পরে। কালা নেটিভদের দেশে সাহেবরা যখন গরমে হাঁফিয়ে যেতেন, তখন দু-এক গেলাস ঠান্ডা বিয়ার তাঁদের শরীরে নতুন জোশের জোয়ার নিয়ে আসত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই উপমহাদেশে বিয়ার ছিল দুর্মূল্য, কারণ ইংল্যান্ড থেকে প্রায় ছয়মাস যাবৎ জাহাজ যাত্রা শেষে যখন বিয়ার এসে পৌঁছোত ততদিনে বহু বিয়ারের পিপে জাহাজ যাত্রার ধকলে ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙে নষ্ট হয়েছে; আবার, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে বিয়ার খারাপ হওয়ার ফলেও অনেক বিয়ার নষ্ট হত। ফলত বেঁচেকুচে থাকা বিয়ার অগ্নিমূল্যে না বেচলে পড়তায় পোষাত না। অবশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উৎসাহে লন্ডনের জর্জ হজসন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন পেইল এল্; যা পরবর্তীতে পরিচিতি পায় ইন্ডিয়ান পেইল এল্ বা সংক্ষেপে IPA নামে। জর্জ সাহেবের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল এমন এক বিয়ার বানানোর, যা ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসার ছয়মাস জাহাজ যাত্রার পরেও ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণে নষ্ট হবে না। জর্জসাহেব সেই সময়ে লন্ডনে প্রচলিত অক্টোবর এল্ নামে একটি জনপ্রিয় এলের স্বাদে অনুপ্রাণিত হয়ে বেশি অ্যালকোহল এবং অতিরিক্ত হপ যুক্ত এই ইন্ডিয়ান পেইল এল্ তৈরি করেন, pale শব্দ যোগ করা হয় এই এল্-এর হালকা রঙের জন্য। জানা যায়, ভারতে বসবাসকারী ধনী ইংরেজদের কাছে এই এল্ ছিল যথেষ্ট জনপ্রিয়। তবে IPA তৈরি করার কয়েক বছরের মধ্যেই হজসনের দুই ছেলে বুড়ো বাপের থেকে ব্যবসা ছিনিয়ে নেয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে হজসন বিয়ার শুরু করে একচেটিয়া ব্যবসা। সম্ভবত বিশ্বের প্রথম গ্লোবাল বিয়ার বর্যান্ড এই হজসন, যাদের লোগো ছিল একটি লাল রঙের ত্রিভুজ। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হজসন কোম্পানি অবশেষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তোয়াক্কা না করে নিজেই সরাসরি বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্যবসা শুরু করে। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লভ্যাংশ কমতে থাকে এবং কোম্পানির কর্তারা বিকল্প অনুসন্ধানে মনোযোগী হন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্তাব্যক্তি ইংল্যান্ডের বার্টন-অন-ট্রেন্ট শহরের একটি বিয়ার কোম্পানির মালিক স্যামুয়েল অ্যালসপকে

চ্যালেঞ্জ দেন হজসন বিয়ারের থেকেও ভালো স্বাদের বিয়ার বানানোর। কয়েক মাসের মধ্যেই অ্যালসপ তৈরি করেন আরও ভালো স্বাদের IPA, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি তৎকালীন খবরের কাগজ ক্যালকাটা গেজেটেও এই IPA-র গুণগান করে খবর ছাপা হয়। অ্যালসপের প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বার্টন শহরের আরও অনেক বিয়ার তৈরির কোম্পানি এই অলিখিত প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় এবং এর ফলে অবশেষে হজসনের একচেটিয়া ব বসার অবসান হয়।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পাদরি সাহেব উইলিয়াম ওয়ার্ডের লেখা 'A view of the history, literature and religion of the Hindoos'-এ তৎকালীন ছাপোষা বাঙালিদের খাদ্যাভাসে পানীয় বলতে কিন্তু জল, ডাবের জল, ঘোল বা দুধ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' পড়লে দেখা যায় যে, উচ্চবিত্ত বাঙালিবাবুরা সবিশেষ পানপটু ছিলেন। বাঙালির বিয়ার পানের সপক্ষে প্রথম লিখিত ঐতিহাসিক রেফারেন্স পাওয়া যায় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিনের পাতায়। ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টের যে সূত্রপাত, তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "... (young Bengalees) cutting their way through ham and beef, and wading to liberalism through tumblers of beer." সুতরাং মধ্যবিত্তদের মধ্যপ্রাশনে ড্রুজো সায়েবের কীর্তি কম ছিল না।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় জানা গিয়েছে বিয়ার আদতে স্বাস্থ্যকর পানীয়, ওয়াইনের চাইতেও বেশি প্রোটিন আর ভিটামিন বি এতে আছে। সাদা বা হলদে রঙের উদ্ভিজ্জ দ্রব্যে যে সকল রঞ্জকপদার্থ পাওয়া যায় তাদের একত্রে বলে ফ্ল্যাভোনয়েড (flavonoid), আর বিয়ারে এই ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে যা আসে হপ থেকে। এ সমস্ত ফ্ল্যাভোনয়েড মানুষের শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, ঠিক যেমন ভিটামিন সি এবং ভিটামিন ই করে থাকে। গবেষকরা বলছেন নিয়মিত স্বল্প পরিমাণে বিয়ার পান করলে প্রস্টেট ক্যানসার থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস, রক্তাল্পতা, কিডনির পাথর, মায় হার্ট অ্যাটাক অবধি বিবিধ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, উপরন্তু শরীরের হাড়গোড় হয় মজবুত। তবে শুধু স্বাস্থ্য কেন, সৌন্দর্যায়নেও বিয়ারের উপস্থিতি সর্বঘটে কাঁঠালিকলার মতো, অনেক বিউটি টিপস্-এ স্নানের সময় বিয়ার দিয়ে চুল ধোয়ার কথা বলা হয়, বিশেষত যাঁদের চুলে জট পড়ার প্রবণতা বেশি রয়েছে। ফার্মেন্টেশনের পরেও বিয়ারের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে স্টার্চ বা শ্বেতসার বেঁচে থাকে এবং বিয়ার দিয়ে চুল ভিজিয়ে ধুয়ে নিলে প্রত্যেকটি চুলের

ওপর এই স্টার্চের একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে যায়, যা চুলকে জটমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।
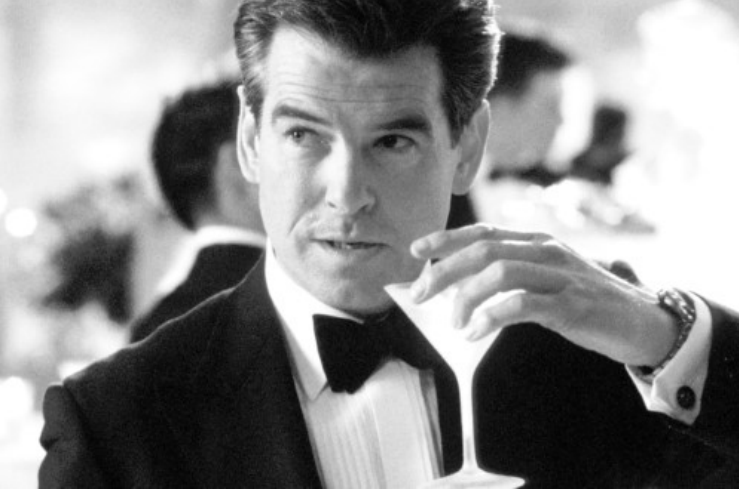
বন্ডের হাতে মার্টিনি

ইউরোপ মহাদেশে বেলজিয়াম এমন একটি দেশ, যেখানে প্রায় একহাজার ছশো বিভিন্ন জাতের বিয়ার পাওয়া যায়। প্রতি বছর মাথা পিছু বিয়ার পানের কম্পিটিশনে বেলজিয়ামকে বাইশ নম্বরে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করে বসে আছে বেলজিয়ামের পড়শি দেশ চেক রিপাবলিক (পূর্বতন চেকোস্লোভাকিয়ার অংশ)। চেক রিপাবলিকের একজন মানুষ বছরে গড়পড়তা প্রায় ১৪২ লিটার বিয়ার পান করে থাকেন। বিখ্যাত আইরিশ কোম্পানি Guiness Brewery এবং এদের তৈরি স্টাউট বিয়ার বিশ্বপ্রসিদ্ধ। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই কোম্পানির বিয়ার সর্বাধিক বিক্রি হয় নাইজেরিয়ায়, নিজের দেশ আয়ারল্যান্ডে নয়। জার্মানি, ইংল্যান্ড-সহ বহু ইউরোপিয়ান দেশে, ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, ইকুয়েডর বা কলম্বিয়াতে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শহরে বিয়ার উৎসবে শয়ে শয়ে মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন। আপনার কাছে যদি এক সেকেন্ডে বিশ্বভ্রমণের কোনও উপায় থাকত, তাহলে দেখতে পেতেন যে-কোনো মুহূর্তে প্রায় পাঁচ কোটি লোক এই আনন্দধারায় মেতেছে । আজ্ঞে হ্যাঁ, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জানা গেছে প্রতি সেকেন্ডে বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার প্রতি হাজার জনে অন্তত সাতজন লোককে মাতাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

পান এবং অন্যান্য

পান

সে বহু যুগ আগের কথা! রাজার নির্দেশে ধনপতিকে যেতে হবে সিংহলে। বহুদিন ওদেশ থেকে কোনও সওদাগর আসেনি। দেশে তাই গুয়ারের বড়ো অভাব! রাজা চিন্তিত! কীসে সাজা হবে তম্বুল, কী দিয়ে রাখবেন অতিথিদের মান? কাজেই, রাজ-নির্দেশে ধনপতি নৌকা ভাসালেন নোনাজলে। হাত পেতে নিতে হল রাজার দেওয়া তাম্বুল। সেইসঙ্গে শালবস্ত্র, লক্ষ মুদ্রা, তুরঙ্গ, বর্ম ও ফলা কাটারি। যথাসময়ে যাত্রা শুরু হল। পিছনে পরে রইল উজানিনগর, দুই স্ত্রী লহনা আর খুল্লনা।

তা হলেই ভাবুন, কেমন ছিল পানের কদর! আজও কিছু কমেনি! চব্য, চষ্য, লেহ্য, পেয় যতই উদরস্থ হোক, যতক্ষণ না মুখে পানটি পড়ছে, মন খুশ হয় না! বাঙালির বড়ো প্রিয় বন্ধু এই পান! বাঙালিরা মনে করেন, ব্রহ্মা তুষ্ট সুপারিতে, বিষ্ণু পানে এবং মহাবেদ চুনে। পানের খিলিতেই বাস করেন এই তিন দেবতা।

কিন্তু কোথা থেকে এল পান? পণ্ডিতদের মতে, পান অস্ট্রো-এশিয়াটিক। ইন্দো-আরিয়ান নয়। আদি ঠিকানা ফিলিপাইনস, সেবিস কিংবা জাভা, বোর্নি। তবে, ভারতীয়দের ধারণা, পান একান্ত স্বদেশি। যদিও আদিকালে পৃথিবীতে পান ছিল না! মহাভারতে পানের উৎপত্তির এক দিক নির্দেশ করা হয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পানের জন্য দুনিয়া তোলপাড় করেন পঞ্চপাণ্ডব। হস্তিনাপুর ছাড়িয়ে নানাদিকে খোঁজ পড়ে যায়। কিন্তু কোথাও পান নেই! খুঁজতে খুঁজতে সন্ধানীরা পৌঁছোন পাতালপুরীতে। সাপের রানির ঘরে। তখন বাসুকী তাঁদের খোঁজে সন্তুষ্ট হয়ে উপহার দেন হাতের কনিষ্ঠ আঙুল। সেই আঙুল মাটিতে পুঁতলে জন্মায় পানের বল্লরী। সে গাছের ফুল নেই, ফল নেই। কেবল কচি সবুজ পাতা। সংস্কৃতে তাই পানের আর-এক নাম ‘নাগবল্লরী’।

কালীঘাটের মোহান্ত এলোকেশীর পটে পান

এখানেই শেষ নয়! অন্য গল্পও আছে। পুরাণে রয়েছে, সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল হলাহল। সেই

বিষের ভাণ্ড নিয়ে মহাবিপদে পড়েন দেবকুল! অবশেষে সেই বিষ গলায় ধারণ করে দেবাদিদেব হলেন নীলকণ্ঠ। বিষের জ্বালায় কিছুক্ষণের জন্য তিনি মূর্ছা যান। তখন তাঁর কপালের ঘাম আর শরীরের ময়লা জমানো হল তামার পাত্রে। সেই মিশ্রণ থেকে জন্মায় এক সুদর্শন পুরুষ। নারায়ণ তাঁর নাম রাখেন তাম্বুলপুত্র। জন্মানোর পর সে যায় নাগলোক। তার রূপে মুগ্ধ হয় নাগকন্যা। বিয়ে হয় দুজনের। জন্মায়, পানরূপী নাগবল্লরী। অনেকে আবার মনে করেন, অর্জুন স্বর্গ থেকে চুরি করে এনেছিলেন পানের চারা। পুঁতেছিলেন রাজবাড়ির বাগানে। সেখান থেকেই মর্তে পানের প্রচলন। কে জানে বাবা! কিন্তু ইতিহাস বলছে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লেখা ভিয়েতনামি বই 'লাইফ স্টোরি অব ট্যান অ্যান্ড ল্যাং'-এও পানের কথা লেখা আছে। সে তো মহাভারতেরও আগের লেখা।

পান এককালে ছিল খুবই দামি। মনসামঙ্গলে রয়েছে এমনই এক গল্প। চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য করতে গিয়ে উপস্থিত হন আজব এক দেশে। সপ্তডিঙা নোঙর হয়। সওদাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন কোতোয়াল। সওদাগর তখন পান খেতে ব্যস্ত। সোনার বাটা থেকে পান-সুপারি-চুন দিলেন অতিথিকে। কোতোয়াল চুনকে দই ভেবে চেটে খেলেন, পান দিলেন ফেলে। চাঁদ বুঝলেন, এদেশের লোক পানের ব্যবহার জানেন না। ব্যবসায়ী বুদ্ধি উসকে উঠল। পানপাতার বদলে দেশে নিয়ে ফিরলেন হিরে-মানিক।

এ তো গেল পুরাণের গল্পকথা! বাস্তবেও রয়েছে পানের ঝুড়ি ঝুড়ি কিসসা ! আরবি হেকিম আতা ইবন আহামদ বলেছিলেন, পানের অনেক গুণ। দোষ একটাই, আরব মুলুকে আনতে না আনতেই পান শুকিয়ে যায়। উপায়? ইয়েমেন-এর লোকজন তাই এদেশ থেকে ওদেশ খাঁটি মধুতে ভিজিয়ে নিয়ে যেত পানপাতা। এতে পাতা শুকিয়ে তো যেতই না, উলটে হল আরও মিঠে। ১২৯৫ সালে মার্কো পোলো গুজরাতে আসেন। সেখানকার বাসিন্দাদের দাঁতের হাল দেখে অবাক হয়ে যান! লিখেছিলেন, এটা একধরনের পাতা চিবানোর ফল। সেই পাতা চিবোলে চেহারা খোলতাই হয়। পঞ্চদশ শতকে বিজয়নগর আসেন আবদুর রজ্জাক। রাজদরবারে পৌঁছোতেই রাজা তাঁর হাতে তুলে দেন সুগন্ধী পান। সিংহাসনের পাশে সবসময় থাকত মজুত তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী। হাতে নিয়ে তাম্বুল-সম্পুট। তাঁর ধারণা হয় : পান খুবই বলবর্ধক, আর ৭০০ মহিলাকে অন্তঃপুরে রেখেও রাজা যে এরকম ক্লান্তিহীন, তা এই পানের মহিমা। ১৫৪৮ সালে এদেশে এসেছিলেন পর্তুগিজ পর্যটক বারবোসা। পান নিয়ে তিনি বলেন, 'চিবুলে মুখ লাল হয়, দাঁত কালো। তা ছাড়া পান তৃষ্ণা হরে, মাথা ঠান্ডা রাখে।' কিন্তু শেষে সাবধান করে দেন, কর্পূরের সঙ্গে পান খেলে পুরুষত্বের হানি হয়! সপ্তদশ শতাব্দীর ইতালীয়

পর্যটক মানুচ্চির অভিজ্ঞতা আবার একদম অন্য ঘরানার। পান খেয়ে মুখ রাঙানো লোকদের দেখে ওঁর দৃঢ় ধারণা হয় এদের ভয়ানক কোনও অসুখ করেছে। এরপর আবার এক মেমসাহেবের অনুরোধে প্রথম বার পান খেয়ে দাঁত ছিরকুট দিয়ে ভিরমি খেয়েছিলেন! একই শতকে আসেন গার্সিয়া ওরটা। পান সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, 'ভারতীয়রা সব সময়ই পান চিবুচ্ছে। বিশেষ করে মেয়েরা। পানের সঙ্গে থাকে সুপারি, চুন, খয়ের, কর্পূর। লক্ষ করলে দেখবে, ওদেশের মানুষের বুড়ো আঙুলের নখ বড়ো। কেন-না, তাতে পানের শিরা ছিঁড়তে সুবিধা হয়। পান খুবই উপকারী। পানে মাথা সাফ, পেট সাফ, দাঁত ও মাড়ি অটুট।' তবে পান খেয়ে মেয়েদের ঠোঁট রাঙানোর যে প্রথা, তা শুরু মুঘল রাজদরবার থেকে। শুরু করেন স্বয়ং নূরজাহান।

ইংরেজ ভারত ছাড়ল! দেশভাগ হল। চারদিকে হাহাকার, রক্তারক্তি! সেই দুঃসময়েও পাকিস্তান কিন্তু পানের কথা ভোলেনি। পান ছাড়া নাকি তাঁদের খাবার হজম হবে না! কাজেই, ভারত থেকে ওদেশে গেল পান! পান তৈরির সময় নখ বা বোঁটা দিয়ে পানের মাঝবরাবর ছিঁড়ে ফেলা হয়। খাওয়ার সময় দাঁত দিয়ে কেটে ফেলা হয় খিলির আগা। কিন্তু কেন? ফের দ্বারস্থ পুরাণের। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রয়েছে, 'পানের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূলভাগে যশ এবং মধ্যে লক্ষ্মীর অবস্থান। সেইজন্যই এই তিন ভাগ ফেলে পান খেতে হয়। না হলেই গণ্ডগোল। মূলভাগ খেলে কঠিন রোগ, অগ্রভাগ খেলে হবেন পাপের ভাগী, কমবে আয়ু আর পানের বোঁটা খেলে নষ্ট হবে বুদ্ধি। পিকও ফেলতে হবে নিয়ম মেনে। পান-সুপারি-মশলায় তৈরি প্রথম রস বিষের মতো। দ্বিতীয় রস রেচন। তৃতীয় রসই হল অমৃত। সেজন্যই প্রথম দুবারের রস খাওয়া চলবে না।'

বাংলার লোককবিতা বা ছড়ায় বারবার এসেছে পানের অনুষঙ্গ—

আয় রঙ্গ হাটে যাই।
এক খিলি পান কিনে খাই।।
পানের ভিতর ফোঁপরা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া। ।

বা

বাবু বলেছেন যেতে
পান সুপারি খেতে।
পানের ভিতর মৌরী বাটা

ইস্কাপনের ছবি আঁটা।

কিংবা

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এল দেশে,

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে?

ধান ফুরোল, পান ফুরোল, খাজনার উপায় কী?

আর কটা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি।

শুধু পানই নয়, রয়েছে পানমশলা খাওয়ার নিয়মও। সকালের পানে থাকবে বেশি সুপারি, দুপুরের পানে খয়ের এবং রাতে চুন। সুপারি ছাড়া পান খেলে রেহাই নেই। দোষ কাটাতে যেতে হবে গঙ্গাস্নানে। না হলে পরের জন্মে জন্ম হবে চণ্ডালের ঘরে!

মেনুকার্ড এল কীভাবে?

১৯১১ সালের ৭ই মে। অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড় উপচে পড়ছে ঠাকুরবাড়িতে, কারণ সেদিন কবিগুরুর ৫০তম জন্মদিন বলে কথা! খাওয়াদাওয়াটাও সেদিন হওয়া উচিত বেশ জম্পেশ! তাই হেমেন্দ্রনাথের মেজো মেয়ে প্রজ্ঞা দেবী কবিগুরুর জন্য বানালেন একটা বিশেষ ধরনের বরফি, যার নাম দিলেন 'কবিসম্বর্ধনা বরফি।' যেমন নাম, তেমনই স্বাদ। খেয়ে তারিফ করেছিলেন সবাই। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও নাকি বুঝতে পারেননি, বরফির মূল উপাদান ছিল ফুলকপি!!! রেঁধেছিলেন হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজো মেয়ে, প্রজ্ঞা দেবী। রান্না নিয়ে নানান এক্সপেরিমেন্ট করে, দারুণ সব রান্না করে ফেলা, আর তাদের শ্রুতিমধুর সব নাম রাখা... এই ব্যাপারে দক্ষতার অধিকারিণী ছিলেন তিনি। আমরা আজকে কোনও ভোজসভায় যে মেনুকার্ড দেখি, বাংলার ভোজসভায় সেই মেনুকার্ড বা 'ক্রমণী' চালু করার পুরো কৃতিত্ব প্রজ্ঞার। লেখাটা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের ভাষায়। ইংল্যান্ডের ভোজসভায় মেনুকার্ডের চল দেখে প্রজ্ঞা ঠিক করেছিলেন, বাংলার ধাঁচেও মেনুকার্ড বানাবেন। না ছাপালেও, হাতে সুন্দর করে লিখে দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। এইরকম একটা ক্রমণী নিচে দিলাম–

কুমার রামেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের
জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কেশবেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের শুভ-পরিণয় উপলক্ষে

ভোজ।

১। লুচি।
২। ডালপুরি।
৩। পদ্ম লুচি।
৪। [illegible] ভর্ত্তা।
৫। [illegible]।
৬। হোসেনি কাবাব।
৭। ছোঁকা।
৮। মোগলাই কোর্ম্মা।
৯। চন্দ্রকলা।
১০। মুগ মনোহর।
১১। কোপ্তা কারি।
১২। পাঁপড়ের ডালনা।
১৩। মালাই কারি।
১৪। কচুরি।
১৫। [illegible] ভোগ।
১৬। ক্ষিরের [illegible]।
১৭। [illegible]।
১৮। [illegible]।
১৯। ফুল কপির রায়তা।
২০। মিঠে গোলাপী চাটনি।
২১। [illegible]ভোগ।
২২। মোহন মোহন ভোগ।
২৩। সমসা।
২৪। কমলালেবুর সন্দেশ।
২৫। গোলাপী পেঁড়া।
২৬। আবার খাব।
২৭। ক্ষিরের মালপুয়া।
২৮। সর পুরিয়া
২৯। সর ভাজা।
৩০। বরফি।
৩১। [illegible] লাড়ু।
৩২। বাদামের বরফি।
৩৩। পেস্তার বরফি।
৩৪। মোরব্বা।
৩৫। চাটনি।
৩৬। ফল ইত্যাদি।

কেশবেন্দ্র দেবের বিয়ের মেনুকার্ড (মূল ছবি অস্পষ্ট)

DINNER SERVED FROM 7 P.M.

THREE COURSE DINNER

Rs. 4/8

A. FIRPO LTD.

HAYWARDS FINE & DRY GIN

	Half	Full
Rum & Soda	1/-	2/-

Firpo's Orange Squash
Firpo's Lemon Squash

Firpo's Lime Juice Cordial & Soda

চল্লিশের দশকে কলকাতার ফির্পোর মেনুকার্ড

‘জাফরানি ভুনি খিচুড়ি

ধুঁধুল পোড়া

শিম বরবটি ভাতে

পাকা আম ভাতে

পটলের নোনা মালপোয়া

পাকা কাঁঠালের ভূতি ভাজা

কাঁকরোল ভাজা

ভাত

অড়হর ডালের খাজা

লাউয়ের ডালনা

বেগুন ও বড়ির সুরুয়া

ছোলার ডালের ধোঁকা

বেগুনের দোল্মা

আলুবখরা বা আমচুর দিয়ে মুগের ডাল

পাকা পটলের ঝুরঝুরে অম্বল

ঘোলের কাঁড়ি

রামমোহন দোলমা পোলাও

নীচুর পায়স

নারিকেলের বরফি।’

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই, শোভাবাজার রাজবাড়ির কেশবেন্দ্র দেবের বিয়ের মেনুকার্ডে ৩৬ রকম মেনুর সন্ধান পাই। কিন্তু এই মেনুকার্ড এল কোথা থেকে? ইতিহাস বলছে চিন দেশে সং রাজবংশের সময় দিনের শেষে ব্যবসায়ীরা এসে হাজির হতেন রেস্তোরাঁতে। তাঁদের ইচ্ছেমতো খাবার বানানোর সময় থাকত না। তাই কিছু জনপ্রিয় খাবার বানিয়ে একটা লিস্টি বানিয়ে রাখা হত। সেখান থেকেই তাঁরা পছন্দের খাবারের অর্ডার দিতেন। ফরাসি শব্দ মেনুর উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন মিনিটুস থেকে, মানে ছোটো আকারে দেখা। ফরাসি রান্নার জটিলতা বেশি, তাই সহজ মেনুদের লিস্টি থাকে আ-লা-কার্তে-এ। এখানে দায়দায়িত্ব সব খদ্দেরের। আর রেস্তোরাঁর সেরা রেসিপি নিয়ে একেবারে শুরুর স্যুপ থেকে শেষের ডেসার্ট অবধি ফুল কোর্স ডিনারের নাম তাবল দ্যোৎ। এই অবধি বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে উইলিয়াল ক্রিস্টাল সাহেব ১১৮৬-এ মমি হওয়া সেতনাখত-এর মমির সমগে বেশ কিছু হায়রোগ্লিফের টুকরো খুঁজে পান। তা দেখে চিনারা একেবারে ব্যাকফুটে। কারণ সেগুলো আর কিছুই না, ভিন্ন খাবারের নাম লেখা মেনুকার্ড মাত্র।

ঠাকুরবাড়ির খাওয়াদাওয়া

ঠাকুরবাড়ির লোকেরা যথার্থ ভোজনরসিক ছিলেন। নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। ঠাকুরবাড়িতে পাকা আম ভাতে, পাকা পটলের টক, কাঁচা ও কচি তেঁতুলের ঝোল, বেগুন ও কাঁচাকুলের টক, তিল বাটা দিয়ে কচি আমড়ার অম্বল রান্না হত। রবি ঠাকুরের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী পাকা আমের মিঠাই বানাতেন। শেষ পাতে দই ও সন্দেশ অপরিহার্য ছিল। মিষ্টির নানারকম নামও দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একবার একটি মিষ্টি খেয়ে নাম দেন ‘এলোঝেলো’, পরে বদলে রাখেন ‘পরিবন্ধ।’

১৯১৩ সালে কবি নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগের বছর ১৯১২ সালে লন্ডনে ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান সোসাইটি, লন্ডন। সেদিনের খাদ্যতালিকা হয়েছিল কবির পছন্দে। এই খাবারের তালিকায় ছিল : গ্রিন ভেজিটেবল স্যুপ, ক্রিম অব টমেটো স্যুপ, স্যামন ইন হল্যান্ডেন সস অ্যান্ড কিউকামবার, প্রি সলটেড ল্যাম্ব উইথ গ্রিন ভেজিটেবল, রোস্ট চিকেন, ফেঞ্চ ফ্রাই, গ্রিন

স্যালাড ও আইসক্রিম। বাইরে এই ধরনের খাবার খেলেও বাড়িতে তিনি কম তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেতেন। কবির স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর রান্না ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর হাতের রান্না খেতে সবাই খুব পছন্দ করতেন, বিশেষত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নাকি টকের সঙ্গে ঝাল মিশিয়ে বেশ নতুন নতুন পদ তৈরি করতেন। রানী চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'জানো সবরকম কলার মতো রন্ধনকলাতেও আমার নৈপুণ্য ছিল। একদা মোড়া নিয়ে রান্নাঘরে বসতাম এবং স্ত্রীকে নানাবিধ রান্না শেখাতাম।' এভাবেই তৈরি হয়েছিল মানকচুর জিলিপি। শান্তিনিকেতনে থাকার সময় তিনি স্ত্রীকে মানকচুর জিলিপি তৈরি করতে বললেন। মৃণালিনী প্রথমে হেসে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু খেয়ে দেখা গেল সেটা জিলিপির চেয়ে ভালো হয়েছে। কবি বললেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন শিখিয়ে দিলুম।' কবিপত্নী হেসে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে।'

স্বাস্থ্যসচেতন কবি নিজের খাদ্যাভাস নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। একবার এক বিদেশি বন্ধু এসে বললেন, ডিম হচ্ছে আসল খাদ্য। ওতে সব রকমের গুণ আছে। এরপর কী হল? রানী চন্দ লিখেছেন, 'গুরুদেব কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন, একটু নুন-গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলেন। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে।' একবার এক আয়ুর্বেদজ্ঞ বললেন নিমপাতার রস সর্বরোগনাশক। ব্যস, শুরু হয়ে গেল নিমপাতার রস খাওয়া। রানী চন্দকে বললেন, 'বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয়। বেশি কেন, ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।' ঠাকুরবাড়িতে প্রায়শই খামখেয়ালি সভা বসত। সেই সভায় কবি থাকতেন মধ্যমণি। সেই খামখেয়ালিপনা থেকেই হয়তো তিনি রাত দুটোর সময় মৃণালিনী দেবীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কিছু রান্না করে খাওয়াতে বলতেন। শোনা যায় এই ঘটনা প্রায়শই ঘটত আর মাঝরাতে মৃণালিনী দেবী রান্না করে রবীন্দ্রনাথকে খাওয়াতেন। কবি দেশি খাবারের মধ্যে পছন্দ করতেন কাঁচা ইলিশের ঝোল, চিতল মাছ আর চালতা দিয়ে মুগের ডাল এবং নারকেল চিংড়ি। এ ছাড়া তিনি কাবাব খেতে খুব পছন্দ করতেন। এর মধ্যে ছিল শ্রুতি মিঠা কাবাব, হিন্দুস্তানি তুর্কি কাবাব, চিকেন কাবাব নোসি। এখানেই শেষ নয়, কবিগুরু ছিলেন পানের ভক্ত। তাঁর নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁকে একটি সুদৃশ্য পানদানি বা ডাবর উপহার দিয়েছিলেন, যা আজও ঠাকুরবাড়িতে রক্ষিত আছে। ঠাকুরবাড়ির রান্নায় বেশি করে মিষ্টি দেওয়ার প্রচলন ছিল। গরম মশলা, লবঙ্গ, দারুচিনি বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হত। রান্নার তালিকায় প্রতিদিনই দীর্ঘ পদ থাকত। আর তাতে নিয়মিত অবশ্যই থাকত শুক্তো আর দইমাছ।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে রান্না না করলেও রন্ধন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ভালো কিছু খেলেই তার রেসিপি লিখে রাখতেন লাল একটা খাতায়। পরে পুর্ণিমা ঠাকুর সেই খাতাটি উপহার পেলে, খাতার রেসিপি আর তাঁর মা নলিনী দেবীর রেসিপি মিলিয়ে 'ঠাকুরবাড়ির রান্না' নামে দারুণ একটা বই লেখেন। এখানে স্যালাড, চাটনি আর মিষ্টি তৈরির নানা অভিনব পদ্ধতির কথা বলা আছে। রেণুকা দেবী চৌধুরানীও 'রকমারি আমিষ রান্না' ও 'রকমারি নিরামিষ রান্না' নামে দুটি উচ্চমানের কুকবুক লিখেছেন, যা আজও গৃহিণীদের একান্ত উপযোগী। এই বইতে চাং পাঁঠা রান্নার কথা আছে। মায়ের দুধ ছাড়িয়েই তাকে মাচার উপর বেঁধে প্রচুর ছোলা ঘাস ইত্যাদি দেওয়া হয়। নড়াচড়া না করার জন্য তার মাংসের আঁশ শক্ত হয় না। খাবার উপযুক্ত হলে তাকে মাচা থেকে নামিয়ে খাওয়া হয়। উনষাট রকম ভাজা কিংবা দইভাত খাইয়ে হাঁসকে রন্ধন-উপযোগী করে তোলার কথা রেণুকা দেবীই প্রথম বলেন।

বাঙালির কুকবুকের উপাখ্যান

মুজতবা আলী সাহেব ঠিক বলেছিলেন। এমন কেউ নেই যে খেতে ভালোবাসে না। শুধু এখানেই থামেননি। এটাও বলেছিলেন, 'খাদ্যের হাজারো প্রকার থাকলেও খাদক মূলত দুই প্রকারের। ভোজনপটু ও ভোজনবিলাসী। ভোজনবিলাসীরা হরেকরকমের খাবার সামনে থাকলেও বেছে বেছে খায়। আর ভোজনপটু যারা তাদের কোনো বাছ-বিচার নেই। আহার উপযোগী হাতের কাছে যা পায় তাই টপাটপ হজম করে। ভরা পেটেও খাওয়া শুরু করে।' এখানে অবশ্যি আলী সাহেবের ফরাসি জ্ঞান কিঞ্চিৎ কাজে এসেছে। ফরাসিতে খুব কাছাকাছি দুটো শব্দ আছে— গুরমাঁ আর গুর্মে। গুরমাঁ হলেন তাঁরা, যাঁরা খাবার জন্য বাঁচেন। স্বাদ গন্ধের সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁদের প্রায় নেই বললেই চলে। যা পান, গোপাল অতি সুবোধ বালকের মতো তাই চেটেপুটে খান। যতদিন বেঁচে থাকেন, নিজের (এবং অন্যের ক্ষতি করে) প্রবলভাবে খেয়ে যান। গুর্মেরা একেবারেই উলটো। পরিমাণ নয়, খাবার গুণাগুণই তাঁদের কাছে একমাত্র বিচার্য। তবে অনেকদিন অবধি খাওয়া ব্যাপারটা একেবারেই ঘরোয়া ছিল। নবাবদের খাস বাবুর্চি থাকতেন পাকশালায়। তবে শুরুতেই ব্যাপারটা এমন ছিল না। এই যে মোগলাই খানা নিয়ে এত নাচানাচি, সেই মোগলদের প্রথম সম্রাট বাবর তিনবেলা মাংস ঝলসে খেতেন। কাঠি গাঁথা সেইসব ভেড়ার মাংস খুলে খুলে খেতে হত। তবে সেই সময়ের এক পর্যটক এই মাংস খেয়ে 'অতিরিক্ত তৈলাক্ত আর বিস্বাদ' বলেছিলেন, সে কথাও ভুললে

চলবে না। মসলা জারিয়ে পরের সম্রাটরা যে রাজকীয় খানা খেতেন, তা বাবরের কপালে জোটেনি, বোঝাই যাচ্ছে। হিন্দু রাজারাও যে শুধু শাক লতাপাতা খেয়ে থাকতেন তা নয়। দ্বাদশ শতকে চালুক্য রাজা সোমেশ্বর খাসা একটা বই লিখেছিলেন, নাম 'মানসোল্লাস'। সেই বইতে ঝাল ঝাল দই দিয়ে ডালের বড়া, এলাচ দিয়ে ভাজা শূকরের মাংস, ঝলসানো লেজ, কচ্ছপের মাংসের চিপস (তা নাকি ভাজা কলার মতো খেতে লাগত)-এর কথা বলা আছে। তবে রাজার ফেভারিট ছিল কাঁচা আম আর লবণ সহযোগে ঝলসে রাঁধা ধেড়ে ইঁদুরের মাংস। রাজা নিজে এই খাবারের কী প্রশংসা করেছেন কী বলব! এ যেন মনের শান্তি, প্রাণের আরাম।

জৈন আর বৌদ্ধরা এসে ভারতীয়দের মাংস খাবার বাই বেশ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল এক ঝটকায়। যত নিরামিষ রান্না, সব কিছুর শুরু ওই সময় থেকে। বাবর যখন এলেন, ততদিনে অর্ধেক ভারত স্ট্রিক্টলি ভেজ হয়ে গেছে। যত দিন গেছে মোগলাই খাবারের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। এর পরে পরে পর্তুগিজরা এলে ভারতীয় খাওয়াতে অনেক নতুন নতুন জিনিস আমদানি হল। তারা ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক ফলমূল ও শুকনো খাবার এদেশে নিয়ে এসেছিল। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল গোল আলু। পর্তুগিজদের নিয়ে আসা আর-একটি জিনিস, যা ভারতবর্ষের লোকেরা লুফে নিয়েছিল, তা হল লংকা। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এই অদ্ভুত ফলটি। এর আগে কি বাঙালি ঝাল খেত না? খেত। তবে সেটা লবঙ্গের ঝাল। অনেকে বলেন লংকা ভারতের হেঁশেলে ঢুকতে পেরেছিল তার একমাত্র কারণই হচ্ছে লবঙ্গের সঙ্গে তার চেহারার মিল।

রান্না নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট চলছিল চারদিকে। কিন্তু যাকে বলে কুকবুক বা রান্নার বই, তেমনটি একটিও ছিল না। বিলেতে প্রথম ঠিকঠাক কুকবুক বানান এক কবি। কারা যেন বলে, "কবিরা আমাদের পেট ভরান না। তা বলে কি কবিতা পড়ব না!" ডাহা মিথ্যে কথা। আমরা যে এখন দুবেলা দুটি ভালোমন্দ খেয়ে বেঁচে আছি, সেও এক কবির জন্যেই। এক মহিলা কবি। নাম এলিজা অ্যাকটন। ভদ্রমহিলা কেন্টে থাকতেন। কবিতা মন্দ লিখতেন না। কিন্তু যা হয়, কবিতার বইয়ের বিককিরি নেই। প্রকাশক বলল, "ম্যাডাম, কিছু বাজারি বিষয় চেষ্টা করুন না।" এলিজা খেয়াল করলেন বাজারে অনেক রান্নার বই আছে। কিন্তু কোনোটাই ঠিক বিজ্ঞানসম্মত না। উপাদান ও পরিমাণের জায়গায় "পরিমাণ মতো ময়দা" বা "বেশ খানিক দুধ" বলে দায়সারা কাজ চলছে। তিনি এবার উঠে পড়ে লাগলেন। প্রতি উপাদানের ওজন,

রান্নার সময় বেঁধে দিলেন কাঁটায় কাঁটায়। নিক্তি মেপে। যেভাবে গবেষণাগারে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। আর দাবি করলেন তাঁর পদ্ধতি মানলে "anybody can cook"। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত হল তাঁর ক্লাসিক বই 'MODERN COOKERY FOR PRIVATE FAMILIES'। প্রকাশমাত্রে বেস্টসেলার। রান্নাঘরে কিচেন স্কেল চালু করল এই বইটিই। পরে প্রজ্ঞাসুন্দরী থেকে লীলা মজুমদার হয়ে বেলা দে... রান্নার বই লিখতে গিয়ে জেনে না-জেনে সবাই এলিজার দেখানো পথেই হেঁটেছেন। এরপরেও কে বলে যে কবিরা পেট ভরাতে পারে না? বাংলা তথা ভারতের প্রথম কুকবুক অবশ্য এর কিছু আগে লেখা। বর্ধমানের রাজা মহতাবচাঁদ, বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে 'পাকরাজেশ্বর' নামে এক রান্নার বই লেখান। কেমন ছিল সেই বই? এই বই নিয়ে পত্রিকায় বেশ খটমট বাংলায় লেখা হয়েছিল—

(১ অক্টোবর ১৮৩১ । ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) নূতন গ্রন্থ। পাক রাজেশ্বর .এই দেহধারণের মূলাধার আহার অতএব সর্ব্বোপভোগযোগ্য মানবের নিমিত্ত অন্নপূর্ণ রূপ ধারণপূর্বক অম তিক্ত মধুর লবণ কটু কষায় ষড্রসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্যসকল সাত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ প্রকার বিভাগ করিষা অন্নদাস্থপনামক শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন । ঐ শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণ বোধের কঠিনতাপ্রযুক্ত তৎকর্ম্ম স্বনিম্পন্নাভাবে প্রচণ্ড প্রতাপবান সকল গুণ নিধান শ্রীমান মহারাজ নল মহাশয় এবং পাণ্ডৰীয় ভীমসেন ও দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্বস্বনামে স্থপশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং উত্তরোত্তর সুগমোপায় নিমিত্ত অনেকশনেক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরা নানাবিধ কুতুহলনামে স্থপশাস্ত্র প্রকাশে স্থলভাধিক্য করিয়াছেন। তৎপরে জবনাধিকারে ঐ সকল স্থপশাস্ত্রহইতে প্রয়োজনমতে কিঞ্চিৎ২ সংগৃহীত হইয়া পারসীয় ভাষাতে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এইক্ষণে হিন্দুরাজ্য বহুকালাবধি ভ্রষ্ট হওয়াতে ঐ সকল সংস্কৃত স্থপশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রায় লোপ পাইয়াছে । অতএব মহানুভব শ্রীযুত বিক্রমাদিত্য মহারাজাধিকারে সংস্কৃত স্থপশাস্ত্র সংক্ষেপ সংগ্রহকর্ত্ত শ্রীযুত ক্ষেম শর্ম্মকৃত ক্ষেমকুতুহলনামক গ্রন্থ হইতে ও শ্রীযুত শাহজহান বাদশাহের নিত্য ভোজনের নেয়ামৎখাননামক পারসীয় পাকবিধি ও নওয়াব মহাবতজঙ্গের নিত্য ভোজনের পাক বিধিহইতে সাধারণের দুষ্কর পাক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থলভ পাক যাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয় তাহ গ্রহণ করিয়া এবং বর্তমান অনেকানেক স্থপকুশল ব্যক্তিদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়।

বিষয়ি ব্যক্তিসকলের সুগমবোধার্থ পরিমাণ সহ পাকবিধি এবং ভক্ষণজন্য অজীর্ণ হইলে দ্রব্যান্তর ভক্ষণে আশুপ্রতিকারক জীর্ণমঞ্জরী গ্রন্থ এবং তদর্থ সংস্কৃত মূল সহ গদ্য পদ্য রচনাতে পাক রাজেশ্বর নাম প্রদানপূর্বক গৌড়ীয় সাধুভাষাতে গ্রন্থ । প্রস্তুত করিলাম ইতি –সং চং ।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'ব্যঞ্জনরত্নাকর।' এই দুই পণ্ডিতের লেখায় মাংসের কথা উঠে এসেছে বারবার। 'পাকরাজেশ্বর'-এ প্রলেহ অর্থাৎ কোর্মা তৈরির প্রণালী রয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে নানাবিধ মাংসের কথা। যেমন মেষ, কচ্ছপ, হরিণ, খরগোশ। তারপর তিলের তেল সহযোগে ছাগলের মাথা ও নাড়ির রান্নাকৌশলের কথা বলা হয়েছে।

গৌরীশঙ্করের 'ব্যঞ্জনরত্নাকর'-এ পাবেন মাংস পরিষ্কারের কথা— 'লোমসহ চর্ম্ম দূর করণের পর উদরসহ মূত্র পুরীষ ও পিত্তস্থলী এবং নাড়ি ইত্যাদি ত্যাগ করিবে, পরে ওষ্ঠ দণ্ড চক্ষু কর্ণ ক্ষুর ও চরণ আদি ত্যাগ করিবে।' নাড়ি রন্ধনে নিজেকে আরও পটু করে তুলতে চাইলে তাতে যোগ করুন ঘি, গরম মশলা, আদা, পেঁয়াজের ফোড়ন। রয়েছে করলা বা বেগুনের শুক্ত প্রলেহ, মাংস দিয়ে লাউ অথবা ঝিঙে। শসা বা কাঁকুড়ের শাঁস বের করে তাতে মাংসের পুর ভরে যে কাবাবটির কথা বলা হয়েছে, সেটাও অত্যন্ত সুস্বাদু।

এই দুই বইয়ের পরেই ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'পাক প্রণালী' আর ১৯০২-তে 'মিষ্টান্ন পাক।' আর কী অদ্ভুত সব পাক!! 'রুটি টুকরা টুকরা আকারে কাটিয়া, এক একখানি টুকরা কোন পাত্রে সাজাইয়া রাখ। অনন্তর, সর কিংবা গাঢ় দুগ্ধ প্রত্যেক টুকরার উপর এক এক চামচ বা ঝিনুক ঢালিয়া দাও। এক ঘণ্টা পরে, এই রুটির টুকরাগুলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে খাঁটি মাখনে ভাজিয়া লও, এবং গরম গরম অবস্থায় পরিবেষণ কর। চিনির সহিত এই টুকরা খাইতে অতি সুখাদ্য।' হিন্দু, অহিন্দু, আমিষভোজী, নিরামিশাষী সবার জন্যেই এই বই লেখা হয়েছে। শুধু ধনী নয়, সাধারণ মানুষও যাতে এই বই মেনে রান্না করতে পারে, তার সন্ধান লেখক দিয়েছেন। তাঁর মতে রান্না তিনরকম, 'সহজ, উৎকৃষ্ট এবং রোগীর উপযুক্ত রন্ধন। তবে সর্বাগ্রে উচিত ভোক্তার জীবনের প্রতি মমতা।' অন্ন প্রস্তুতেরই সাতরকম প্রণালী আছে এই বইতে, যার মধ্যে বড়ি ভাতে আর বেতের ডগা ভাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোলো রকমের খিচুড়ি, ছিয়াত্তর রকমের পোলাও, একুশ রকম ঘণ্ট, এগারো রকমের চচ্চড়ির কথা নেহাত বাদই দিলাম। তবে রসগোল্লার কোর্মা কীভাবে রাঁধতে হবে, জানতে গেলে এই বই আপনার অবশ্যপাঠ্য।

এর পরপরই প্রকাশ পায় প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর ম্যাগনাম ওপাস 'আমিষ ও নিরামিষ আহার।' তাঁর বাবা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন রসায়নবিদ। রন্ধনকে তিনি বিজ্ঞান হিসেবে দেখতেন। মূলত বাবার ইচ্ছেকে রূপ দিতেই তিনি এই বইটি লেখেন। পরে অসামিয়া সাহিত্যের জনক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। 'পুণ্য' পত্রিকার সম্পাদিকা প্রজ্ঞাসুন্দরী, নানা কাজের ফাঁকে রান্না চালিয়ে যেতেন, আর তাঁর স্বামী সেগুলো পরখ করে দেখতেন। মূলত তাঁর উৎসাহেই ১৯০০ সালে বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ পেল। মোট তিন খণ্ডের বইটিতে প্রায় আড়াই হাজার বিভিন্ন পদের প্রস্তুত প্রণালী লিপিবদ্ধ রয়েছে। শুধু রান্নাই না, রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন রাখা, দাস দাসী নির্বাচনে সতর্কতা, উনুন তৈরি, বঁটির ব্যবহার, সব বিষয়েই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বারবার বলেছেন যাতে কোনও কিছু নষ্ট না হয় সেদিকে নজর দিতে, 'অল্প ব্যয়ে যিনি সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইতে পারেন, তিনিই সুগৃহিণী।' শুধু এখানেই শেষ নয়, রান্না বিষয়ে একটি পরিভাষার তালিকাও প্রস্তুত করেন তিনি। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—

১। কাঁটা মারা— লেবু ইত্যাদির ভিতরে নুন ঢুকিবার জন্য একটা কাঁটা দিয়া বিধান

২। গাঁধর চর্বি— কাঁচা মাংসের ভিতরে ফ্যাকাশে লাল রঙের চর্বি

৩। চমকান— শুকনো খোলায় অল্প ভাজা

হেমেন্দ্রনাথের অন্য মেয়ে সুনৃতাও 'পুণ্য' পত্রিকায় বিভিন্ন রকম আচারের প্রণালী প্রস্তুত করতেন। একই সময় প্রকাশ পেয়েছিল কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র রন্ধন ও জলখাবার', নীহারমালা দেবীর 'আদর্শ রন্ধন শিক্ষা' আর বনলতা দেবীর 'লক্ষীশ্রী'। একই ধারায় লেখা লীলা মজুমদারের 'রান্নার বই' আমাদের মন জয় করেছে। ইদানীং কালে রান্নার যে কটা বই লেখা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার ঠাকুমা দিদিমার রান্না' বা এসো বসো আহারে' বই দুটি বেশ অন্যরকম। এখানে কমলালেবু দিয়ে কই মাছ, আনারস দিয়ে ইলিশ মাছ, আম দিয়ে মুরগি বা বিনা দুধের পায়েস, লিচুর পায়েসের রেসিপি বলা আছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। তবে রান্নার বইকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন একজনই। তিনি বেলা দে। ট্রেন থেকে শুরু করে পাড়ার ছোটো বইয়ের দোকান... সব জায়গায় তাঁর উপস্থিতি। এমন কোনও বাঙালি পরিবার আছে কি, যেখানে বেলা দে-র লেখা অন্তত একটা কুকবুক নেই!

খাওয়াদাওয়া বা খাদ্যসংস্কৃতি নিয়ে বিস্তর বইও লেখা হয়েছে। এখুনি আমার মনে পড়ছে সমীর দাশগুপ্তের 'সুখাদ্যের সন্ধানে', শংকরের 'রসবতী', দেবী ঘোষের 'বাঙালির

রসনাবিলাস' কিংবা প্রতাপকুমার রায়ের 'সুখাদ্য সুবচন' আর 'মহাভোজ রাজভোজ'-এর কথা। শেষ বইটি একটি মহাগ্রন্থ বিশেষ। তাঁর ভাষার গুণে সাবিরের রেজালা, উজ্জলার চানাচুর, চাং-ওয়ার চাউমিন কিংবা উদিপির দোসার স্বাদ যেন মুখে এসে লাগে। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর লেখায় রান্নার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গুণাগুণ নিয়ে লিখে গেছেন। অতি সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ফুড ব্লগার ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ীর 'ফুড কাহিনি'। একেবারে আটপৌরে ঢঙে, যেন গল্প করছেন এইভাবে, তিনি আমাদের এক আশ্চর্য যাত্রায় নিয়ে চলেন। যে যাত্রা খাদ্যের ইতিহাস ভূগোলের (কিছুটা বিজ্ঞানেরও)। আজ অবধি বাংলায় খাবারদাবার নিয়ে যত বই লেখা হয়েছে, তাঁদের কেউ কেউ আলোচনা করেছেন কী খাব না খাব নিয়ে, কেউ খাবারের ইতিহাস নিয়ে, কেউ কোন খাবার কোথায় ভালো তাতে ফোকাস করেছেন, আর অধিকাংশ নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন রেসিপিতে। লাহিড়ী মশাই বাংলার নানা চেনা অচেনা খাবার আর সেই খাবারের সুলুকসন্ধান দিয়ে এই বই লিখেছেন। কী নেই তাতে! চৈনিক, মোগলাই, ভাজাভুজি, বিরিয়ানি, আম, পাইস হোটেল, বড়োবাজারের গোপন ঠেক, দিঘা আর পুরীতে।

ব্যাস! আর কী চাই? জোগাড় করে ফেলুন এর যে-কোনো একটা (আমি তো বলব সব কটা) বই। আর ঘরেই রাঁধুন কিংবা বইতে বলা জায়গায় গিয়ে কবজি ডুবিয়ে খান, সেটা নিতান্ত আপনার ব্যাপার।

ফুড ইজ নাও রেডি টু সার্ভ....

পরিশিষ্ট

এডওয়ার্ড লিয়রের আজব রেসিপি

১৮৭০ সালের ননসেন্স গেজেটে এডওয়ার্ড লিয়র কাল্পনিক এক অধ্যাপক ভোসের তিনখানি রন্ধনপ্রণালী প্রকাশ করেন। নাম ছিল ননসেন্স কুকারি। শুরুতে গ্রাম্ভারি একখানা ভুমিকাও ছিল–

"আমাদের পাঠকরা বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদবিদ অধ্যাপক ভোসের নিম্নলিখিত তথ্যপূর্ণ রচনাবলীতে আগ্রহ বোধ করিতে পারেন। প্রাথম তিনটি প্রবন্ধেই তিনি রন্ধন বিষয়ে নানা উপাদেয় কথা যাহা লিখিয়াছেন, উহা প্রতিটি পরিবারের রন্ধনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই কারণে ডাক্তার ভোসের নবতম আবিস্কারসমূহের সচিত্র বিবরণ তাঁহারই সৌজন্যে প্রকাশ করা হইল"।

পড়লেই লিয়রের ফাজলামোটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বিশ্বসাহিত্যে রেসিপি নিয়ে এমন লেখা বিরলতম। তাই নোলার পাঠকদের এমন লেখার সঙ্গে পরিচয় না করিয়ে দিয়ে পারলাম না।

গার্হস্থ্য রন্ধনের তিনখানি উপায়

লম্ব- হংস পিঠা তৈরি

ঠিক চার পাউন্ড (মানে ওই সাড়ে চার পাউন্ড মত) খুব টাটকা দেখে একখানা লম্ব হংস নাও, আর ছোট্ট দেখে একটা মাটির পাত্রে রাখ। এবারে জল ঢেলে সেটাকে ডোবাও আর আট ঘন্টা ধরে ক্রমাগতঃ ফুটিয়ে যাও আর ফুটিয়ে যাও। চার ঘন্টা ফোটানোর পরে যখন মনে হবে হংসটা বেশ নরম সরম হয়েছে, তা নামিয়ে বড় একখানা পাত্রে রাখ। আর হ্যাঁ, ভালো করে খেয়াল রেখ যেন সেটা ঠিকঠাক ঝাঁকানো হয়।

এবার কটা জায়ফল গুঁড়ো করে তাঁর ওপরে ছড়িয়ে দাও, তারপর লাগাও তাতে আদাপিঠে, কারি পাউডার আর গোলমরিচের পুরু প্রলেপ। এবার পাত্তরটা ধরে মেঝেতে ঠকাস করে নামিয়ে রাখো। দেখবে ঠকাস যেন একেবারে নির্ভুল হয়। ফের ওটাকে আগের ঘরে নিয়ে এসে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সিদ্ধ হতে দাও। এবারে পাত্তরটা ধরে জোরে জোরে নাড়া দাও, যতক্ষণ না লম্ব-হংসের রঙ হালকা বেগুনি না হয়।

পুরো জিনিসটা কাদার মত নরম হয়ে গেলে তাতে একটা ছোট্ট পায়রা, দুইপিস গোমাংস,

চার পিস ফুলকপি আর যতগুলো পার শামুক ধীরে ধীরে একসঙ্গে মিলিয়ে দাও। ভাল করে দেখ রাখ ওপরের পর্দা পড়তে শুরু করেছে, তারপর মাঝেমাঝেই একটিপ করে নুন ছিটিয়ে দাও।

এবারে তৈরি হয়ে গেল লম্ব- হংস পিঠা। পরিস্কার পিরিচে সাজিয়ে সকলকে পরিবেশন কর। এমন মজাদার খাবার একেবারে চেটেপুটে- না, মুখে দেবার আগে যত তাড়াতাড়ি পার, পিরিচশুদ্ধু খাবারটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বাঁচো। বাপস্ রে!!

বিচূর্নিত কাটলেট তৈরি

কটা লম্বা লম্বা ফালির মাংস জোগাড় কর। এরপর যতদূর সম্ভব ছোট ছোট করে সেগুলোকে টুকরো টুকরো কর। সেই টুকরোগুলোকেই এরপর আট নয় ভাগে কাট। এগুলো যখন পাওয়া গেল, তখন কাপড়ের তৈরি একটা ব্রাস দিয়ে চটপট ঝেড়ে নাও। তারপর একটা নুনের চামচ কিংবা ঝোলের হাতা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চারিদিকে ঘাঁটতে থাক।

পুরোটাকে একটা সসপ্যানে ঢেলে রোদ্দুরে রাখ। (ছাদে যদি চড়াই বা ওই জাতীয় অন্য কোন পাখির উৎপাত না থাকে তাহলে ছাদেই মেলে দেওয়া ভাল।) ওই অবস্থায় হপ্তাখানেক রেখে দাও।

হপ্তা কেটে গেলে একটু ল্যাভেন্ডার, কিছুটা বাদাম তেল, হেরিং মাছের কয়েকটা কাঁটা ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে চার গ্যালন পরিশ্রুত ব্রাস্কোবোলিয়াসের চাটনিতে চুবিয়ে রাখ। ব্যাস! জিনিসটা তৈরি!! বাকি শুধু কেটেকুটে কাটলেটের ছাঁচে আনা।

এখন পরিস্কার টেবিল ক্লথ কিংবা ডিনার ন্যাপকিনে সাজিয়ে সকলকে পরিবেশন কর।

মাংসের প্যাটিস তৈরি

তিন চার বছরের একটা বাচ্চা শুয়োর নাও; তাঁর পেছনের পা একটা খুঁটিতে শক্ত করে বাঁধ। এখন তাঁর নাগালের মধ্যে রাখ পাঁচ পাউন্ড কিশমিশ, তিন পাউন্ড চিনি, দুই ঝুড়ি কড়াইশুঁটি, আঠেরোটা পোড়া আখরোট, একটা মোমবাতি আর ছয় টুকরো পালং শাক। যদি দেখ যে শুয়োরটা এগুলো আরামসে খাচ্ছে, তবে ক্রমাগত এর জোগান দিয়ে যাও।

এবার একটু ননী, কয়েক টুকরো পনির, চার দিস্তে ফুলস ক্যাপ কাগজ আর কালো পিনের একটা প্যাকেট জোগাড় কর। এগুলো একত্রে লেই বানাও, আর একটা পরিস্কার সুতির কাপড়ে মেলে শুকোতে দাও। যতক্ষনে লেইটা পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে, ততক্ষন অবধি একটা মস্ত ঝাড়নের হাতল দিয়ে শুয়োরটাকে বেধড়ক পেটাও। যদি সে ব্যাথায় চিৎকার করে, তবে

তাঁকে আরও পেটাও।

লেইটাকে একবার দেখে এস, আবার শুয়োরটাকে পেটাও। এইভাবে চলুক কয়েকদিন। ওই সময়ের শেষে দেখ সবটাই রগরগে প্যাটিসে পরিনত হয়েছে কি না। যদি ততক্ষণও তা না হয়, তবে যেন আর কোনকালেই হবে না। তবে আর কি! শুয়োরটাকে ছেড়ে দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটাই খতম হল বলে ধরে নিতে পার।

এমন আরো বই পান

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই

ঘোষ, দেবী, বাঙালির রসনাবিলাস (বেস্টবুকস, ২০০৬)

ঠাকুর, পূর্ণিমা, ঠাকুরবাড়ির রান্না (আনন্দ, ২০১৪)

তর্কালঙ্কার, বিশ্বেশ্বর, তর্কবাগীশ গৌরীশঙ্কর, পাকরাজেশ্বরঃ ও ব্যাঞ্জনরত্নাকর (সুবর্ণরেখা, ১৯৯৯)

দাশগুপ্ত, সমীর, সুখাদ্যের সন্ধানে (সুবর্ণরেখা, ২০০১)

দে, বেলা, রান্নাবান্না (পাত্রজ, ২০১২)

দেবী, প্রজ্ঞাসুন্দরী, আমিষ ও নিরামিষ আহার (১ ও ২) (আনন্দ, ১৯৯০)

ভট্টাচার্য সান্যাল, রামকৃষ্ণ, এবং তাপস, অনার্য (সম্পা), নুনেতে ভাতেতে, খাদ্য সংস্কৃতি বিষয়ক সংকলন (দি ক্যাফে টেবল, ২০১৬)

নুনেতে ভাতেতে ২, হারিয়ে যাওয়া খাবারের গল্প (২০১৭)

ভট্টাচার্য, পিনাকী, খানাতল্লাশি (আনন্দ, ২০১৮)

ভৌমিক, হরিপদ, রসগোল্লা, বাংলার জগত মাতানো আবিষ্কার (গাংচিল, ২০১৫)

মুখোপাধ্যায়, দামু, পাহাড়ে আহারে (৯ঋকাল, ২০১৯)

মুখোপাধ্যায়, বিপ্রদাস, পাক প্রণালী (আনন্দ, ১৯৯৮)

-মিষ্টান্ন পাক (প্রকাশক অজ্ঞাত)

মজুমদার, লীলা, এবং চট্টোপাধ্যায়, কমলা, রান্নার বই (আনন্দ, ২০১০)

বন্দ্যোপাধ্যায়, শতরূপা, আমার ঠাকুমা-দিদিমার রান্না (আনন্দ, ২০১২)

রায়, প্রতাপকুমার, মহাভোজ রাজভোজ (আনন্দ, ২০০২)

সুখাদ্য সুবচন (নবপত্র, ২০০১)

লাহিড়ী, ইন্দ্রজিৎ, ফুড কাহিনি (বুকফার্ম, ২০১৯)

শংকর, রসবতী (দেজ, ২০০০)

ইংরাজি বই-

Blake, Anthony, and Crewe, Quentin, Great Chefs of France, (H. N. Abrams,

1978)

Burrow, John, A History of Histories (Allen Lane, 2007) Chapman, Pat, Curry Club Balti Curry Cookbook (Piatkus Books, 1997)

Collingham, Lizzie, Curry: A Tale of cooks and conquerors (Vintage Books, 2006)

-The Hungry Empire (Vintage Books, 2018)

David, Elizabeth, English Bread and Yeast Cookery (Viking, 1977)

-French Country Cooking (John Lehmann, 1951)

-French Provincial Cooking (Penguin Books, 1960)

-Mediterranean Food (John Lehmann, 1950)

Davidson, Alan, The Penguin Companion to Food (Penguin Books, 2002)

Grigson, Jane, English Food (Macmillan, 1974)

Fish Cookery (David & Charles, 1973)

Vegetable Book (Michael Joseph, 1978)

Jack, Albert, What Caeser Did for My Salad (Penguin Books, 2012)

Kulansky, Mark, Salt: A World History (Penguin Books, 2002)

Lee, Christopher, This Sceptered Isle (Penguin, 1998) Montagne, Prosper, Larousse Gastronomique: The World's Greatest Cookery Encyclopedia, ed. Jennifer Harvey Lang, third English Edition (Clarkson Potter, 2001)

Odya Krohn, Norman, Menu Mystique: The Diner's Guide to Fine Food & Drink (Jonathan David, 1983)

Saulnier, Louis, Le Repertoire de la cuisine, tr. E. Brunet, seventeenth edition (Leon Jaeggi & Sons, 1982)

Shaida, Margaret, The Legendary Cuisine of Persia (Interlink Books, 2002)

Smith, Drew, Modern Cooking (Sidgwick & Jackson, 1990) Swinnerton, Jo, The Cook's Companion (Robson Books, 2004)

Tannahill, Reay, Food in History (Penguin Books, 1973) Wilson, C. Anne, Food and Drink in Britain (Constable, 1974) (ed.), Traditional Food East and

West of the Pennines (Edinburgh University Press, 1991)

ক্রমণী